ঈছালে ছওয়াব সম্বন্ধে আকীদা

"ঈছালে ছওয়াব" অর্থ ছওয়াব রেছানী বা ছওয়াব পৌঁছানো। মৃত মুসলমানদের জন্য কৃত নামায, রোযা, দান-সদকা, তাসবীহ-তাহলীল, তিলাওয়াত ইত্যাদি শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতের ছওয়াব পৌঁছে থাকে। এক মতে ফরয ইবাদতের দ্বারাও ঈছালে ছওয়াব করা যায়। এতে নিজের জিম্মাদারীও আদায় হবে, মৃতও ছওয়াব পেয়ে যাবে।[১]

* মৃতের জন্য জীবিতগণের দুআ ও তাদের উদ্দেশ্যে দান সদকা দ্বারা মৃতগণ উপকৃত হয়ে থাকে। মু'তাযিলাগণ এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেন এই যুক্তিতে যে, আল্লাহ্‌র ফয়সালার কোন পরিবর্তন ঘটে না, আর মানুষের কৃতকর্ম অনুযায়ী আল্লাহ্‌র ফয়সালা হয়ে থাকে। মানুষ তার নিজের আমলের বিনিময় লাভ করে থাকে, অন্যের আমলের নয়। আমাদের দলীল ঐসব সহীহ হাদীছ, যার মধ্যে মৃতদের জন্য দুআ করার কথা বলা হয়েছে। নবী (সাঃ) জান্নাতুল বাকীতে উপস্থিত হয়ে তথাকার কবরবাসীদের জন্য এস্তেগ্‌ফার করেছেন এবং বলেছেন জিব্রীল আমাকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন - এটা সহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।[২]

জানাযার নামাযে মৃতদের জন্য দুআই করা হয়ে থাকে। এই জানাযার দ্বারা জানাযা আদায়কারীগণ সুপারিশ করার ক্ষমতা অর্জন করেন- এর দ্বারাও ঈছালে ছওয়াবের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। হাদীছে এসেছে ঃ

ما من ميت تصلى عليه امة من المسلمين يبلغون مأة كلهم يشفعون الا شفعوا فيه-

অর্থাৎ, যে কোন মাইয়্যেতের উপর মুসলমানদের কিছু লোক -যাদের সংখ্যা শতে উপনিত হয়- জানাযা আদায় করলে ঐ মাইয়্যেতের ব্যাপারে তাদের সুপারিশ কবূল করা হয়।

নিম্নোক্ত হাদীছ সমূহ[৩] দ্বারাও বিভিন্ন আমলের মাধ্যমে ঈছালে ছওয়াবের বিষয়টি প্রমাণিত হয়ঃ

وعن سعد بن عبادة انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ام سعد ماتت فاى الصدقة افضل؟ قال الماء فحفر بيرا وقال هذا لام سعد-

অর্থাৎ, সা'দ ইব্‌নে উবাদাহ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! উম্মে সা'দ ইন্তেকাল করেছে, (তার জন্য) কোন সদকা সবচেয়ে উত্তম হবে? তিনি উত্তর দিলেন ঃ পানি। সে মতে তিনি একটি কূপ খনন করে বললেন এটা উম্মে সা'দের উদ্দেশ্যে।

وقال عليه السلام الدعاء يرد البلاء والصدقة تطفئ غضب الرب-

অর্থাৎ, রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ দুআ বিপদকে হটায়। আর সদকা খোদার ক্রোধাগ্নিকে নির্বাপিত করে।

---

১. امداد الفتاوى جـ/٥ واحسن الفتاوى جـ/٧
২. نبراس থেকে গৃহীত
৩. هذا كله ماخوذ من شرح العقائد النسفية والنبراس

ان الحسن والحسين يعتقان عن علىٍ بعد موته - (رواه ابن ابى شيبة (كذا فى النبراس)

অর্থাৎ, হযরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর পক্ষ থেকে গোলাম আযান করতেন।

দুআর মধ্যে ওসীলা প্রসঙ্গে আকীদা

দুআ কবূল হওয়ার জন্য নবীদের বা কোন জীবিত বা মৃত নেককার লোকের ওসীলা দিয়ে কিংবা কোন নেক কাজের ওসীলা দিয়ে দুআ করা জায়েয বরং তা মুস্তাহাব। সাম্প্রতিক কালে এ বিষয়ে সালাফীগণ ভিন্ন মত পোষণ করছেন। এ প্রসঙ্গে ২য় খণ্ডে "ওয়াহ্হাবী ও সালাফীগণ" শিরোনামের অধীনে দলীল প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন পৃঃ ৪৩১।

জিন সম্বন্ধে আকীদা

জিনঃ আল্লাহ তা'আলা আগুনের তৈরী এক প্রকার জীব সৃষ্টি করেছেন, যারা আমাদের দৃষ্টির অগোচর, তাদেরকে জীন বলে।

* তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ সব রকম হয়। কুরআনে জিনদের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে ঃ

وانا منا المسلمون ومنا القسطون فمن اسلم فاؤلئك تحروا رشدا - واما القسطون فكانوا لجهنم حطبا -

অর্থাৎ, আমাদের মধ্যে কতক মুসলমান (আত্মসমর্পনকারী) আর কতক সীমালংঘনকারী। (সূরাঃ ৭২-জিনঃ ১৪)

* তাদের সন্তানাদিও হয়।
* তাদের মধ্যে বেশী প্রসিদ্ধ এবং বড় দুষ্ট হল ইবলীস অর্থাৎ, শয়তান।
* জিন মানুষের উপর আছর করতে পারে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطن من المس . الاية -

অর্থাৎ, যারা সূদ খায়, তারা ঐ ব্যক্তির ন্যায় দণ্ডায়মান হবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল বানিয়ে দেয়। (সূরাঃ ২ বাকারাঃ ২৭৫)

কারামত, কাশ্ফ, এল্হাম ও পীর-বুযুর্গ সম্বন্ধে আকীদা

নবী-রাসূল ব্যতীত আল্লাহ্র যেসব খাস বান্দারা আল্লাহ্র হুকুম এবং নবীজীর তরীকা মত চলেন, নাফরমানী করেন না এবং যারা আল্লাহ্ তা'আলাকেই স্বীয় কর্মের অভিভাবক মনে করেন পরিভাষায় তাদেরকে ওলী/বুযুর্গ বলা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা কখনো কখনো ওলী/বুযুর্গদের থেকে কারামত এর বহিঃপ্রকাশ ঘটান। তবে ওলী হওয়ার জন্য কারামত শর্ত নয়।

কারামত এর আভিধানিক অর্থ হল, সম্মান, মর্যাদা, মহত্ত্ব ইত্যাদি। পরিভাষায় কারামত বলা হয় -

ظهور امر خارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوى النبوة -

অর্থাৎ, নবী নন-এমন কোন বুযুর্গ ব্যক্তি থেকে প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম কোন বিষয় সংঘটিত হওয়াকে কারামত বলা হয়।

বুযুর্গ এবং ওলী আউলিয়াদের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা যেসব অসাধারণ কাজ দেখিয়ে থাকেন, তাকে বলা হয় কারামত। আর জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় তারা যে সব ভেদের কথা জানতে পারেন বা চোখের অগোচর জিনিসকে দেলের চোখে দেখতে পারেন, তাকে বলা হয় কাশ্‌ফ ও এল্‌হাম।

* বুযুর্গদের কারামত ও কাশ্‌ফ এল্‌হাম সত্য। কুরআন-হাদীছ দ্বারা কারামত সত্য হওয়া প্রমাণিত।[১] হযরত মারয়ামের কাছে অমৌসুমী ফল আসা এবং (আসিফ ইবনে বারখিয়া কর্তৃক) মূহুর্তে ইয়ামান হতে বিলকীসের সিংহাসন স্থানান্তরের ঘটনা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। ইরশাদ হয়েছে ঃ

كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يمريم انى لک هذا قالت هو من عند الله . الاية -

অর্থাৎ, যখনই যাকারিয়া তার (মারয়ামের) কাছে ইবাদতখানায় প্রবেশ করত, তার কাছে পেত আহার্য। সে বলত হে মারয়াম! এটা কোত্থেকে তোমার কাছে এল ? সে বলত, আল্লাহ্‌র কাছ থেকে। (সূরাঃ ৩-আলু ইমরানঃ ৩৭)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

قال الذى عنده علم من الكتب انا اتيک به قبل ان يرتد اليک طرفک فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربى . الاية -

অর্থাৎ, যার নিকট কিতাবের জ্ঞান ছিল সে (অর্থাৎ, আসিফ ইব্‌নে বারাখিয়া) বলল আপনার চক্ষুর পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। অতঃপর যখন সে (সুলাইমান) সেটাকে সন্মুখে অবস্থিত দেখল তখন সে বলল এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। (সূরাঃ ২৭-নাম্‌লঃ ৪০)

মারয়াম ও আসিফ ইব্‌নে বারাখিয়া-র ঘটনা মু'জিযা নয়। কেননা মারয়াম (আঃ) বা হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর সহচর আসিফ ইব্‌নে বারখিয়া-এতদুভয়ের কেউই নবী ছিলেন না। তাই এগুলো পয়গম্বরীর প্রমাণজ্ঞাপক অলৌকিক ঘটনা (মু'জিযা) হতে পারে না। বরং এ হচ্ছে কারামতের অন্তর্ভুক্ত।

আবূ নুআইম ও আবূ ইয়া'লা কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েতে আছে - হযরত ওমর (রাঃ) নিহাওয়ান্দের যুদ্ধে হযরত সারিয়াকে সেনাপতি বানিয়ে প্রেরণ করেন। একদিন কাফেররা পাহাড়িয়া ঘাটিতে ওঁত পেতে থেকে মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

---

১. মু'তাযিলাগণ কারামতকে অস্বীকার করে ॥

যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন হযরত ওমর (রাঃ) মদীনায় জুমুআর খুতবা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি يا سارية الجبل (অর্থাৎ হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখ।) বলে চিৎকার দেন। আল্লাহ তা'আলা এই আওয়াজ সারিয়ার সৈন্যবাহিনী পর্যন্ত পৌঁছে দেন।

* মৃত্যুর পরও কোন বুযুর্গের কারামত প্রকাশিত হতে পারে।

* কারামত ও কাশ্‌ফ এল্‌হাম হয়ে থাকে বুযুর্গ এবং ওলীদের দ্বারা। বুযুর্গ এবং ওলী বলা হয় আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাকে আর শরী'আতের রবখেলাফ করে কেউ আল্লাহর প্রিয় তথা ওলী বা বুযুর্গ হতে পারে না, অতএব যারা শরী'আতের বরখেলাফ করে যেমন নামায রোযা করে না, গাঁজা, শরাব বা নেশা খায়, বেগানা মেয়েলোককে স্পর্শ করে বা দেখে, গান-বাদ্য করে ইত্যাদি, তারা কখনও বুযুর্গ নয়। তারা যদি অলৌকিক কিছু দেখায় তাহলে সেটা কারামত নয় বরং বুঝতে হবে হয় সেটা যাদু বা কোনরূপ তুকতাক ও ভেল্কিবাজী, কিংবা যে কোন রূপ প্রতারণা। অনেক সময় শয়তান এসব লোকদেরকে গায়েব জগতের অনেক খবর জানিয়ে দেয়, যাতে করে এটা শুনে মূর্খ লোকেরা তাদের ভক্ত হয়ে যায় এবং এভাবে তারা বিভ্রান্তির শিকার হয়। এসব দেখে তাদের ধোঁকায় পড়া যাবে না।

* কাশ্‌ফ এবং এল্‌হাম যদি শরী'আতের মোতাবেক হয় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় তা গ্রহণযোগ্য নয়।

* ওলীগণের কাশ্‌ফ ও এল্‌হাম দলীল (حجت) নয় অর্থাৎ, তার দ্বারা কোন আমল প্রমাণিত হয় না।

* কোন বুযুর্গ বা পীর সম্বন্ধে এই আকীদা রাখা শির্‌ক যে, তিনি সব সময় আমাদের অবস্থা জানেন।

* কোন পীর বা বুযুর্গকে দূর দেশ থেকে ডাকা এবং মনে করা যে তিনি জানতে পেরেছেন-এটা শির্‌ক। কোন পীর বুযুর্গ গায়েব জানেন না, তবে কখনও কোন বিষয়ে তাদের কাশ্‌ফ এল্‌হাম হতে পারে, তাও আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

* কোন পীর বুযুর্গের মর্যাদা- চাই সে যতবড় হোক- কোন নবী বা সাহাবী থেকে বেশী বা তাঁদের সমানও হতে পারে না।

* কোন আকেল বালেগ কখনও এই স্তরে উপনিত হয় না যে, তার উপর থেকে ইবাদত-বন্দেগী মাফ হয়ে যায়। কেউ আল্লাহ্‌র ওলী হয়ে গেলেও তার ব্যাপারে এই নীতি প্রযোজ্য।

واعبد ربک حتی یأتیک الیقین -

অর্থাৎ, ইয়াকীন তথা মৃত্যু আসা পর্যন্ত তোমার প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাক। (সূরাঃ ১৫-হিজ্‌রঃ ৯৯)

এ আয়াত দ্বারা যারা বলতে চায় যে, ইয়াকীনের দরজা হাসিল হয়ে গেলে তার ইবাদতের প্রয়োজন থাকে না, তাদের ব্যাখ্যা ভুল। কারণ সব মুফাসসির এ ব্যাপারে একমত যে, এখানে اليقين দ্বারা মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, এখানে আমরণ ইবাদতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[১]

---

১. كذا قاله العلى القارى فى شرح الفقه الاكبر ॥

* বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলী আল্লাহ্‌দের নিদর্শন থেকে বরকত লাভ হয়ে থাকে। تبرک بآثار الصالحين বা বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলী আল্লাহ্‌দের নিদর্শন থেকে বরকত লাভ দুই ভাবে হয়ে থাকে।

১. তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত বস্তু দ্বারা বরকত লাভ। এটাকে বলা হয় تبرک بالاشياء। যেমন নবী করীম (সাঃ)-এর চুল মুবারক, তার জুব্বা মুবারক, ইত্যাদি। এমনিভাবে ওলী-আউলিয়াগণের এ জাতীয় কোন বস্তু।

২. তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান থেকে বরকত লাভ। এটাকে বলা হয় تبرک بالمكان। যেমন নবী করীম (সাঃ)-এর জন্মস্থান, তাঁর উপর প্রথম ওহী আগমন ও তাঁর সুদীর্ঘ ধ্যানমগ্ন থাকার স্থান হেরা গুহা, হাজার বার ওহী আগমনের স্থান খাদীজার গৃহ, হিজরতের সময় তাঁর আত্মগোপন থাকার স্থান গারে ছাওর, দারে আরকাম, আবূ বকর, ওমর প্রমুখ সাহাবীদের গৃহ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার সম্বন্ধে সালাফী ও গায়রে মুকাল্লিদগণের মতবিরোধ ও তা নিয়ে তাদের বাড়াবাড়ি রয়েছে। ২য় খণ্ডে এ বিষয়ে কুরআন, হাদীছ, ইজমা ও কিয়াসের দলীল প্রমাণাদি ও সালাফীগণের দলীলের জওয়াব সহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন পৃঃ ৪৪৩-৪৪৭।

কারামত ও ইস্‌তিদ্‌রাজ-এর মধ্যে পার্থক্য

ইস্‌তিদ্‌রাজ-এর আভিধানিক অর্থ কাউকে নিকটে টেনে আনা, এক স্তর হতে অন্য স্তরে উন্নিত হওয়া, কাউকে ধোকা দেয়া ইত্যাদি। পরিভাষায় কোন কাফের, মুল্‌হিদ, অমুসলিম ব্যক্তি হতে প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনাকে ইস্‌তিদরাজ বলে। বস্তুতঃ ইস্‌তিদ্‌রাজ হল মন্দ আমলের পরিণাম এবং কারামত হল নেক আমলের পরিণাম।[১]

আবদাল, গাউছ, কুতুব ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা

বুযুর্গানে দ্বীন লিখেছেন যে, মানব জগতে বার প্রকার আউলিয়া বিদ্যমান রয়েছে। যথা ঃ

১. **কুতুব** ঃ তাঁকে কুত্‌বুল আলম, কুত্‌বুল আকবর, কুত্‌বুল এরশাদ ও কুত্‌বুল আক্‌তাবও বলা হয়। আলমে গায়েবের মধ্যে তাঁকে আবদুল্লাহ নামে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর দুইজন উযীর থাকেন, যাদেরকে ইমামাইন বলা হয়। ডানের উযীরের নাম আবদুল মালেক এবং বামের উযীরের নাম আবদুর রব। এতদ্ব্যতীত আরও বার জন কুতুব থাকেন, সাতজন সাত একলীমে থাকেন, তাদেরকে কুত্‌বে বেলায়েত বলা হয়। এই নির্দিষ্ট কুতুবগণ ব্যতীত অনির্দিষ্ট কুতুব প্রত্যেক শহরে এবং প্রত্যেক গ্রামে থাকেন এক এক জন করে।

২. **ইমামাইন** ঃ ব্যাখ্যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

---

১. علم الكلام ॥

৩. **গাওছ** ঃ গাওছ থাকেন মাত্র একজন। কেউ কেউ বলেছেন কুতুবকেই গাওছ বলা হয়। কেউ কেউ বলেন গাওছ ভিন্ন একজন, তিনি মক্কা শরীফে থাকেন।
৪. **আওতাদ** ঃ আওতাদ চারজন, পৃথিবীর চার কোণে চারজন থাকেন।
৫. **আবদাল** ঃ আবদাল থাকেন ৪০ জন।
৬. **আখ্ইয়ার** ঃ তারা থাকেন পাঁচশত জন কিংবা সাতশত জন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তারা ভ্রমন করতে থাকেন। তাদের নাম হুসাইন।
৭. **আব্রার** ঃ অধিকাংশ বুযুর্গানে দ্বীন আব্দালগণকেই আবরার বলেছেন।
৮. **নুকাবা** ঃ নুকাবা আলী নামে ৩০০ জন পশ্চিম দেশে থাকেন।
৯. **নুজাবা** ঃ নুজাবা হাসান নামে ৭০ জন মিসরে থাকেন।
১০ **আমূদ** ঃ আমূদ মুহাম্মাদ নামে চারজন পৃথিবীর চার কোণে থাকেন।
১১.**মুফাররিদ** ঃ গাওছ উন্নতি করে ফর্দ বা মুফাররিদ হয়ে যান। আর ফর্দ উন্নতি করে কুতুবুল অহ্দাত হয়ে যান।
১২.**মাক্তুম** ঃ মাক্তুম শব্দের অর্থ পুশিদা বা লুকায়িত। অর্থ যেমন তারাও তেমনিই পুশিদা থাকেন।

উল্লেখ্য যে, ওলীদের এই প্রকার এবং এই বিবরণ সম্মন্ধে কুরআন-হাদীছে খুলে কিছু বলা হয়নি, শুধু বুযুর্গানে দ্বীনের কাশ্ফের দ্বারা এটা জানা গিয়েছে। আর কাশ্ফ যার হয় তার জন্য সেটা (শরী'আতের খেলাফ না হওয়ার শর্তে) দলীল- অন্যদের জন্য সেটা দলীল হয় না। অতএব এগুলো নিয়ে বেশী ঘাটাঘাটি না করাই শ্রেয়।[১]

মাজার সম্বন্ধে আকীদা

"মাজার" শব্দের অর্থ যিয়ারতের স্থান। সাধারণ পরিভাষায় বুযুর্গদের কবর -যেখানে যিয়ারত করা হয়- তাকে 'মাজার' বলা হয়। সাধারণ ভাবে কবর যিয়ারত দ্বারা বেশ কিছু ফায়দা হয় যেমন কল্ব নরম হয়, মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়, আখেরাতের চিন্তা বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি। বিশেষ ভাবে বুযুর্গদের কবর যিয়ারত করলে তাদের রূহানী ফয়েযও লাভ হয়। মাযারের এতটুকু ফায়দা অনস্বীকার্য, কিন্তু এর অতিরিক্ত সাধারণ মানুষ মাযার ও মাযার যিয়ারত সম্পর্কে এমন কিছু গলত ও ভ্রান্ত আকীদা রাখে, যার অনেকটা শির্ক-এর পর্যায়ভুক্ত, যেগুলো অবশ্যই পরিত্যাজ্য। যেমনঃ

মাজার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সমূহ ঃ

১. মাযারে গেলে বিপদ আপদ দূর হয়।
২. মাযারে গেলে আয়-উন্নতিতে বরকত হয়।
৩. মাযারে গেলে ব্যবসা বাণিজ্য বেশী হয়।
৪. মাযারে সন্তান চাইলে সন্তান লাভ হয়।
৫. মাযারে গেলে মকসূদ হাসেল হয়।

১.- تعلیم الدین. مولنا اشرف علی التھانوی থেকে গৃহীত ॥

৬. মাযারে মান্নত মানলে উদ্দেশ্য পূরণ হয়।
৭. মাযারে টাকা-পয়সা নযর-নিয়ায দিলে ফায়দা হয়।
৮. মাযারে ফুল, মোমবাতি, আগরবাতি ইত্যাদি দেয়াকে ছওয়াবের কাজ মনে করা ইত্যাদি।

আস্‌বাব/বস্তুর ক্ষমতা ও প্রভাব সম্বন্ধে আকীদা ঃ

কোন আস্‌বাব বা বস্তুর নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। কোন আস্‌বাব বা বস্তুর নিজস্ব ক্ষমতা আছে- এরূপ বিশ্বাস করা শির্‌ক। তবে বস্তুর মধ্যে যে ক্ষমতা দেখা যায় বা বস্তু থেকে যে প্রভাব প্রকাশ পায় তা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত, তার নিজস্ব ক্ষমতা নয়। তাই আল্লাহ ক্ষমতা না দিলে কিংবা তার স্বাভাবিক কার্যকারিতা প্রকাশ পাবে না- আল্লাহ পাকের এরূপ ফয়সালা হলেই বস্তুর স্বাভাবিক ক্ষমতাও প্রকাশ পায় না। বস্তু সম্বন্ধে এ হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা। এ সম্পর্কিত তাফসীল নিম্নরূপ ঃ
আসবাব প্রথমত ঃ দুই ধরনের। যথা ঃ

১. পার্থিব ঃ

পার্থিব কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদ-মুসীবত দূর করার জন্য বা পার্থিব কোন উদ্দেশ্য হাছিল করার জন্য যে আসবাব বা উপায় উপকরণ গ্রহণ কিংবা যে চেষ্টা তদবীর করা হয়ে থাকে তা তিন প্রকার । এই তিন প্রকার এবং তার হুকুম এক রকম নয় বরং ভিন্ন ভিন্ন। যথাঃ

(১) আসবাব যদি স্বাভাবিকভাবে নিশ্চিত পর্যায়ের (يقيني) হয়, তাহলে তা গ্রহণ করা জরূরী। যেমন ক্ষুধা বা পিপাসা দূর করার নিশ্চিত আসবাব বা উপায় হল খাদ্য পানীয় গ্রহণ করা। এরকম আসবাব গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় বরং এরকম আসবাব পরিত্যাগ করা নাজায়েয। যদি কেউ তাওয়াক্কুলের দোহাই দিয়ে জীবনের আশংকা দেখা দেয়ার মুহূর্তেও আসবাব বর্জন করে অর্থাৎ, খাদ্য পানীয় গ্রহণ না করে, তাহলে এ আসবাব বর্জনটা হরাম হবে। এ পর্যায়ের আসবাব গ্রহণ না করা তাওয়াক্কুল নয়- বরং এ পর্যায়ে তাওয়াক্কুল হল আসবাব গ্রহণ করবে এবং সেই সাথে এই বিশ্বাসও রাখবে যে, খাদ্য পানীয় ধ্বংস হয়ে যেতে পারে কিংবা তা গ্রহণের শক্তি আমার রহিত হয়ে যেতে পারে. কাজেই ভরসা চূড়ান্তভাবে আল্লাহ্‌রই প্রতি।

(২) যদি আসবাব এমন পর্যায়ের হয় যা দ্বারা উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়া নিশ্চিত নয় তবে অর্জিত হওয়ার প্রবল ধারণা করা যায় (ظني)- যেমন, রোগ ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে ডাক্তার বা হেকীমের ওষুধ পত্র গ্রহণ কিংবা সফরে গেলে পানাহার ও অন্যান্য প্রয়োজন পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে পাথেয় গ্রহণ, জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে আয় উপার্জনের কোন পন্থা গ্রহণ ইত্যাদি। এ ধরনের আসবাব বর্জন করা তওয়াক্কুলের জন্য শর্ত নয়। আবার এ ধরনের আসবাব গ্রহণ তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় বরং এ ধরনের আসবাব গ্রহণই পূর্ববর্তীদের সুন্নাত। তবে কেউ যদি এমন মযবূত কলবের অধিকারী হন যিনি এসব আসবাব গ্রহণ না করার ফলে কোন কষ্ট দেখা দিলে তখন পূর্ণ সবর করতে পারবেন- কোনরূপ হাহুতাশ করবেন না এবং ঈমান হারা হবেন না বা পাপ পথে

অগ্রসর হবেন না, তাহলে তার জন্য এসব আসবাব বর্জন করা জয়েয হবে। আর এরূপ মযবূত অন্তরের অধিকারী না হলে তার জন্য এসব আসবাব পরিত্যাগ করা উচিত হবে না, তার জন্য এ ধরনের আবসাব গ্রহণই উত্তম।

(৩) যদি আসবাব এমন পর্যায়ের হয়, যা দ্বারা উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়াটা নিতান্তই ধারণা মাত্র (وهمی), যেমন লোহা পুড়িয়ে দাগ দিলে কোন রোগ-ব্যাধি দূর হওয়াটা নিতান্তই ধারণা মাত্র, এমনিভাবে জীবিকা বৃদ্ধির জন্য আয় উপার্জনের রকমারি পন্থায় ডুবে থাকা ইত্যাদি। এ পর্যায়ের আসবাব গ্রহণ না করার হুকুম রয়েছে। এ ধরনের আসবাব গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী।

উল্লেখ্য যে, এতক্ষণ পর্যন্ত আসবাব গ্রহণ বা বর্জন সম্পর্কে যা কিছু বলা হল তা পার্থিব বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২. দ্বীনী ঃ

যদি দ্বীনী বিষয় হয়, তাহলে সে বিষয়টা ফরয পর্যায়ের হলে তার আসবাব গ্রহণ করাও ফরয, ওয়াজিব পর্যায়ের হলে তার আসবাব গ্রহণও ওয়াজিব এবং মুস্তাহাব পর্যায়ের হলে তার আসবাব গ্রহণ করা মুস্তাহাব। পক্ষান্তরে বিষয়টি হারাম বা মাকরূহ হলে তার আ-সবাব গ্রহণ করাও হারাম বা মাকরূহ হবে।

(ماخوذ از بیان القرآن وحاشیہ کوکب الدری بحوالہ عالمگیریہ و اربعین للغزالی وغیرھا)

রোগ সংক্রমণ সম্বন্ধে আকীদা

সাধারণতঃ ছোঁয়াচে রোগ বা সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে যে ধারণা রয়েছে সে সম্বন্ধে ইসলামের আকীদা হল- কোন রোগের মধ্যে সংক্রমণের নিজস্ব ক্ষমতা নেই। তাই দেখা যায় তথাকথিত সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত লোকের কাছে যাওয়ার পরও অনেকে আক্রান্ত হয় না, আবার অনেকে না যেয়েও আক্রান্ত হয়ে যায়। রোগের মধ্যে নিজস্ব সংক্রমণ ক্ষমতা না থাকার কথা বলা হয়েছে নিম্নোক্ত হাদীছে ঃ

عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ : لا عدوى ولا طيرة ولا هامة - فقام اليه رجل اعرابى فقال يا رسول الله ! ارايت البعير يكون به الجرب فيجرب الابل كلها ؟ قال ذالكم القدر، فمن اجرب الاول ؟ - (ابن ماجة)

অর্থাৎ, হযরত ইব্‌নে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ রোগ সংক্রমণ নেই, কু-লক্ষণ নেই এবং "হামা" (সম্পর্কিত ধারণার কোন ভিত্তি) নেই। তখন একজন বেদুঈন দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি উট দেখেছেন, তার খোস-পাঁচড়া হয়, অতপর সেটা (তার সাথে উঠা-বসা করা) অন্য সকল উটকে খোস-পাঁচড়াযুক্ত বানিয়ে দেয় ? তিনি (রাসূল [সাঃ]) বললেন ঃ ওটা তাক্‌দীর (ঘটিত)। তাহলে (বল) প্রথমটাকে খোস-পাঁচড়াযুক্ত কে বানাল ?

এ হাদীছে রাসূল (সাঃ) ইসলাম পূর্ব জাহিলী যুগের আরবদের কতিপয় ভ্রান্ত ধারণা-বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে খণ্ডন করেছেন। এ ধারণাগুলির মধ্যে ছিল রোগ সংক্রমণের ধারণা। নবী (সাঃ) এ ধারণা খণ্ডন করে দিয়ে বলেছেন রোগের মধ্যে নিজস্ব কোন সংক্রমণ-ক্ষমতা নেই নতুবা প্রথম উটটা আক্রান্ত হল কিভাবে?

রোগ সংক্রমণ প্রসঙ্গ এবং এতদসম্পর্কিত হাদীছসমূহের মধ্যকার বিরোধ (تعارض) ও তার সমাধান (حل)

এ হাদীছ থেকে বাহ্যতঃ মনে হয় কোন রোগ সংক্রমিত হয় না।এমনিভাবে আবূদাঊদ শরীফে হযরত জাবের (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীছ থেকেও অনুরূপ বোঝা যায়। হাদীছটি এই ঃ

ان رسول الله ﷺ اخذ بيد مجزوم فوضعها معه فى القصعة وقال :كل ثقة بالله وتوكلا عليه - (ابن ماجة)

অর্থাৎ, রাসূল (সাঃ) এক কুষ্ঠ রোগীর হাত ধরে তাকে নিজের সাথে বরতনে আহার করতে বসান এবং বলেনঃ আল্লাহ ভরসা। পক্ষান্তরে বেশ কিছু হাদীছ থেকে এর বিপরীত বোঝা যায় যে, রোগ সংক্রমিত হয়। যেমন বোখারী, মুসলিম ও আবু দাঊদ শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে এসেছে ঃ

لا يوردن ممرض على مصح -(احمد والشيخان وابن ماجة)

অর্থাৎ, যার অসুস্থ উট আছে, সে যেন তার উট সুস্থ ব্যক্তির উটের সাথে পানি পান করতে না পাঠায়। এমনিভাবে বোখারী শরীফে আরও এসেছে ঃ

فر من المجزوم كما تفر من الاسد - (رواه البخارى)

অর্থাৎ, সিংহ থেকে যেমন পলায়ন কর, কুষ্ঠ রোগী থেকেও তদ্রূপ পলায়ন কর।

এই উভয় প্রকার হাদীছ সমূহের মাঝে বাহ্যতঃ বিদ্যমান বিরোধ (تعارض) দূর (حل) করার জন্য উলামায়ে কেরাম তিন ধরনের পন্থা গ্রহণ করেছেন।

১. কতক উলামায়ে কেরাম لا يوردن ممرض على مصح - হাদীছকে لا عدوى ..... الخ হাদীছ দ্বারা রহিত (منسوخ) বলেছেন। তবে আল্লামা নববী দুই কারণে এটাকে ভুল বলেছেন।

(এক) দুই হাদীছের মধ্যে সমন্বয় (تطبيق) সম্ভব, অতএব রহিত হওয়া (نسخ)-এর শর্ত অনুপস্থিত।

(দুই) ناسخ منسوخ বলতে হলে ناسخ হাদীছ যে পরবর্তী তার তারিখ/প্রমাণ জানা থাকা আবশ্যক, অথচ এখানে তা জানা নেই।

২. কতক উলামায়ে কেরাম প্রাধান্য (ترجيح) -এর পন্থা গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে কেউ কেউ لا عدوى হাদীছকে বিপরীত ধরনের হাদীছের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ তার উল্টো করেছেন। তবে প্রাধান্য দেয়ার পন্থা এখানে গ্রহণযোগ্য নয় এ কারণে যে, প্রাধান্য দেয়ার পন্থা গ্রহণ করা হয় তখন, যখন সমন্বয় (تطبيق) সম্ভব না হয়, অথচ এখানে সমন্বয় সম্ভব, যা সামনে উল্লেখ করা হচ্ছে।

৩. কতক উলামায়ে কেরাম সমন্বয় (تطبيق)-এর পন্থা গ্রহণ করেছেন। তাদের মতে এখানে দুই ধরনের হাদীছের মধ্যে ঃ মূলতঃ কোন تعارض বা বৈপরিত্য নেই। যেসব হাদীছে রোগ সংক্রমণ না হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাই মূলতঃ প্রকৃত কথা, আর যে হাদীছে কুষ্ঠ রোগী থেকে দুরে থাকার কথা বলা হয়েছে, তা হল মানুষের আকীদা সংরক্ষণের স্বার্থে। কেননা, এ ধরনের রোগীর সংস্পর্শে যাওয়ার পর আল্লাহ্‌র ফয়সালায় আক্রান্ত হলে তার আকীদা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই ভেবে যে, এই রোগীর সংস্পর্শে আসার কারণেই সে আক্রান্ত হয়েছে। অথচ যা হয়েছে তা আল্লাহ্‌র ফয়সালাতেই হয়েছে।

কেউ কেউ এভাবে সমন্বিত করেছেন যে, বস্তুবাদীরা রোগ সংক্রমণের ক্ষেত্রে রোগের মধ্যে নিজস্ব সংক্রমণ ক্ষমতা আছে বলে মনে করে। জাহিলী যুগের আরবরাও অনুরূপ মনে করত অর্থাৎ, তারা সংক্রামক রোগকে স্বয়ংক্রিয় ক্ষমতাসম্পন্ন (مؤثر بالذات) মনে করে, এ প্রেক্ষিতে হাদীছে "রোগ সংক্রমণ হয় না" বলে রোগের মধ্যে এরূপ নিজস্ব সংক্রমণ ক্ষমতা না থাকার কথা বোঝানো হয়েছে। বরং আল্লাহ্‌র ফয়সালাতেই সংক্রমিত হওয়ার থাকলে আক্রান্ত হয় নতুবা আক্রান্ত হয় না। আর যেসব হাদীছে কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাকার বা রোগাক্রান্ত প্রাণীকে সুস্থ প্রাণীর কাছে নিতে নিষেধ করা হয়েছে, তা এ কারণে যে, এরূপ রোগীর সংস্পর্শ আক্রান্ত হওয়ার কারণ (علت)। তাই কারণ থেকে নিষেধ করা হয়েছে, যেমন পতনোন্মুখ দেয়ালের কাছে যেতে নিষেধ করা হয় এ কারণে যে, তার কাছে গেলে এই যাওয়াটা তার ক্ষতির কারণ হতে পারে। এছাড়াও সমন্বয় সাধনের (تطبيق দেয়ার) আরও বিভিন্ন সূরত হতে পারে।

আল্লামা নববী, مجمع بحار الانوار -এর مصنف -তাহের পাটনী ও হযরত গঙ্গুহী প্রমুখ মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম এ মতটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এ কারণে যে, এতে হাদীছ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন হয়ে যায় এবং কোন সংঘর্ষ থাকে না।

সারকথা ঃ রোগ সংক্রমণ প্রসঙ্গে সহীহ আকীদা হলঃ রোগের মধ্যে সংক্রমণ বা অন্যের মধ্যে বিস্তৃত হওয়ার নিজস্ব ক্ষমতা নেই। কেউ অনুরূপ রোগীর সংস্পর্শে গেলে যদি তার আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ফয়সালা হয়, সে ক্ষেত্রেই সে আল্লাহ্‌র হুকুমে আক্রান্ত হবে, অন্যথায় নয়। কিম্বা এরূপ আকীদা রাখতে হবে যে, এসব রোগের মধ্যে সাভাবিকভাবে আল্লাহ তা'আলা সংক্রমণের এই নিয়ম রেখে দিয়েছেন। তবে আল্লাহর ইচ্ছা হলে সংক্রমণ নাও ঘটতে পারে। অর্থাৎ, সংক্রমণের এ ক্ষমতা রোগের নিজস্ব ক্ষমতা নয়, এর পশ্চাতে আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা এবং তাঁর ইচ্ছার দখল থাকে। তবে ইসলাম প্রচলিত এসব সংক্রামক রোগে আক্রান্ত লোকদের নিকট যেতে নিষেধ করেছে বিশেষভাবে কুষ্ঠ রোগীর নিকট, এ কারণে যে, উক্ত রোগীর নিকট গেলে আর তার আক্রান্ত হওয়ার খোদায়ী ফয়সালা হওয়ার কারণেই সে আক্রান্ত হয়ে থাকলে সে হয়ত ভাববে যে, রোগীর সংস্পর্শে আসার কারণেই সে আক্রান্ত হয়েছে। এভাবে তার আকীদা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তা যেন না হতে পারে এজন্যই ইসলাম এরূপ বিধান দিয়েছে। তবে কেউ মযবূত আকীদার অধিকারী হলে সে অনুরূপ রোগীর নিকট যেতে পারে। এমনিভাবে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত লোককেও সুস্থ এলাকার লোকদের নিকট যেতে নিষেধ করেছে, যাতে অন্য কারও আকীদা নষ্টের কারণ না ঘটে।

রাশি ও গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব সম্বন্ধে আকীদা

রাশি বলা হয় সৌর জগতের কতকগুলো গ্রহ নক্ষত্রের প্রতীককে। এগুলো কল্পিত। এরূপ বারটি রাশি কল্পনা করা হয় যথাঃ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, ও মীন। এগুলোকে বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রের প্রতীক সাব্যস্ত করা হয়েছে। জ্যোতিঃশাস্ত্র (অর্থাৎ, ফলিত জ্যোতিষ বা Astrology)-এর ধারণা অনুযায়ী এ সব গ্রহ নক্ষত্রের গতি, স্থিতি ও সঞ্চারের প্রভাবে ভবিষ্যত শুভ-অশুভ সংঘটিত হয়ে থাকে। নিউমারোলজি বা সংখ্যা জ্যোতিষের উপর ভিত্তি করে এই শুভ-অশুভ নির্ণয় তথা ভাগ্য বিচার করা হয়।

ইসলামী আকীদা অনুসারে গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে নিজস্ব কোন প্রভাব বা ক্ষমতা নেই। সুতরাং ভাগ্য তথা শুভ-অশুভ গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাবে ঘটে এই আকীদা রাখা শির্ক। গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ব এরূপ কোন প্রভাব থাকলে থাকতেও পারে কিন্তু তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। যা কিছু বলা হয় সবই কাল্পনিক। যদি প্রকৃতই এরূপ কোন প্রভাব থাকেও, তবুও তা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ব-গ্রহ নক্ষত্রের ক্ষমতা নয়। অতএব শুভ-অশুভ মৌলিকভাবে আল্লাহ্‌রই ইচ্ছাধীন ও তাঁরই নিয়ন্ত্রণে।[১]

বর্তমান যুগে জ্যোতিষ শাস্ত্র বা Astrology-এর ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটা এবং এ ব্যাপারে বহু লোকের আকীদা ও আমলগত বিভ্রান্তি ঘটায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত একটি প্রবন্ধ পেশ করা হল।

জ্যোতিঃশাস্ত্র ও ইসলাম

অধুনা জ্যোতিঃশাস্ত্রের চর্চা বেশ ব্যাপকতা লাভ করেছে। ভাগ্য বিড়ম্বিত মানুষ সর্বশেষ পন্থা হিসেবে জ্যোতিষীদের দারস্থ হচ্ছেন এবং তাদের দেয়া পাথর বা অন্য কোন পরামর্শকে ভাগ্য-ফেরানোর নিয়ামক ভেবে শেষ রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। অনেকে বিবাহ-শাদি, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেখা-পড়া, বিদেশ গমন, ঘর-বাড়ি নির্মাণ ইত্যাদি জীবনের অনেক ক্ষেত্রের ভবিষ্যত শুভ-অশুভ জানার জন্য জ্যোতিষীদের আগাম ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নিচ্ছেন এবং সাফল্য লাভ করবেন বলে আত্মস্থ থাকছেন। এভাবে জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীকে তারা জীবন পরিচালনার গাইড বানিয়ে চলছেন। জ্যোতিষীদের ব্যবসাও ভাল চলছে। জ্যোতিঃশাস্ত্র চর্চায় ব্যবসা ভাল দেখে এ বিদ্যা শিক্ষার হারও তাই বেড়ে চলেছে। কিন্তু এ শাস্ত্রের হিসাব-নিকাশ ও তার ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন বা এ শাস্ত্র চর্চা ইসলামে কতটুকু অনুমোদিত তা ঈমান-আকীদা সংরক্ষণে প্রয়াসী এবং জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে আগ্রহী একজন সচেতন মুসলমানকে অবশ্যই জানতে হবে।

জ্যোতিঃশাস্ত্র বলতে দুটো শাস্ত্রকে বোঝানো হয়।

(এক) নক্ষত্রবিদ্যা অর্থাৎ, চন্দ্র সূর্য ইত্যাদি গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান, আকৃতি ও গতি সম্পর্কে যে শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। এ শাস্ত্রকে ইংরেজীতে বলা হয় Astronomy। আরবীতে বলা হয় علم الهيئة।

---

১. فتح الملهم جـ١/ ও آپ کے مسائل اور انکا حل جـ١/ থেকে গৃহীত ॥

(দুই) গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কে যে শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। এ শাস্ত্রে নক্ষত্রের গতি, স্থিতি ও সঞ্চার অনুসারে ভবিষ্যত শুভ-অশুভ বিচার করা হয়। ভবিষ্যত শুভ অশুভ নিরূপন-বিষয়ক এ শাস্ত্রকে ফলিত জ্যোতিষ বা Astrology বলা হয়। "আরবীতে ইলমুন্নুজূম" (علم النجوم) বলতে বিশেষ ভাবে এই ফলিত জ্যোতিষ বা Astrology কেই বোঝানো হয়। আরবীতে বিশেষভাবে এটাকে ইলমু-আহ্কামিন্নুজূম (علم احكام النجوم) বলা হয়। তবে সূর্যের বিভিন্ন ডিগ্রীতে অবস্থানের তারতম্যে আবহাওয়া এবং শীত গ্রীষ্মের অর্থাৎ, মৌসুমের যে পরিবর্তন, চন্দ্রের প্রভাবে জোয়ার ভাটা ইত্যাদির যে, প্রাকৃতিক পরিবর্তন, এটাকেও সাধারণ ভাবে ইলমুন্নুজূম-এর অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়। এটাকে বিশেষভাবে 'ইল্মুন্নুজূম তাবিয়ী' বলা হয়। বাংলা ইংরেজীতে এ শাস্ত্রের বিষয়গুলো ভূগোল শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। চন্দ্র সূর্য ইত্যাদি গ্রহ নক্ষত্রের গতি ও চলাচল সম্পর্কিত বিদ্যা যা সাধারণতঃ Astronomy -তে আলোচিত হয়ে থাকে, আরবীতে এটাকেও "ইল্মুন্নুজূম"-এর অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়। এটাকে বিশেষভাবে "ইল্মুন্নুজূম হিছাবী" বলা হয়।

Astronomy (নক্ষত্র বিদ্যা) শিক্ষা করা অর্থাৎ, গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান, আকৃতি ও গতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। নিষিদ্ধ হল ভাগ্যের ক্ষেত্রে গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষা করা বা তাতে বিশ্বাস করা। আল্লামা ইব্নে রজব বলেনঃ

فالماذون فى تعلمه علم التسيير لا علم التاثير فانه باطل محرم قليله وكثيره - (فتح الملهم جـ١)

অর্থাৎ, গ্রহ নক্ষত্রের গতি ও চলাচল সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করার অনুমতি রয়েছে তবে (ভাগ্যের শুভ-অশুভের ক্ষেত্রে) তার প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা (অল্প হোক বা বিস্তার) নিষিদ্ধ এবং হারাম।

যাহোক Astronomy শিক্ষা করা নিষিদ্ধ নয় বরং এর কিছু কিছু অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিষয়ে উপকারে আসে। অজানা স্থানে রাতের বেলায় কেবলা নির্ধারণের জন্য উত্তর আকাশের ধ্রুবতারা (North Star) চেনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আর ধ্রুবতারা চিনতে হলে প্রয়োজন হয় সপ্তর্ষি মন্ডল (Ursa major/Great Bear) চেনার এবং সন্ধার আকাশে, মধ্যরাতের আকাশে এবং শেষ রাতের আকাশে সপ্তর্ষিমন্ডলের অবস্থান কেমন থাকে তা জানার। দক্ষিণ আকাশেও এমন কিছু নক্ষত্র আছে যা দ্বারা দিক চেনা যায়। আর রাত কতটা গভীর হল তা বোঝা যায় 'কাল পুরুষ' (Orion) নামক তারকা মন্ডলের অবস্থান দেখে। কুরআনে কারীমে বাণিজ্যিক সফরের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

وبالنجم هم يهتدون -

অর্থাৎ, তারকারাজি দ্বারাও তারা পথের (দিকের) পরিচয় লাভ করে থাকে। (সূরা নাহ্লঃ ১৬) এ বক্তব্য দ্বারা এদিকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, তারকারাজি সৃষ্টি করার আসল উদ্দেশ্য অন্য কিছু হলেও পথের (দিকের) পরিচয় লাভ এবং দিক নির্ণয় করতে পারাও অন্যতম উপকারিতা। সহীহ্ বোখারীতে হযরত কাতাদাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, এই নক্ষত্রগুলি

তিন উদ্দেশ্যে- আল্লাহ এগুলিকে আকাশের সৌন্দর্য, শয়তানদের জন্য ক্ষেপণাস্ত্রবৎ এবং পথ লাভ করার নিদর্শন বানিয়েছেন।[১]

গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থানের দূরত্ব এবং আকৃতির বিশালতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান আল্লাহ্র কুদরত অনুধাবনে সহায়ক হয় এবং ঈমান বৃদ্ধির কারণ ঘটে। হাজার হাজার কোটি আলোক বর্ষ দূরে থাকা একটি নক্ষত্র সম্পর্কে অবগতি লাভ হলে তার চেয়ে উপরের বিশাল অবস্থানে জুড়ে থাকা জান্নাতের পরিধির বিশালতায় বিশ্বাস স্থাপন করা সহজ লাগে, আর তখন সর্বনিম্ন জান্নাতী-র জন্য জান্নাতে কমপক্ষে দশ দুনিয়া পরিমাণ স্থান থাকার কথা আর মোল্লাদের অন্ধবিশ্বাস বলে মনে হয় না এই যুক্তিতে যে, জান্নাতে এত স্থান আসবে কোত্থেকে ?

আল্লাহ্র সৃষ্টি নিয়ে যে চিন্তা করার নির্দেশ হাদীছে এসেছে, Astronomy-এর বিদ্যা সে চিন্তাকে বিকশিত করতে সহায়ক হয়ে থাকে। এ দৃষ্টিভংগীতে এ শাস্ত্র শিক্ষা করা গর্হিত হবে না বরং প্রশংসিত হবে। হাদীছে বর্ণিত হয়েছেঃ

تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى الله - (رواه ابو نعيم)

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা কর, আল্লাহর সত্তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কর না।[২]

" ইল্‌মুন্নুজূম তবীয়ী" (علم النجوم الطبيعى) অর্থাৎ, সূর্যের বিভিন্ন ডিগ্রীতে অবস্থানের তারতম্যে আবহাওয়া ও মৌসুমের পরিবর্তন এবং শীত গ্রীষ্মের আবর্তন সম্পর্কিত বিদ্যাও ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। (فتح الملهم جـ١/) এ বিদ্যা শিক্ষার জন্য ইসলামে নিষেধাজ্ঞাও নেই আবার তেমন ধর্মীয় উপকারিতাও নেই শুধু এতটুকু যে, এর দ্বারা আল্লাহর কুদরত অনুধাবিত হয়ে থাকে। এক মৌসুমে দিন ছোট রাত বড়, আবার অন্য মৌসূমে দিন বড় রাত ছোট হয়ে থাকে, এটাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতের আলামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছেঃ

تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل -

অর্থাৎ, তুমি রাতকে দিনের ভিতরে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভিতরে প্রবেশ করাও। (সুরাঃ ৩-আলু ইমরানঃ ২৭)

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

ان فى خلق السموت والارض واختلاف الليل والنهار لايت لاولى الالباب -

অর্থাৎ, নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে (কুদরতের) নিদর্শন রয়েছে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্য। (সূরাঃ ৩-আলু ইমরানঃ ১৯০)

এখানে রাত ও দিনের আবর্তন (اختلاف الليل والنهار) বলতে যেমন একের গমন ও অপরের আগমন অর্থ বোঝায়, তেমনী কম-বেশী হওয়ার অর্থও বোঝায়। যেমন শীত কালে রাত দীর্ঘ এবং দিন খাটো হয়, গরম কালে তার বিপরীত। অনুরূপ এক দেশ

---

১. الاتحاف ॥ ২. المقاصد الحسنة ॥

থেকে অন্য দেশে রাত দিনের দৈর্ঘে তারতম্য হয়ে থাকে। যেমন উত্তর মেরুর নিকটবর্তী দেশগুলোতে দিবাভাগ উত্তরমেরু থেকে দূরবর্তী দেশের তুলনায় দীর্ঘ হয়। এসব কিছুই আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শন।

"ইল্‌মুন্নুজূম হিছাবী" (علم النجوم الحسابي) অর্থাৎ, চন্দ্র সূর্য ইত্যাদির গতি, কক্ষপথ ও চলাচল সম্পর্কিত হিসাব নিকাশের বিদ্যা। জ্যোতিঃশাস্ত্র (Astronomy, Astrology) ও ভূগোলে সবটাতেই এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়ে থাকে। ইসলাম এরূপ একটা হিসাব-নিকাশের তথ্য মৌলিক ভাবে স্বীকার করেছে তবে তার বিস্তারিত বিবরণ এবং চুলচেরা বিশ্লেষণ প্রদান থেকে বিরত রয়েছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছেঃ

الشمس والقمر بحسبان -

অর্থাৎ, সূর্য ও চন্দ্র হিসাব মত চলে। (সূরাঃ ৫৪-আর রহমানঃ ৫)

এ আয়াতের উদ্দেশ্য হল- সূর্য ও চন্দ্রের গতি এবং কক্ষ পথে বিচরণের অটল ব্যবস্থা একটি বিশেষ হিসাব ও পরিমাণ অনুযায়ী চালু রয়েছে। সূর্য ও চন্দ্র প্রত্যেকের পরিক্রমের আলাদা আলাদা হিসাব রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের হিসাবের উপর সৌর ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এসব হিসাবও এমন অটল ও অনড় যে, লাখো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এতে এক মিনিট বা এক সেকেন্ডের পার্থক্য হয়নি। (মাআরেফুল কুরআন)

এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ

هو الذى جعل الشمش ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب -

অর্থাৎ, তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি সূর্যকে বানিয়েছেন উজ্জল আলোকময় আর চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলোকময়। অতঃপর নির্ধারিত করেছেন তার জন্য মনযিলসমূহ যাতে তোমরা চিনতে পার বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব। (সূরাঃ ১০-ইউনুসঃ ৫)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র সূর্যের চলাচলের জন্য বিশেষ সীমানা নির্ধারণ করার কথা উল্লেখ করেছেন। যার প্রত্যেকটিকে একেক মনযিল বলা হয়। চাঁদ যেহেতু প্রতিমাসে তার নিজস্ব কক্ষপথে পরিক্রমণ সমাপ্ত করে ফেলে, সেহেতু তার মনযিল হল ত্রিশ অথবা উনত্রিশটি। তবে যেহেতু চাঁদ প্রতিমাসে একদিন লুকায়িত থাকে, তাই সাধারণতঃ চাঁদের মনযিল আঠাশটি বলা হয়। আরবের প্রাচীন জাহেলিয়াত যুগে এবং জ্যোতির্বিদদের মতেও এই মনযিলগুলির নাম সেসব নক্ষত্রের সাথে মিলিয়ে রাখা হয়েছে যেগুলো সেসব মনযিলের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। কুরআন হাদীছে এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। কেননা এগুলোর খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ অঙ্কশাস্ত্রের হিসাবাদির উপর নির্ভরশীল। আর ইসলাম তার বিধি-বিধানের ভিত্তি অঙ্কশাস্ত্রের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণের উপর রাখেনি। যেমন চাঁদের হিসাবে বছর, মাস ও দিন তারিখ নির্ধারিত হয় এবং এর সাথে ইসলামের অনেক বিধি- বিধানের সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু চাঁদ হল কি হল না তার ভিত্তি গণিতিক হিসাবের উপর নয় বরং কেবল চাঁদ দেখা ও প্রত্যক্ষ করার উপর রাখা হয়েছে।

যেহেতু এসব খুটিনাটি হিসাবের সাথে ইসলামী কোন বিধানের সম্পর্ক রাখা হয়নি। তাই এগুলি সম্পর্কে বিদ্যার্জন ইসলামের দৃষ্টিতে অনর্থক। চাঁদ কেন বাড়ে কমে, এরকম বৃদ্ধি, আত্মগোপন ও উদয়ের রহস্য কি ? এ-সম্পর্কে কতিপয় সাহাবী রাসূল (সাঃ) কে প্রশ্ন করলে কুরআন তার জওয়াবে বলেঃ

قل هي مواقيت للناس -

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ এবং হজ্জের সময় ঠিক করার মাধ্যম। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ১৮৯)

মুফতী শফী সাহেব (রহঃ) লিখেছেন যে, এ জওয়াব ব্যক্ত করেছে যে, তোমাদের প্রশ্ন অনর্থক। এ রহস্য জানার উপর তোমাদের কোন ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয় নির্ভরশীল নয়। তাই তোমাদের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজনের সাথে সম্পর্ক রাখে-এমন প্রশ্নই করা দরকার। (معارف القرآن)

"ফলিত জ্যোতিঃশাস্ত্র" (Astrology/ العلم باحكام النجوم) যাতে গ্রহ নক্ষত্রের গতি, স্থিতি, সঞ্চার অনুসারে ভবিষ্যত শুভ-অশুভ নিরূপণ করা হয়, ভবিষ্যত শুভ-অশুভ বিচার করা হয়। এ শাস্ত্র সম্পর্কে ইসলাম কঠোর নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছে। ইসলামী আকীদা অনুসারে গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে নিজস্ব কোন প্রভাব বা ক্ষমতা নেই। সূতরাং ভাগ্য তথা শুভ-অশুভ গ্রহ নক্ষত্রের নিজস্ব প্রভাবে ঘটে-এরূপ বিশ্বাস রাখা শির্ক ও কুফ্র। গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত কোন প্রভাব থাকলে থাকতেও পারে। কিন্তু তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। যা কিছু বলা হয় তা সবই কাল্পনিক। যদি প্রকৃতই এরূপ কোন প্রভাব থাকেও, তবুও তা আল্লাহ কর্তৃক-গ্রহ নক্ষত্রের নিজস্ব ক্ষমতা নয়। অতএব শুভ-অশুভ মৌলিক ভাবে আল্লাহ্রই ইচ্ছাধীন ও তাঁরই নিয়ন্ত্রণে।

হাদীছে বর্ণিত হয়েছেঃ

من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الكفر - (الاتحاف)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি জ্যোতিঃশাস্ত্রের একটা অধ্যায় শিক্ষা করল, সে কুফরের একটা অধ্যায় শিক্ষা করল।

এ হাদীছে জ্যোতিঃশাস্ত্র শিক্ষা করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রকে কুফ্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অন্য এক হাদীছে জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশ্বাস করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। ইরশাদ হয়েছেঃ

اخاف على امتى بعدى خصلتين تكذيبا بالقدر وتصديقا بالنجوم (اسناده حسن اخرجه ابو يعلى فى مسنده وابن عدى فى الكامل والخطيب فى كتاب النجوم عن انس - كذا فى الاتحاف)

অর্থাৎ, আমার পরে আমার উম্মতের ব্যাপারে আমি দুটি বিষয়ের আশংকা করছি-তাকদীরে অবিশ্বাস ও গ্রহ নক্ষত্রের বিশ্বাস।

অন্য এক হাদীছে গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কে নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ

لا تسالوا عن النجوم ..... الخ (اخرجه الديلمى فى الفردوس وابن حصر فى اماليه والسيوطى فى الجامع الكبير - كذا فى الاتحاف)

অর্থাৎ, তোমরা গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কে জানতে চাইবে না।

অন্য এক হাদীছে গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনা থেকেও বিরত থাকতে বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ

اذا ذكر القدر فامسكوا واذا ذكرت النجوم فامسكوا واذا ذكر اصحابى فامسكوا - (اخرجه الطبرانى باسناد حسن - كذا فى الاتحاف)

অর্থাৎ, তাকদীর সম্পর্কে চুলচেরা আলোচনা উঠলে তা থেকে বিরত থাকবে। গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা উঠলে তা থেকে বিরত থাকবে। আমার সাহাবীদের সমালোচনা উঠলে তা থেকে বিরত থাকবে।

উপরোক্ত চারটি হাদীছ থেকে বোঝা গেল গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কে বিশ্বাস করা, এ সম্পর্কিত বিদ্যা শিক্ষা করা, এ সম্পর্কে জানতে চাওয়া এবং এ সবের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া সবই নিষিদ্ধ।

গ্রহ নক্ষত্রের নিজস্ব প্রভাব আছে বলে বিশ্বাস করা কুফরী তবে ইমাম শাফিঈ (রহঃ) বলেছেনঃ যদি কেউ আল্লাহ্‌কেই মূল নিয়ন্তা বলে বিশ্বাস করে, তবে আসবাব বা উপকরণের মাধ্যমে সবকিছু সংঘটনের চিরাচরিত খোদায়ী নিয়মানুসারে গ্রহ নক্ষত্রের মাধ্যমে কোন প্রভাব তিনি সংঘটিত করছেন বলে মনে করলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। সে ক্ষেত্রে হাদীছের নিষেধাজ্ঞা ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে যে গ্রহ নক্ষত্রের নিজস্ব প্রভাব আছে বলে বিশ্বাস করে। তবে বিশ্বাস যাই থাকুক কোন অবস্থাতেই কোন প্রভাবকে কোন গ্রহ নক্ষত্রের প্রতি সম্পৃক্ত করার অনুমতি নেই। তা ছাড়া যে ব্যাখ্যায় ইমাম শাফিঈ (রহঃ) গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাস করার অনুমতি দিয়েছেন সাধারণ ভাবে উলামায়ে কেরাম অনুরূপ ব্যাখ্যা সহকারেও তা বিশ্বাস করাকে হারাম বলেছেন। আর বিনা ব্যাখ্যায় গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাস করাকে কুফ্‌র বলে আখ্যায়িত করেছেন। গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাবের পশ্চাতে আল্লাহকে মূল নিয়ন্তা মেনে নেয়ার পরও জ্যোতিঃশাস্ত্র (Astrology) চর্চার ব্যাপারে পূর্বোক্ত কঠোর নেতিবাচক মনোভাব অব্যাহত থাকবে। ইমাম গাযালী (রহঃ) এহ্‌য়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে তার তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন

১. গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাবের আলোচনা শুনতে শুনতে ক্রমান্বয়ে অন্তরে তার নিজস্ব প্রভাব থাকার ধারণা জন্ম নিবে, এভাবে ঈমান বিনষ্ট হবে।
২. এ বিদ্যায় কোন উপকারিতা নিহিত নেই। অতএব এটা একটা অনর্থক বিষয়ে মূল্যবান সময় অপচয় করার নামান্তর।
৩. এ শাস্ত্র কোন কিছু যুক্তি, চাক্ষুস প্রমাণ বা কুরআন হাদীছের দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়, বরং এ শাস্ত্রের সবকিছুই আনুমানিক ও কাল্পনিক।

এ শাস্ত্রের সবকিছুই যে কাল্পনিক, যুক্তি বা বিজ্ঞান নির্ভর নয় ও দলীল প্রমাণ বিহীন, তার কিঞ্চিত ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদান করা হল।

প্রথমতঃ ধরা যাক রাশির কথা। জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে রাশি হল বারটি যথাঃ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। সূর্য বার মাসে বারটা রাশিতে অবস্থান করে বিধায় রাশির সংখ্যা বারটা। আর সূর্যের যে রাশিতে অবস্থান কালে কারও জন্ম হয় তাকে সেই রাশির জাতক/জাতিকা বলা হয়। কিন্তু রাশি সূর্যের অবস্থানের প্রেক্ষিতে কেন হবে চন্দ্র বা অন্য কোন গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থানের প্রেক্ষিতে কেন হবে না তার কোন বৈজ্ঞানিক বা দলীল সাপেক্ষ ব্যাখ্যা নেই। এই রাশির নামগুলিও কাল্পনিক, এসব রাশির যে প্রতীক সাব্যস্ত করা হয়েছে তাও কাল্পনিক। এক এক রাশির যে নম্বর এবং তার যে মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধরে নেয়া হয়েছে তাও কাল্পনিক। এসব সম্পর্কে কুরআন হাদীছে কোন দলীল তো নেই-ই কোন ল্যাবরেটরিতে বৈজ্ঞানিক ভাবেও এগুলো প্রমাণিত নয়।

দ্বিতীয়তঃ ধরা যাক সংখ্যা তত্ত্বের কথা। জ্যোতিষীগণ নিউমারোলজি বা সংখ্যা তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যত শুভ-অশুভ নির্ণয় তথা ভাগ্য বিচার করে থাকেন। সংখ্যা জ্যোতিষের মূল কথা হল- ১ থেকে ৯-এই নয়টি সংখ্যা হল মৌলিক এবং এক এক সংখ্যার এক এক ধরনের প্রভাব রয়েছে। সেমতে প্রত্যেক মানুষ নয় সংখ্যার যে কোন এক সংখ্যার জাতক/জাতিকার হবেন এবং যিনি যে সংখ্যার জাতক/জাতিকা হবেন তার জীবনে ঐ সংখ্যার প্রভাব এবং ঐ সংখ্যার চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে। যেমন বলা হয় ১ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা অগ্রপথিক এবং অভিযাত্রিক হবেন, তাদের মধ্যে একটা সহজাত সৃজনশীলতা প্রচ্ছন্ন থাকবে ইত্যাদি। ২ সংখ্যার জাতক/জাতিকারা ভদ্র ও বিনয়ী তারা কল্পনা প্রবণ, রোমান্টিক ও শিল্পানুরাগী হবেন ইত্যাদি। এখন কথা হল এই যে এক এক সংখ্যার এক এক ধরনের বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করা হল এটা কাল্পনিক ছাড়া আর কি ? আর মানুষের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যকে এই নয়-এর গন্ডিতে সীমাবদ্ধ করার কোন যুক্তি বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি শুধু কল্পনার অন্ধ অনুসরণ ছাড়া ?

তৃতীয়তঃ আলোচনা করা যাক জাতক/জাতিকা নির্ধারণের পদ্ধতি প্রসঙ্গে। জ্যোতিঃশাস্ত্র মতে কে কোন সংখ্যার জাতক/জাতিকা তা নির্ধারণ করা হয় তার জন্ম তারিখ (ইংরেজি তারিখ) দেখে। জন্ম তারিখ ১ থেকে ৯ পর্যন্ত যেটা হবে সেটাই হল তার জন্ম সংখ্যা। আর ৯-এর উপরের যৌগিক সংখ্যা হলে সেই যৌগিক সংখ্যাকে পারস্পরিক যোগ দিতে দিতে যে মৌলিক সংখ্যা বের হবে সেটাই হবে তার জন্ম সংখ্যা এবং সে হবে ঐ সংখ্যার জাতক/জাতিকা। যেমন ১৮ তারিখে কারও জন্ম হলে সে হবে (১+৮ = ৯) ৯ সংখ্যার জাতক/জাতিকা। ২১ তারিখে জন্ম হলে সে হবে (২+১= ৩) ৩ সংখ্যার জাতক/জাতিকা। ২৯ তারিখে জন্ম হলে সে হবে (২+৯=১১-১+১= ২) ২ সংখ্যার জাতক/জাতিকা।

জ্যোতিঃশাস্ত্র মতে জাতক/জাতিকাদের আরও দুই ধরনের সংখ্যা আছে। তাহল কর্ম সংখ্যা ও নাম সংখ্যা। জন্ম সংখ্যা হচ্ছে জন্ম তারিখ/তারিখের যোগফল, আর কর্ম সংখ্যা

হচ্ছে জন্ম বছর, জন্ম মাস ও জন্ম তারিখ-এই সব কয়টার যোগফল। যেমন কেউ জন্ম গ্রহণ করল ১লা নভেম্বর ১৯৪৮ সালে তাহলে নভেম্বর যেহেতু ১১তম মাস তাই কর্ম সংখ্যা বের হবে এভাবে ১+১+১+১+৯+৪+৮ = ২৫

আবার ২+৫ = ৭

অতএব ১-১১-১৯৪৮ সালে জন্ম গ্রহণ কারীর জন্ম সংখ্যা ১ আর কর্ম সংখ্যা হল ৭।

জ্যোতিষীদের ধারণা হল জন্ম সংখ্যা নির্দেশ করে জাতক/জাতিকার সহজাত চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। আর কর্ম সংখ্যা থেকে জানা যায় জাতক/জাতিকার জীবনে কোন্ কর্ম পন্থা অবলম্বন করা উচিত, কোন্ পেশায় তার অগ্রগতি নিহিত। কোন্ পথে অগ্রসর হয়ে সে সাফল্য লাভ করতে পারবে ইত্যাদি। জন্ম সংখ্যার ন্যায় কর্ম সংখ্যাও ১ থেকে ৯ পর্যন্ত মোট ৯টি ।

এখন কথা হল জন্ম সংখ্যা দ্বারা যে জাতক/জাতিকা নির্ধারণ হবে তার কি প্রমাণ ? আর কর্ম সংখ্যার জন্য জন্মের তারিখ, মাস ও সন সবটা যোগ করতে হবে এবং জন্ম সংখ্যার জন্য শুধু জন্মের তারিখ দেখা হবে সন মাস যোগ করা হবে না-এসবের ভিত্তি কি ? স্পষ্টত:ই এখানে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকা সম্ভব নয়। কারণ এটা কোন পদার্থগত বিষয় নয়। থাকলে কোন ঐশী দলীল থাকতে পারত, তাও অনুপস্থিত। তাহলে কল্পনা ব্যতীত আর কি ভিত্তি রয়ে গেল ? আর একটা কথা চিন্তা করা যায়। তাহল- জন্ম সংখ্যা কর্ম সংখ্যা এসবই বের করা হয় ইংরেজী তারিখ ও ইংরেজী সন মাস থেকে। ইংরেজী সন গণনা করা হয় ঈসা (আঃ)-এর জন্ম থেকে। তাহলে ঈসা (আঃ)-এর জন্মের ভিত্তিতে শুরু করা হিসাবের সাথে সারা প্রথিবীর মানুষের জন্ম সংখ্যা, কর্ম সংখ্যা তথা চরিত্র ভাগ্য সব কিছুর সম্পর্ক- এরই বা কি প্রমাণ ? পৃথিবীর আদি থেকে যে আরবী মাস ও সন গণনা শুরু তার সাথে সম্পর্কিত হলেও না হয় ক্ষণিকের জন্য কিছুটা মেনে নেয়ার চিন্তা করা যেত।

জ্যোতিষীদের ধারণা মতে জন্ম সংখ্যা ও কর্ম সংখ্যার ন্যায় মানুষের রয়েছে একটি নাম সংখ্যা। প্রত্যেকের নামের ইংরেজী হরফগুলোর মান (সংখ্যা) থেকে বের করা হয় নাম সংখ্যা। ইংরেজীতে হরফের মান সংখ্যা নিম্নরূপঃ

1	2	3	4	5	6	7	8
A	B	C	D	E	U	O	F
i	K	L	M	H	V	Z	P
J	R	S	T	N	W		
Q		G		X			
y							

জ্যোতিষীদের ধারণা- প্রত্যেকের নামের মধ্যে তার জীবনের লক্ষ্য ও মিশন সম্পর্কে নির্দেশনা লুকিয়ে থাকে। কি কি গুণাবলী অর্জন করতে হবে, কি কি বর্জন করতে হবে, কোন্ কোন্ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে নামের সংখ্যার মধ্যে এসব কিছুরই দিক নির্দেশনা থাকে। এ ক্ষেত্রেও জ্যোতিষীগণ ১ থেকে ৯ মোট ৯টি সংখ্যা নির্ধারণ করে প্রত্যেক সংখ্যার জন্য এক এক ধরনের দিক নির্দেশনা করে রেখেছেন।

জ্যোতিষীগণ কি এর কোন জবাব দিতে পারবেন যে, ইংরেজী এক এক হরফের এক এক মান দেয়া হয়েছে - এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কি ? কিংবা এর স্বপক্ষে কোন ঐশী প্রমাণ আছে কি ? আর নাম সংখ্যার মধ্যে যদি কোন জীবনের দিক নির্দেশনা লুকিয়ে থাকেও তবে তা বের করতে ইংরেজী হরফের আশ্রয় নেয়া হবে কেন ? অন্য কোন ভাষার হরফ গ্রহণ করা যাবে না তার কি প্রমাণ ? অন্য ভাষার হরফে গেলে যে নাম সংখ্যায় পার্থক্য দেখা দিবে তার সমাধান কি ?

কেউ কেউ কুরআন হাদীছের ভাষা এবং প্রথম মানব আদম (আঃ) এর ভাষা ও জান্নাতের ভাষা আরবী-এর হিসাবে আরবী হরফের মান দেখে নাম সংখ্যা বের করে থাকেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার আরবী হরফের যে মান ধরা হয় তাও কুরআন-হাদীছ বা বৈজ্ঞানিক তথ্যে প্রমাণিত নয় তাছাড়া আরবী হরফ অনুযায়ী নাম সংখ্যা বের করার পর ঐ সংখ্যার যে প্রভাব বা দিক নির্দেশনা সাব্যস্ত করা হচ্ছে তাতো জ্যোতিষীদেরই সাব্যস্ত করা কাল্পনিক ব্যাপার।

এমনি ভাবে জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রত্যেকটা উপাত্ত সম্পর্কে সামান্য চিন্তা করলেই প্রতিভাত হবে যে, তা একান্তই কল্পনা প্রসূত এবং দলীলহীন আন্দাজ মাত্র।

মুফতী শফী সাহেব (রহঃ) জওয়াহেরুল ফেকাহ ৩য় খন্ডে লিখেছেন যে, আল্লামা মাহমূদ আলূছী তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে ঐতিহাসিক এমন বহু ঘটনার উল্লেখ করেছেন যেসব ক্ষেত্রে জ্যোতিঃশাস্ত্রের স্বীকৃত নীতি অনুযায়ী ঘটনা যা ঘটার ছিল বাস্তবে সম্পূর্ণ তার বিপরীত ঘটেছে। বস্তুতঃ এ শাস্ত্রের বহু বড় বড় ব্যক্তিত্ব শেষ পর্যন্ত অকপটে একথা বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, এ শাস্ত্রের পরিণাম অনুমানের উর্ধ্বে নয়। প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ কুশিয়ার দায়লামী তার রচিত জ্যোতিঃশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ- "আল্ মুজ্মাল ফিল আহ্কাম"-য়ে লিখেছেন যে, জ্যোতি:বিদ্যা হল একটা দলীলহীন বিদ্যা, এতে মানুষের কল্পনা ও অনুমানের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

দুটি প্রশ্নের উত্তর লিখেই প্রবন্ধ শেষ করছি। একটা প্রশ্ন হল জ্যোতি:বিদদের সব ভবিষ্যদ্বাণী না হলেও কিছু কিছু তো বাস্তবে সত্যে পরিণত হয়। এতে করে বোঝা গেল এ শাস্ত্রের ভিত্তি রয়েছে, সবটাই অনুমান ভিত্তিক নয়। এ প্রশ্নের একটা উত্তর হল-যে কোন বিষয়ে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা অর্জন হলে মানুষ হাবভাব ও লক্ষণ দেখে সে সম্বন্ধে কিছু ভবিষ্যত-বাণী করতেও পারে, যার কিছুটা খেটেও যায়। তাই বলে সেটা কোন প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্র বলে স্বীকৃতি পেতে পারে না। এ প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তর হল যা একটি প্রসিদ্ধ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, আসমানে যখন পৃথিবীর ফয়সালা ঘোষিত হয় তখন গুপ্তসারে জিন শয়তানরা তার কিছুটা শুনে নিতে সক্ষম হয়। তারা সেই শ্রুত তথ্যের সাথে আরও শতটা মিথ্যা যোগ করে গণক ও জ্যোতিষীদের অন্তরে তা প্রক্ষিপ্ত করে, আর জ্যোতিষী-ও গণকরা তা মানুষদেরকে শোনায়। পরে দেখা যায় কিছুটা সত্যে পরিণত হয়। এটা হল সেই অংশ যা আসমান থেকে জিন শয়তানরা উদ্ধার করেছিল। হাদীছটি বোখারী, মুসলিম, ইবনে মাজা ও মুসনাদে আহ্মদে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল ভবিষ্যত শুভ-অশুভের ক্ষেত্রে গ্রহ-নক্ষত্রের কি আদৌ কোন প্রভাব নেই? জড়জগতের অনেক কিছুর ক্ষেত্রে উর্ধ্ব জগতের অনেক কিছুর যেমন প্রভাব রয়েছে, তেমনি মানুষের ভাগ্য তথা শুভ-অশুভ -এর ক্ষেত্রে গ্রহ-নক্ষত্রের কিছু প্রভাব থাকবে তাতে অসম্ভবতা কি ? এরকম প্রশ্নের উত্তর হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ (রহঃ) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা গ্রন্থে প্রদান করেছেন যে, শরী'আত গ্রহ-নক্ষত্রের এরূপ প্রভাবের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেনি, তবে তা চর্চা করতে নিষেধ করেছে। এই চর্চা করতে কেন নিষেধ করা হয়েছে তার কারণ সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। সারকথা শুভ-অশুভের ক্ষেত্রে গ্রহ নক্ষত্রের কোন প্রভাব থাকলে থাকতেও পারে, তবে তা কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়; না কুরআন হাদীছের দলীল প্রমাণ, না চাক্ষুস কোন দলীল প্রমাণ, না বৈজ্ঞানিক কোন দলীল প্রমাণ। যা কিছু এ শাস্ত্রের উপাত্ত ও মূলনীতি, তা সবই কাল্পনিক এবং যা কিছু বলা হয় তা সেই কল্পনা প্রসূত উপাত্ত নির্ভর বা কিছুটা অভিজ্ঞতার সংমিশ্রনযুক্ত, প্রকৃত দলীল সাপেক্ষ নয়।

এ বিষয়ে সর্বশেষ আর একটা বিষয় জানার হলঃ কোন পাথর (Stone) ভাগ্য বদলাতে পারে, কোন গ্রহকে খুশী করে তার অনুকূলে আনতে পারে-এরূপ বিশ্বাস করা শির্ক এর পর্যায়ভুক্ত। তবে পাথরের কোন বিকিরণ ক্ষমতা (Radiative activity) যদি বৈজ্ঞানিক ভাবে শারীরিক উপকারে আসে বলে প্রমাণিত হয়, তবে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করায় কোন অসুবিধা নেই।[১]

হস্ত রেখা বিচার সম্বন্ধে আকীদা

পামিস্ট্রি (Palmistry) বা হস্তরেখা বিচার বিদ্যার মাধ্যমে যে হাতের রেখা ইত্যাদি দেখে ভাগ্যের বিষয় ও ভূত-ভবিষ্যতের শুভ-অশুভ সম্পর্কে বিশ্লেষণ দেয়া হয়, ইসলামে এরূপ বিষয়ে বিশ্বাস রাখা কুফরী।[২]

---

১. এ প্রবন্ধে উল্লেখিত তথ্যসূত্র ঃ

(১) الاتحاف للزبيدى

(২) فتح الملهم، الشيخ شبير احمد العثمانى

(৩) تفسير معارف القرآن ، مفتى محمد شفيع

(৪) جواهر الفقه، مفتى محمد شفيع

(৫) المقاصد الحسنة

(৬) الصحيح لمسلم

(৭) السنن لابن ماجة

(৮) আকাশ ভরা সূর্য তারা- এ এম হারুন অর রশীদ

(৯) তারামন্ডল পরিচয় ও বিশ্বের বিশালতা- কামিনী কুমার দে

(১০) নিউমারোলজী সংখ্যা / সৌভাগ্যের চাবিকাঠি, মহাজাতক শহীদ আল-বোখারী ॥

২. آپ کے مسائل اور انکا حل. یوسف لدھیانوی ॥

গণক সম্বন্ধে আকীদা

গণকের ভবিষ্যৎ বাণীতে বিশ্বাস করা কুফ্‌রী। কারণ নবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل الله تعالى على محمد -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি গণকের কাছে এল, অতঃপর সে যা বলে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করল, সে আল্লাহ কর্তৃক মুহাম্মাদের উপর নাযিলকৃত বিধি-বিধানের সাথে কুফ্‌রী করল।[১]

রত্ন ও পাথরের প্রভাব সম্বন্ধে আকীদা

মণি, মুক্তা, হিরা, চুনি, পান্না, আকীক প্রভৃতি পাথর ও রত্ন মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে, মানুষের ভাগ্যে পরিবর্তন ঘটাতে পারে- এরূপ বিশ্বাস রাখা মুশরিকদের কাজ, মুসলমানদের কাজ নয়।[২] পূর্বেও বলা হয়েছে কোন পাথর (Stone) ভাগ্য বদলাতে পারে, কোন গ্রহকে খুশী করে তার অনুকূলে আনতে পারে-এরূপ বিশ্বাস করা শির্‌ক-এর পর্যায়ভুক্ত। তবে পাথরের কোন বিকিরণ ক্ষমতা (Radiative activity) যদি বৈজ্ঞানিক ভাবে শারীরিক উপকারে আসে বলে প্রমাণিত হয়, তবে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করায় কোন অসুবিধা নেই।

তাবীজ ও ঝাড় ফুঁক সম্বন্ধে আকীদা

* তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁকে কাজ হওয়াটা নিশ্চিত নয়-হতেও পারে না হতেও পারে। যেমন দুআ করা হলে রোগ-ব্যাধি আরোগ্য হওয়াটা নিশ্চিত নয়-আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে আরোগ্য হয় নতুবা হয় না। তদ্রূপ তাবীজ এবং ঝাড় ফুঁকও একটি দুআ এবং তাবীজের চেয়ে দুআ বেশী শক্তিশালী। তাবীজ এবং ঝাড় -ফুঁকে কাজ হলেও সেটা তাবীজ বা ঝাড় ফূকের নিজস্ব ক্ষমতা নয় বরং আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই সবকিছু হয়ে থাকে।

* সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সব তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁকই এজতেহাদ এবং অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত, কুরআন ও হাদীছে যার ব্যাপারে স্পষ্ট বলা হয়নি যে, অমুক তাবীজ বা অমুক ঝাড়-ফুঁক দ্বারা অমুক কাজ হবে। অতএব কোন তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁক দ্বারা কাঙ্খিত ফল লাভ না হলে কুরআন-হাদীছের সত্যতা নিয়ে কিছু বলার বা ভাবার অবকাশ নেই।

* তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক কুরআন হাদীছের বাক্যাবলী এবং আল্লাহ্‌র আসমায়ে হুসনা দ্বারা বৈধ উদ্দেশ্যে করা হলে তা জায়েয। পক্ষান্তরে কোন কুফ্‌র শির্‌কের কথা থাকলে বা এরূপ কোন যাদু হলে তা দ্বারা তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক হারাম। এমনিভাবে কোন অবৈধ উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক করা হলে তা জায়েয নয়, যদিও কুরআন হাদীছের বাক্য দ্বারা তা করা হয়।

وهى جائزه بالقران والاسماء الالهية وما فى معنا ها بالاتفاق - (اللمعات)

* যেসব বাক্য বা শব্দ কিম্বা যেসব নকশার অর্থ জানা যায় না তা দ্বারা তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক করা বৈধ নয়।

---

১. شرح العقائد النسفيه থেকে গৃহীত ॥ ২. آپ کے مسائل اور انکا حل. جـ/١ ॥

* কোন বিষয়ের তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁকের জন্য কোন নির্দিষ্ট দিন বা সময় রয়েছে বা বিশেষ কোন শর্ত ইত্যাদি রয়েছে- এরূপ মনে করা ঠিক নয়।

* তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁকের জন্য কারও এজাযত প্রাপ্ত হওয়া জরুরী- এরূপ ধারণাও ভুল।

* তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁক দ্বারা ভাল আছর হলে সেটাকে তাবীজ দাতার বা আমেলের বুযুর্গী মনে করা ঠিক নয়। যা কিছু হয় আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই হয়।[১]

তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক কুরআন হাদীছের বাক্যাবলী দ্বারা বৈধ উদ্দেশ্যে করা হলে তা জায়েয। এ সম্পর্কে কয়েকটি দলীল নিম্নে পেশ করা হলঃ

(১) اخرج ابن ابی شیبه فی مصنفه عن عمروبن شعیب عن ابیه عن جده قال قال رسول الله ﷺ : اذا فزع احدکم فی نومه فلیقل بسم الله اعوذ بکلمات الله التامة من غضبه وسوء عقابه ومن شر عباده ومن شر الشیاطین وان یحضرون فکان عبد الله (یعنی بن عمروؓ) یعلمها ولده من ادرک منهم ومن لم یدرک کتبها وعلقها علیه ـ

এ হাদীছে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আমর ইব্‌নুল আস (রাঃ) কর্তৃক তার বাচ্চাদের জন্য তাবীজ লিখে দেয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে।

(২) واخرج ابو داؤد فی سننه ایضاعن عمروبن شعیب عن ابیه عن جده ان رسول الله ﷺ کان یعلمهم من الفزع کلمات اعوذ بکلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشیاطین وان یحضرون ـ وکان عبد الله بن عمرو یعلمهن من عقل من بنیه ومن لم یعقل کتبه فعلقه علیه ـ اخرجه ابو داؤد فی الطب – باب کیف الرقی ؟

এ হাদীছেও হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আমর ইব্‌নুল আস (রাঃ) কর্তৃক তার বাচ্চাদের জন্য তাবীজ লিখে দেয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে।

(৩) واخرج ابن ابی شیبة ایضاعن مجاهد انه کان یکتب الناس التعویذ فیعلقه علیهم ـ واخرج عن ابی جعفر ومحمد بن سیرین وعبید الله بن عبد الله بن عمر و الضحاک ما یدل علی انهم کانوا یبیحون کتابة التعویذ وتعلیقه او ربطه بالعضد ونحوه ـ

এ রেওয়ায়েতে হযরত মুজাহিদ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌নে সীরীন (রহঃ) প্রমুখের অন্যদেরকে তাবীজ লিখে দেয়ার কথা, তাবীজ হাতে বা গলায় বাঁধা ও তাবীজ লেখা বৈধ হওয়ার মর্মে তাদের মন্তব্য বর্ণিত হয়েছে।

---

১. ـ ماخوذ از معارف القرآن ، شامی جـ/٦، مرقاة واغلاط العوام ॥

(8) قال عبد الله بن احمد قرأت على ابى ثنا يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن محمد بن ابى ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اذا عسر على المراة ولا دتها فليكتب بسم الله لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين، كأنهم يوم يرونها لم يلبثو ا الا عشية او ضحاها كأنهم يوم يرون ما يو عدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفسقون -

এ রেওয়ায়েতে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বাচ্চা প্রসবের সময় প্রসূতীর প্রসব বেদনা লাঘব করা ও সহজে প্রসব হওয়ার জন্য বিশেষ তাবীজ শিক্ষা দেয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। এ রেওয়ায়েতটি সালাফী ও গায়রে মুকাল্লিদগণের সর্বজনমান্য ব্যক্তিত্ব ইব্‌নে তাইমিয়া (রহঃ) তাঁর ফাতাওয়াতে উল্লেখ করেছেন। (দ্র ঃ فتاوى ابن تيميه جـ/١٩ صفحـ/٦٤)

বর্তমান যুগের গায়রে মুকাল্লিদ ও সালাফীগণ তাবীজ কবজকে নিষিদ্ধ, এমনকি শির্ক বলে আখ্যায়িত করেন। এ প্রসঙ্গে ২য় খণ্ডে ৪৩৮-৪৪৪ পৃষ্ঠায় আমাদের বিস্তারিত বক্তব্য ও দলীল-প্রমাণ এবং তাদের দলীল-প্রমাণ খণ্ডনসহ আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

নযর ও বাতাস লাগা সম্বন্ধে আকীদা

হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী নযর লাগার বিষয়টি সত্য। জান-মাল ইত্যাদির প্রতি বদনযর লেগে তার ক্ষতি সাধিত হতে পারে। আপনজনের প্রতিও আপনজনের বদনযর লাগতে পারে, এমনকি সন্তানের প্রতিও মাতা-পিতার বদনযর লাগতে পারে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ

العين حق - (مسلم)

অর্থাৎ, নজর লাগা সত্য।

আর বাতাস লাগার অর্থ যদি হয় জিন ভূতের বাতাস অর্থাৎ, তাদের খারাপ নযর বা খারাপ আছর লাগা, তাহলে এটাও সত্য; কেননা জিন ভূত মানুষের উপর আছর করতে সক্ষম।

কেউ কারও কোন ভাল কিছু দেখলে যদি ما شاء الله (মাশা আল্লাহ) বলে, তাহলে তার প্রতি তার বদনযর লাগে না। আর কারও উপর কারও বদনযর লেগে গেলে যার নযর লাগার সন্দেহ হয় তার মুখ, হাত (কনুই সহ) হাঁটু এবং কাপড়ের নীচের জায়গা ধুয়ে সেই পানি যার উপর নযর লেগেছে তার উপর ঢেলে দিলে খোদা চাহেতো ভাল হয়ে যাবে।

عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : العين حق فلوكان شىء سابق القدر لسبقته العين واذا استغسلتم فاغسلوا - (مسلم)

অর্থাৎ, ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) রাসূল থেকে বর্ণনা করেন যে, নযর লাগা সত্য। যদি কোন

কিছু ভাগ্য অতিক্রম করতে পারত, তাহলে নযর তাকে অতিক্রম করত। যখন তোমাদের কাউকে ধুয়ে দিতে বলা হয়, সে যেন ধুয়ে দেয়।

বদনযর থেকে হেফাযতের জন্য কাল সুতা বাঁধা বা কালি কিংবা কাজলের টিপ লাগানো ভিত্তিহীন ও কুসংস্কার।

কুলক্ষণ ও সুলক্ষণ সম্বন্ধে আকীদা

ইসলামী আকীদা মতে কোন বস্তু বা অবস্থা থেকে কুলক্ষণ গ্রহণ করা বা কোন সময়, দিন ও মাসকে খারাপ মনে করা বৈধ নয়। এমনিভাবে হাদীছ দ্বারা স্বীকৃত নয়-এরূপ কোন লক্ষণ মানা বৈধ নয়। তবে কেউ কোন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা বা দুশ্চিন্তায় রয়েছে - এরূপ মুহূর্তে ঘটনাক্রমে বা কিছুটা ইচ্ছাকৃতভাবে খুশী বা সাফল্যসূচক কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হলে কিংবা এরূপ কিছু দৃষ্টিগোচর হলে সেটাকে সুলক্ষণ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এটা মূলতঃ কোন শব্দ বা বস্তুর প্রভাবকে বিশ্বাস করা নয়। এটা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌র রহমতের আশাকে শক্তিশালী করা।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত সম্বন্ধে আকীদা

এক হাদীছে বলা হয়েছেঃ

ستفرق امتى على ثلاث وسبعين فرقة كلهم فى النار الا واحدة قالوا من هم يا رسول الله ! قال ما انا عليه واصحابى - (الترمذى جـ٢/)

অর্থাৎ, অতিশীঘ্র আমার উম্মত তেহাত্তর ফির্কায় (দলে) বিভক্ত হয়ে পড়বে, তন্মধ্যে মাত্র একটি দল হবে মুক্তিপ্রাপ্ত (অর্থাৎ, জান্নাতী) আর বাকী সবগুলো ফিরকা হবে জাহান্নামী। জিজ্ঞাসা করা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই মুক্তিপ্রাপ্ত দল কারা ? রাসূল (সাঃ) উত্তরে বললেনঃ তারা হল আমি ও আমার সাহাবীগণ যে মত ও পথের উপর আছি তার অনুসারীগণ।

এ হাদীছের মধ্যে যে মুক্তিপ্রাপ্ত বা জান্নাতী দল সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাদেরকেই বলা হয় "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত।" নামটির মধ্যে 'সুন্নাত' শব্দ দ্বারা রাসূল (সাঃ)-এর মত ও পথ এবং 'জামা'আত' শব্দ দ্বারা বিশেষভাবে সাহাবায়ে কেরামের জামা'আত উদ্দেশ্য। মোটকথা রাসূল (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামের মত ও পথের অনুসারীদেরকেই বলা হয় আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। ইসলাম ধর্মে বিভিন্ন সময়ে যেসব সম্প্রদায় ও ফির্কার উদ্ভব হয়েছে, তন্মধ্যে সর্বযুগে এ দলটিই হল সত্যাশ্রয়ী দল। সর্বযুগে ইসলামের মৌলিক আকাইদ বিষয়ে হকপন্থী গরিষ্ঠ উলামায়ে কেরাম যেভাবে কুরআন, হাদীছ ও সাহাবায়ে কেরামের মত ও পথের অনুসরণ করে আসছে, এ দলটি তারই অনুসরণ করে আসছে। এর বাইরে যারা গিয়েছে, তারা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বহির্ভূত বিপথগামী ও বাতিলপন্থী সম্প্রদায়। এরূপ বহু বাতিল সম্প্রদায় কালের অতল গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে, যারা রয়েছে তারাও বিলীন হবে, হকপন্থী দল চিরকাল টিকে থাকবে।

দ্বীনের চার বুনিয়াদ সম্বন্ধে আকীদা

দ্বীনের বুনিয়াদ অর্থাৎ, যে সমস্ত জিনিসের উপর শরী'আতের বুনিয়াদ, তা হল চারটি। এই চারটি দ্বারা যা প্রমাণিত নয়, তা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। বুনিয়াদ চারটি এই ঃ

১. কুরআন।

২. হাদীছ/সুন্নাত। হাদীছ/সুন্নাত দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূল (সাঃ)-এর কথা (قول), কাজ (فعل) ও সমর্থন (تقرير)। প্রথমটাকে সুন্নাতে কওলী, দ্বিতীয়টাকে সুন্নাতে ফে'লী এবং তৃতীয়টাকে সুন্নাতে তাক্‌রীরী বলে।

রাসুল (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদার পবিত্র যুগের অনুসরণীয় আমলসমূহ হাদীছের এবং শরী'আতের দলীল সমূহের অন্তর্ভুক্ত। তারাবীর বিশ রাকআত এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।[১]

কুরআন হাদীছের ভাষ্য সমূহ (نصوص)কে জাহেরী অর্থে গ্রহণ করতে হবে যতক্ষণ জাহেরী অর্থ থেকে ফিরে যাওয়ার মত কোন কারণ (قرينة صارفة) না পাওয়া যাবে। বিনা কারণে জাহেরী অর্থ পরিত্যাগ করে বাতেনী অর্থ গ্রহণ করা এলহাদ (الحاد) বা ধর্ম ত্যাগ ও ধর্মবিকৃতির নামান্তর।[২]

৩. ইজ্‌মা। যেসব বিষয়ে নবী (সাঃ)-এর উম্মতের[৩] ইজ্‌মা বা ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তা হক এবং সঠিক। ইজ্‌মা দলীল হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ হল কুরআনের আয়াত ঃ

كنتم خير امة . الاية

অর্থাৎ তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত। (সূরাঃ ৩-আলু ইমরানঃ ১১০)

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم -

অর্থাৎ, কারও নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি এই রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং এই মু'মিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে, তাহলে সে যেদিকে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। (সূরাঃ ৪-নিছাঃ ১১৫)

এখানে বোঝানো হয়েছে - মুমিনগণ যে পথে চলে সেটা হক। এর ব্যতিক্রম চললে জাহান্নামের পথ সুগম হবে। এ বক্তব্য ইজ্‌মা দলীল হওয়াকে বোঝায়।

ইজ্‌মা দলীল হওয়ার ব্যাপারে হাদীছ থেকে প্রমাণ হল ঃ

لاتجتمع امتى على ضلالة - (اخرجه كثيرون. انظر المقاصد الحسنة)

অর্থাৎ, বিভ্রান্তির উপর আমার উম্মতের ঐক্যমত্য হবে না।

---

১. بدائع الكلام. مولانا المفتى يوسف التاؤلوى ॥

২. شرح العقائد النسفيه ॥

৩. এখানে "উম্মত" দ্বারা উদ্দেশ্য উলামা ও সুলাহা। সাধারণ মূর্খ মানুষের ইজ্‌মা দলীল নয়। عقائد الاسلام. عبدالحق حقانى- ॥

অন্য এক হাদীছে আছে ঃ

يد الله على الجماعة ومن شذ شذ فى النار - (المصدر السابق)

অর্থাৎ, জামা'আতের উপর আল্লাহ্‌র সাহায্য রয়েছে। আর যে জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, সে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জাহান্নামে পতিত হবে।

৪. চতুর্থ বুনিয়াদ হল কিয়াস। অর্থাৎ, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের কিয়াস। তাদের কিয়াস মানার অর্থ তাদের তাকলীদ করা। তাক্‌লীদের সারকথা হল কোন বুযুর্গ ও বিজ্ঞ আলেম ব্যক্তির হক্কানিয়্যাতের প্রতি আস্থা রেখে -যে, তিনি কুরআন ও হাদীছ মোতাবেক এ উক্তিটি করেছেন এবং সে মোতাবেক তিনি এ কাজটি করেছেন- তাঁর কথা ও কাজের অনুসরণ করা।।[১] কিয়াস বলা হয় ঃ

القياس فى اللغة عبارة عن التقدير يقال قست النعل بالنعل اذا قدرته وسويته - وعند الاصوليين هو تقدير الفرع بالاصل فى الحكم والعلة - (قواعد الفقه)

অর্থাৎ, আভিধানিকভাবে কিয়াস্-এর অর্থ হল পরিমাপ, অনুপাত ও তুলনা করা। যেমন একটা স্যাণ্ডেলকে আরেকটার সাথে পরিমাপ করে দেখলে বলা হয় সে এক স্যাণ্ডেলকে আরেকটার উপর কিয়াস করেছে। উসূলে ফেকাহ্-এর পরিভাষায় কিয়াস বলা হয় (কুরআন হাদীছে বর্ণিত) কোন মূল বিধান থেকে (কুরআন হাদীছে বর্ণিত হয়নি-এমন) কোন শাখা বিষয়ের হুকুম ও কারণকে পরিমাপ বা অনুমান করে নেয়া। অর্থাৎ, ঐ শাখা বিষয়ের হুকুম ও কারণ ঐ মূল বিধান থেকে বের করে নেয়া।

কিয়াসের বুনিয়াদ কখনো হয় কুরআনের উপর। যেমন কুরআনে উল্লেখিত শরাবের উপর বর্তমান গাঁজা, ভাং, আফিম ও হেরোইনকে কিয়াস করে এগুলোকে হারাম বলা।

কিয়াসের বুনিয়াদ কখনো হয় হাদীছের উপর। যেমন হাদীছে এসেছে গম, যব, খোরমা, লবণ এবং স্বর্ণ ও রূপা- এই ছয় প্রকার মালামালকে নগদে কমবেশ করা ব্যতীত বিক্রয় করতে হবে, বেশী গ্রহণ করা সূদ হবে। এর মধ্যে একই প্রকার (جنس)-এর একটাকে নগদ প্রদান ও অন্যটাকে বাকী রাখাও নিষেধ হবে। কারণ তাতে যে পক্ষ বাকী রাখল সে যেন বেশী গ্রহণ করল। এ হাদীছে উল্লেখিত ছয় প্রকার মালামালের হুকুমের সাথে ঐ সব মালামালের হুকুমও কিয়াস করা হবে যা এই ছয় প্রকারের বাইরে তবে একই প্রকার (جنس) ভুক্ত।

---

১. যারা কিয়াসকে সনদ মনে করেন না অর্থাৎ, কিয়াসকে দলীল হিসেবে মানেন না এবং তাকলীদে বিশ্বাস করেন না, তাদেরকে বলা হয় জাহিরিয়্যা, যাদের সর্দার হলেন দাউদ জাহিরী। ইব্‌নে তাইমিয়া, ইব্‌নে হায্‌ম এবং আল্লামা শওকানীও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সম্প্রতি গায়রে মুকাল্লিদ বা আহ্‌লে হাদীছ বলে যারা পরিচিত, তারা মুখে তাকলীদের বিরুদ্ধে বললেও কার্যতঃ উপরোক্ত আলেমদের তাক্‌লীদ করে থাকেন। এ সম্পর্কে ২য় খণ্ডে "তাক্‌লীদ প্রসঙ্গ" শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ॥

কিয়াসের বুনিয়াদ কখনো হয় ইজ্‌মার উপর। যেমন উম্মতের সর্বসম্মত মত হল কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে সহবাস করলে তার মা ঐ পুরুষের জন্য হারাম হয়ে যায়। এখন ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এর উপর কিয়াস করে বলেছেন কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে যেনা করলেও ঐ নারীর মা ঐ পুরুষের জন্য হারাম হয়ে যাবে।

তাক্‌লীদ ও চার মাযহাব সম্বন্ধে আকীদা

তাক্‌লীদ (تقليد)-এর আভিধানিক অর্থ গলায় হার পরিধান করানো। তাক্‌লীদের পারিভাষিক সংজ্ঞা হল ঃ

التقليد اتباع الانسان غيره فيما يقول او يفعل معتقدا للحقية من غير نظر الى الدليل

كان هذا المتبع جعل قول الغير اوفعله قلادة فى عنقه من غير مطالبة دليل-

অর্থাৎ, পরিভাষায় তাক্‌লীদ বলা হয় অন্যের কোন উক্তি বা কর্ম সঠিক-এরূপ সুধারণার ভিত্তিতে কোন দলীল প্রমাণ না দেখে তার অনুসরণ করা। যেন এই অনুসরণকারী ব্যক্তি অন্যের কথা বা কাজকে প্রমাণ তলব করা ছাড়া নিজের গলার হার বানিয়ে নিল।[১]

তাক্‌লীদের সারকথা হল কোন বুযুর্গ ও বিজ্ঞ আলেম ব্যক্তির হক্কানিয়্যাতের প্রতি আস্থা রেখে -যে, তিনি কুরআন ও হাদীছ মোতাবেক এ উক্তিটি করেছেন এবং সে মোতাবেক তিনি এ কাজটি করেছেন- তাঁর কথা ও কাজের অনুসরণ করা। আর এই অনুসরণকে সংশ্লিষ্ট কথা ও কাজের দলীল/প্রমাণ জানার উপর ঝুলন্ত না রাখা। কিন্তু তার দলীল/প্রমাণ যদি তখন জানা হয় অথবা পরবর্তীতে জানা যায়, তাহলে এটি তাক্‌লীদের পরিপন্থী নয়। মোটকথা, তাক্‌লীদে দলীল/প্রমাণ অন্বেষণ অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে দলীল/প্রমাণ জানা এর পরিপন্থী হয় না।

প্রত্যেক মুসলমানের উপর মূলতঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ করা ফরয। কুরআন এবং হাদীছের অনুসরণের মাধ্যমেই এ ফরয আদায় হবে। কিন্তু সরাসরি যারা কুরআন হাদীছের ভাষা-আরবী বোঝেন না, কিংবা আরবী ভাষা বুঝলেও কুরআন হাদীছ যথাযথ ভাবে অনুধাবন ও তা থেকে মাসআলা-মাসায়েল চয়ন ও ইজতেহাদ করার জন্য আরবী ব্যাকরণ, আরবী অলংকার, আরবী সাহিত্য, উসূলে ফেকাহ, উসূলে হাদীছ, উসূলে তাফসীর ইত্যাদি যেসব আনুসাঙ্গিক শাস্ত্রগুলো বোঝা প্রয়োজন নিয়মতান্ত্রিক ভাবে সেগুলো পাঠ করেননি বা পাঠ করলেও গভীরভাবে এসব বিদ্যায় পারদর্শী হতে পারেন নি, তাদের পক্ষে সরাসরি সব মাসআলা-মাসায়েল কুরআন হাদীছ থেকে চয়ন ও ইজতেহাদ (গবেষণা) করে বের করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি তা নিরাপদও নয়। বরং গভীর বুৎপত্তি ও দক্ষতার অভাবে এরূপ লোকদের গবেষণা ও ইজ্‌তিহাদে অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর শিকার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই স্বভাবিক। তাই এসব শ্রেণীর লোকদের জন্য বিস্তারিত মাসআলা-মাসায়েল ও বিধি-বিধানের নিমিত্তে এমন কোন বিজ্ঞ

---

১. كشاف اصطلاحات الفنون থেকে গৃহীত ॥

আলেমের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নেই, যিনি উপরোক্ত বিদ্যাসমূহে পারদর্শী ও দক্ষ হওয়ার ফলে সরাসরি সব মাসআলা-মাসায়েল ও বিধি-বিধান কুরআন হাদীছ থেকে চয়ন ও ইজতেহাদ করে বের করতে সক্ষম। এরূপ বিজ্ঞ ও ইজতেহাদের ক্ষমতা সম্পন্ন আলেম তথা মুজতাহিদ ইমামের শরণাপন্ন হওয়া এবং তিনি কুরআন-হাদীছ থেকে চয়ন ও ইজতেহাদ করে সব মাসআলা-মাসায়েল ও বিধি- বিধান যেভাবে বলেন তার অনুসরণ করাকেই বলা হয় উক্ত ইমামের তাকলীদ করা বা উক্ত ইমামের মাযহাব অনুসরণ করা। তাকলীদ করা তাই উপরোক্ত শ্রেণী সমূহের লোকদের জন্য ওয়াজিব এবং যে ইমামেরই হোক এরূপ যেকোন এক জনেরই তাকলীদ করা ওয়াজিব। এক এক মাসআলায় এক এক জনের অনুসরণ করার অবকাশ নেই এবং সেরূপ করা জায়েযও নয়, কারণ তাতে সুবিধ-াবাদ ও খাহেশাতের অনুসরণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তার ফলে গোমরাহী-র পথ উন্মুক্ত হয়।

ইতিহাসে অনুরূপ মুজতাহিদ ইমাম অনেকেই অতিবাহিত হয়েছেন। তবে তন্মধ্যে বিশেষভাবে চারজন ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছেন এবং তাঁদের চয়ন ও ইজতেহাদকৃত মাসআলা-মাসায়েল তথা তাঁদের মাযহাব ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে। তাই আমরা চার ইমাম ও চার মাযহাব-এর কথা শুনে থাকি। উক্ত চার জন ইমাম হলেন ঃ

১. হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ),
২. হযরত ইমাম শাফিঈ (রহঃ),
৩. হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) ও
৪. হযরত ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বল (রহঃ)।

তাঁদের মাযহাবকেই যথাক্রমে হানাফী মাযহাব, শাফিঈ মাযহাব, মালেকী মাযহাব, ও হাম্বলী মাযহাব বলা হয়ে থাকে। আমাদের আকীদা হল এ সব মাযহাবই হক, তবে অনু-সরণ যে কোন একটারই করতে হবে, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। উপমহাদেশের মুসলমান সহ পৃথিবীর অধিক সংখ্যক মুসলমান হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর তথা হানাফী মাযহাব-এর অনুসারী।

সালাফী ও গায়রে মুকাল্লিদগণ তাক্‌লীদের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন এমনকি তারা তাক্‌লীদকে প্রায় শির্‌ক পর্যায়ভুক্ত মনে করেন। এ প্রসঙ্গে ২য় খণ্ডে তাক্‌লীদের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণে কুরআন, হাদীছ, তা'আমুলে সাহাবা ও কিয়াস প্রভৃতি দলীল-প্রমাণ যোগে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

ইবাদত ও শরী'আতের বিভিন্ন প্রকার আহকাম সম্বন্ধে আকীদা

* নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত যেমন শরী'আতের ফরয, তেমনি

* মু'আমালাত তথা লেন-দেন, কায়-কারবার, আয়-উপার্জন ইত্যাদিও শরী'আতের নিয়ম মত পরিচালিত করা ফরয। ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সবল থেকে দূর্বলের অধিকার আদায়, ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষা,

ইসলামী হুদূদ প্রতিষ্ঠা, ইসলামী জিহাদ পরিচালনা প্রভৃতি প্রয়োজনে ইমাম/খলীফা মনোনীত করা ওয়াজিব।[১]

হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রহঃ), শায়খুল হিন্দ (রহঃ), হাবীবুর রহমান উছমানী (রহঃ) প্রমুখ উলামায়ে কেরামের মতে সরকারী ও রাজনৈতিক ভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমীর না হলেও নিজেরা একজন আমীর মনোনীত করে নিবে, যার দ্বারা মাযহাবী ও ধর্মীয় প্রয়োজন নিস্পন্ন করা যায়।[২]

* ইবাদত ও মু'আমালাতের ন্যায় মু'আশারাত তথা পারস্পরিক আচার-আচরণ ও সমাজ সামাজিকতা দোরস্ত করা এবং আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার রক্ষা করাও ফরয়।[৩]

* নামায, রোযা, প্রভৃতি শরী'আতের জাহেরী বিধানের উপর আমল করা যেমন জরূরী, তদ্রূপ এখ্লাস, তাক্ওয়া, সবর, শোক্র প্রভৃতি কলবের গুণাবলী অর্জন এবং রিয়া, তাকাব্বুর প্রভৃতি অন্তরের ব্যাধি দূর করা তথা শরী'আতের বাতেনী বিধানাবলীর উপর আমল করাও ওয়াজিব। এই বাতেনী বিধানাবলীর উপর আমল করাকে বলা হয় তায্কিয়ায়ে নফ্স (تزكية نفس) বা আত্মশুদ্ধি। আত্মশুদ্ধির এই সাধনাকে বলা হয় আধ্যাত্মিক সাধনা। আর এই শাস্ত্রকে বলা হয় তাসাওউফ বা সূফীবাদ।

কুরআন-হাদীছে তাসাওউফ শব্দটি উল্লেখিত হয়নি। তবে ইহ্সান (احسان) শব্দটি প্রসিদ্ধ হাদীছে জিব্রীলে এসেছে। তাসাওউফ -এর মামূলাত এই ইহ্সান-এর মাকাম অর্জনের উদ্দেশ্যেই পালন করা হয়। অতএব এটাও কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত বলতে হবে। বস্তুত ইহ্সান (احسان) হল ফজীলতের স্তর। আর তাসাওউফ এই ফজীলতের স্তর অর্জন করার ওসীলা বা মাধ্যম। অতএব ইহ্সানের ন্যায় তাসাওউফ অর্জন করাও কাম্য। তাসাওউফ -এর সমালোচনাকারীগণ মহা ভুলে নিপতিত।[৪]

* আকেল বালেগ বান্দা কখনও এমন স্তরে উন্নিত হয় না যে, তার থেকে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ তথা শরী'আতের বিধি-বিধান রহিত হয়ে যায়। কারণ আল্লাহ্র বিধি-বিধান সংক্রান্ত আদেশ নিষেধ শর্তহীন ভাবে এসেছে এবং এ বিধি-বিধান কখনও রহিত না হওয়ার ব্যাপারে আইম্মায়ে মুজ্তাহিদীনের ইজ্মা' সংঘটিত হয়েছে।[৫]

কিছু আধুনিক ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে আকীদা

* জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস মানা, জনগণকে আইনের উৎস মানা ঈমান পরিপন্থী। কেননা ইসলামী আকীদা বিশ্বাসে আল্লাহ্কেই সর্বময় ক্ষমতার উৎস স্বীকার করা হয় এবং বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্র।

---

১. عقائد الاسلام. الاحكام السلطانية وغيرها ॥

২. اسلام میں امامت وامارت کا تصور. حبیب الرحمن قاسمی ॥

৩. اسلامی تہذیب. اشرف علی تھانوی ॥

৪. بدائع الكلام. مولانا المفتى يوسف التاؤلوى প্রভৃতি থেকে গৃহীত ॥

৫. شرح العقائد النسفيه থেকে গৃহীত ॥

* প্রচলিত গণতন্ত্রে জনগণকেই সকল ক্ষমতার উৎস এবং জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে আইন বা বিধানের অথরিটি বলে স্বীকার করা হয়, তাই প্রচলিত গণতন্ত্র-এর ধারণা ঈমান আকীদার পরিপন্থী।

* গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র[১] ইত্যাদি তন্ত্রমন্ত্রকে মুক্তির পথ মনে করা এবং একথা বলা যে, ইসলাম সেকেলে মতবাদ, এর দ্বারা বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের এই যুগে উন্নতি অগ্রগতি সম্ভব নয়- এটা কুফ্‌রী।

* "ধর্ম নিরপেক্ষতা"-এর অর্থ যদি হয় কোন ধর্মে না থাকা, কোন ধর্মের পক্ষ অবলম্বন না করা। কোন ধর্মকে সমর্থন দিতে না পারা, তাহলে এটা কুফ্‌রী মতবাদ। কেননা ইসলাম ধর্মে থাকতেই হবে, ইসলামের পক্ষ অবলম্বন করতেই হবে, ইসলামী কার্যক্রমকে সমর্থন দিতেই হবে। আর যদি ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হয় রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত না করা, তাহলে সে ধারণাও ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের পরিপন্থী। কেননা, ইসলামী আকীদা বিশ্বাসে ক্ষমতা ও সামর্থ্য থাকলে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা ফরয। আর কোন ফরযকে অস্বীকার করা কুফ্‌রী। যদি ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ শুধু এতটুকু হয় যে, সকল ধর্মাবলম্বীরা নিজ নিজ ধর্ম কর্ম পালন করতে পারে, জোর জবরদস্তী কাউকে অন্য ধর্মে প্রবেশ করানো যাবে না, তাহলে এতটুকু ধারণা ইসলাম পরিপন্থী হবে না।[২]

* ডারউইন-এর বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করা কুফ্‌রী অর্থাৎ, একথা বিশ্বাস করা যে, বিবর্তন অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন হতে হতে এক পর্যায়ে বানর থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। এরূপ বিশ্বাস ইসলাম ও ঈমান পরিপন্থী। ইসলামী আকীদা বিশ্বাসে আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে সর্ব প্রথম হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকেই মানব জাতির বিস্তৃতি ঘটেছে। বিবর্তনবাদ সম্পর্কে ২য় খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন ৬৩৩ পৃঃ।

* ইসলাম মসজিদের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে, ইসলাম ব্যক্তিগত ব্যাপার, ব্যক্তিগত জীবনে এটাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনে এটাকে টেনে আনা যাবে না- এরূপ বিশ্বাস করা কুফ্‌রী। কেননা, এভাবে ইসলামের ব্যাপকতাকে অস্বীকার করা হয়। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী কুরআন-হাদীছে তথা ইসলামে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্টীয় যাবতীয় ক্ষেত্রের সকল বিষয়ে শাশ্বত সুন্দর দিক নির্দেশনা রয়েছে।

* নামায রোযা, হজ্জ, যাকাত, পর্দা করা ইত্যাদি ফরয সমূহকে ফরয তথা অত্যাবশ্যকীয় জরূরী মনে না করা এবং গান, বাদ্য, সূদ, ঘুষ ইত্যাদি হারাম সমূহকে হারাম মনে না করা এবং এগুলোকে মৌলভীদের বাড়াবাড়ি বলে আখ্যায়িত করা কুফ্‌রী। কেননা কোন ফরযকে ফরয বলে স্বীকার না করা বা কোন হারামকে জায়েয মনে করা কুফ্‌রী।

---

১. গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৫৯৯-৬০১ ও ৬১১-৬২২ পৃঃ ॥

২. ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৬০১-৬০৩ পৃঃ ॥

* টুপী, দাড়ি, পাগড়ী মসজিদ, মাদ্রাসা, আলেম মৌলভী ইত্যাদিকে তুচ্ছ জ্ঞান করা, এগুলোকে হেয় দৃষ্টিতে দেখা, এগুলো নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা মারাত্মক গোমরাহী। ইস্‌লামের কোন বিষয়- তা যত সামান্যই হোক তা- নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

* আধুনিক কালের নব্য শিক্ষিতদের কেউ কেউ মনে করেন যে, কেবল মাত্র ইসলামই নয়- হিন্দু, খৃষ্টান, ইয়াহূদী, বৌদ্ধ নির্বিশেষে যে কোন ধর্মে থেকে মানবতা, মানব সেবা পরোপকার প্রভৃতি ভাল কাজ করলে পরকালে মুক্তি হবে। এরূপ বিশ্বাস করা কুফ্‌রী। একমাত্র ইসলাম ধর্ম অনুসরণের মধ্যেই পরকালীন মুক্তি নিহিত- একথায় বিশ্বাস রাখা ঈমানের জন্য জরূরী। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৪৭৯ পৃঃ।

বিঃ দ্রঃ অত্র গ্রন্থে যেসব বিষয়কে কুফ্‌রী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, কারও মধ্যে তা পরিলক্ষিত হলেই তাকে কাফের বলে ফতওয়া দিয়ে দেয়া যাবে না। কেননা কুফ্‌রের মধ্যে বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যদিও সব স্তরের কুফ্‌রী গোমরাহী এবং যার মধ্যে তা পাওয়া যাবে সে পথভ্রষ্ট, গোমরাহ এবং আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বহির্ভূত, তবে কুফ্‌রের কোন্ স্তর পাওয়া গেলে কাউকে কাফের বলে ফতওয়া দেয়া যায় তা বিজ্ঞ উলামা ও মুফ্‌তীগণই নির্ণয় করতে পারেন। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের পক্ষে বিজ্ঞ উলামা ও মুফ্‌তীগণের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত নিজেদের থেকে কোন ফতওয়া বা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা সমীচীন হবে না। কাউকে কাফের আখ্যায়িত করার জরূরী কয়েকটি মূলনীতি অত্র গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে।

কতিপয় মাসায়েল সম্বন্ধে আকীদা

* সফর এবং একামত সর্বাবস্থায় মোজায় মাসেহ করা জায়েয। হাসান বসরী (রহঃ) বলেনঃ আমার নিকট সত্তর জন সাহাবী মোজায় মাসেহ করা সম্পর্কে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবুল হাসান কার্‌খী (রহঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি মোজায় মাসেহ করাকে জায়েয মনে করে না, আমি তার কাফের হয়ে যাওয়ার আশংকা বোধ করি।[১] মোজায় মাসেহ করাকে জায়েয মনে করা আহ্‌লে হকের আলামতের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

* জমহুরের অনুসরণ করা ওয়াজিব। জমহুর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ।[২]

* এক শব্দে তিন তালাককে তিন তালাকই গণনা করা হবে, এ ব্যাপারে ইজ্‌মা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ব্যাপারে কুরআন, হাদীছ, ইজ্‌মা ও কিয়াস - শরী'আতের এই চার ধরনের দলীল মওজূদ রয়েছে।[৩]

* সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা সমূহ ফরয সমূহের পরিপূরক (مكملات)।

* জুমুআয় খুতবা দেয়া ফরয। খুতবা আরবীতেই হতে হবে তা কুরআন থেকেই বোঝা যায়। কেননা কুরআনে খুতবাকে যিক্‌র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যিক্‌র (ذكر) একমাত্র আরবীতেই হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

---

১. بدائع الكلام. مولانا المفتى يوسف التاؤلوى ॥ ২. ايضا ॥ ৩. ايضا ॥

فاسعوا الى ذكرالله . الاية

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্‌র যিক্‌রের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও।

অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এখানে "যিক্‌র" বলে খুতবাকে বুঝানো হয়েছে। এর সমর্থন পাওয়া যায় বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েতে যার মধ্যে বলা হয়েছে ঃ

فاذاخرج الامام حضرت الملائكة يسمعون الذكر- (كذافى تفسير ابن كثير جـ/٤)

অর্থাৎ, যখন ইমাম বের হন তখন ফেরেশতাগণ যিক্‌র শ্রবণ করার জন্য উপস্থিত হন।

এ হাদীছেও খুতবাকে "যিক্‌র" বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।[১]

* কোন মুসলমানকে হত্যা করা জায়েয নয়, যদি সংগত কারণ দেখা না দেয়। সংগত কারণ যেমন বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যেনা করা, কাউকে হত্যা করা, ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করা প্রভৃতি। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وماكان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ-

অর্থাৎ, কোন মু'মিনের জন্য কোন মু'মিনকে হত্যা করা বৈধ নয়, তবে ভুলবশতঃ অবস্থার কথা ব্যতিক্রম। (সূরাঃ ৪-নিসাঃ ৯২)

রাসুল (সাঃ) বলেনঃ

لايحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وانى رسول الله الا باحدى ثلاثة الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة-

অর্থাৎ, যে মুসলমান ব্যক্তি এক আল্লাহ ও আমার রাসূল হওয়ার সাক্ষ্য দেয়, তাকে হত্যা করা জায়েয নয় তবে তিনটির যে কোন কারণেঃ

(১) বিবাহিত যেনাকারী,

(২) জানের বদলে জান ও

(৩) স্বধর্ম ত্যাগকারী জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি।

* সূদ (-এর সর্বপ্রকার) হারাম। এ ব্যাপারে কুরআনের স্পষ্ট ভাষ্য (نص) রয়েছে। এতদসত্ত্বেও যে সূদ জায়েয হওয়ার ফতওয়া দিবে সে নিজে গোমরাহ এবং অন্যকে গোমরাহকারী।

* নেককার বা বদকার সকলের জানাযা পড়তে হবে। যদি সে "আহলে কিবলা"[২]-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ

---

১. بدائع الكلام. مولانا المفتي يوسف التاؤلوى থেকে গৃহীত ॥

২. আহ্‌লে কিব্‌লা একটি পরিভাষা। যে ব্যক্তি জরূরিয়াতে দ্বীনকে স্বীকার করে, তাকে আহ্‌লে কিবলা বলা হয়। ॥

صلوا خلف كل بر وفاجر - (ابو داؤد والدار قطنى)

অর্থাৎ, নেককার বদকার সকলের পিছনে জানাযা নামায পড়। এ হাদীছের আলোকে কাফের মুশরিক ব্যতীত সব ধরণের পাপীর জানাযা নামায পড়া হবে। তবে নেতৃস্থানীয় আলেম আত্মহত্যাকারী বা প্রকাশ্য বড় ধরনের পাপীর জানাযা পড়ানো থেকে বিরত থাকবেন লোকদের তাম্বীহ হওয়ার জন্য। এরূপ ক্ষেত্রে ছোটখাট কোন আলেম উক্ত জানাযার ইমামত করাবেন।

* প্রয়োজনে যাদু শিক্ষা দেয়া কুফ্‌রী নয়। বরং কুফ্‌রী হল যাদুতে বিশ্বাস করা এবং তদনুযায়ী আমল করা। হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয় প্রয়োজনে মানুষকে যাদু শিক্ষা দিয়েছিলেন। সাথে সাথে তাতে বিশ্বাস ও তদনুযায়ী আমল করতে নিষেধও করেছিলেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر .الاية

অর্থাৎ, তারা কাউকে শিক্ষা দিতনা এ কথা না বলে যে, আমরা পরীক্ষা। অতএব তোমরা কুফ্‌রী করনা। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ১০২)

* সালাফে সালেহীন-এর সমালোচনা করা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার পথ রচনা করে। সালাফে সালেহীনের ভাল আলোচনা করাই হকপন্থীদের অনুসৃত নীতি।[১]

* মক্কা মুকাররমা এবং মদীনা মুনাওয়ারা দুটি পবিত্র ভূমি। তার সমতুল্য কোন ভূমি নেই। অনন্তর জমহুরের মতে মদীনা মুনাওয়ারার তুলনায় মক্কা অধিক মর্যাদা রাখে।[২]

ঈমান সম্পর্কিত কয়েকটি আকীদা

* সংক্ষিপ্ত ঈমান (ايمان اجمالى)-এর ক্ষেত্রে খাঁটি দেলে শুধু কালিমায়ে তাইয়্যেবা বা কালিমায়ে শাহাদাত বলে নেয়াই যথেষ্ট। অতএব কেউ মুসলমান হতে চাইলে সে কালিমায়ে তাইয়্যেবা কিংবা কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করবে। বোবা হলে ইশারায় তাওহীদ ও রেসালাতের স্বীকৃতি দিবে।

কালিমায়ে তাইয়্যেবা এই-

لا اله الا الله محمد رسول الله -

কালিমায়ে শাহাদাত এই-

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله -

* কালিমার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার যে একত্ববাদ ও মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর যে রেসালাত (রাসূল হওয়া) সম্বন্ধে স্বীকৃতি রয়েছে তা জেনে বুঝে মেনে নিতে হবে এবং

---

১. بدائع الكلام. مولانا المفتى يوسف التاؤلوى ॥

২. ইমাম মালেকের মতে মদীনার মর্যাদা অধিক। তবে জমহুরের মতে মদীনার মধ্যে রওযায়ে আত্‌হারের স্থানটুকুর মর্যাদা পৃথিবীর সব স্থানের চেয়ে অধিক। بدائع الكلام. থেকে গৃহীত ॥

দ্বিধাহীন চিত্তে তা গ্রহণ করতে হবে। কালিমার এই অর্থ ও বিষয়বস্তু উপলব্ধি ব্যতিরেকে কেবল মুখে মুখে কালিমা উচ্চারণ করে নিলেই সে আল্লাহ্‌র কাছে মু'মিন ও মুসলমান বলে গণ্য হবে না।[১]

* বিস্তারিত ঈমান (ایمان تفصیلی)-এর মধ্যে যা কিছু নবী (সাঃ) থেকে নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত[২] আছে, তা একে একে বিস্তারিত ভাবে সবটা বিশ্বাস করতে হবে এবং সেগুলো সত্য হওয়ার স্বীকৃতি দিতে হবে। কেউ তার কোন একটি অস্বীকার করলেও সে কাফের হয়ে যাবে এবং অনন্তকাল তাকে জাহান্নামে থাকতে হবে।[৩]

উল্লেখ্য ঃ ঈমানের জন্য মৌখিক স্বীকৃতির যে কথা পূর্বে উল্লেখ করা হল, তা শামসুল আইম্মা ও ইমাম ফখ্‌রুল ইসলামের নিকট। তবে ওযরের সময় তাদের নিকটও শুধু অন্তরের বিশ্বাস ঈমানের জন্য যথেষ্ট। যেমন হত্যার হুমকী দিয়ে আল্লাহ, আল্লাহ্‌র রাসূলকে অস্বীকার করার জন্য কাউকে বাধ্য করা হলে সে যদি মুখে অস্বীকার করে কিন্তু তার অন্তরে বিশ্বাস থাকে, তাহলে তাতে তার ঈমান বহাল থাকবে। এ ক্ষেত্রে মুখের স্বীকৃতি ঈমানের জন্য অপরিহার্য নয়। আর জমহুর মুহাক্কিকীন ও ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদীর নিকট ঈমানের জন্য শুধু অন্তরের বিশ্বাসই যথেষ্ট। তাদের নিকট মৌখিক স্বীকৃতি শুধু পার্থিব বিধানাবলী কার্যকরী হওয়ার জন্য। অতএব কেউ শুধু অন্তরে বিশ্বাস করলে মুখে স্বীকার না করলে সে পরকালে আল্লাহ্‌র কাছে মু'মিন বলে গণ্য হবে তবে দুনিয়াতে তার উপর মু'মিনের বিধান জারী হবে না। পক্ষান্তরে কেউ মুখে স্বীকার করলে আর অন্তরে অবিশ্বাস থাকলে দুনিয়াতে তার উপর মু'মিনের বিধান জারী হবে তবে পরকালে সে মু'মিন বলে গণ্য হবে না।[৪]

* বিস্তারিত যেসব বিষয়ে ঈমান রাখতে হয়, সেসব বিষয়ের সমন্বয়ে যে কালিমা গঠন করা হয়েছে, তাকে বলা হয় ঈমানে মুফাস্‌সাল। এর মধ্যে ঈমানের তাফসীলী বিষয় রয়েছে বলে একে ঈমানে মুফাস্‌সাল বলা হয়।

ঈমানে মুফাস্‌সাল এই ঃ

امنت بالله وملئكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى -

* কালিমায়ে তাইয়্যেবা, কালিমায়ে শাহাদাত, কালিমায়ে তাওহীদ[৫]

---

১. دین کیا ہے؟ منظور نعمانی ॥

২. "নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত" বলতে বোঝায় যা কিছু কুরআনের স্পষ্ট ইবারতের দ্বারা এবং মুতাওয়াতির হাদীছ দ্বারা ছাবিত ও প্রমাণিত। এরূপ অনেকগুলি বিষয় রয়েছে, তবে তার মধ্যে প্রধান হল ৬টি বিষয়, যা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। - عقائد الاسلام. عبدالحق حقانی ॥

৩. প্রাগুক্ত ॥

৪. প্রাগুক্ত ॥

৫. কালিমায়ে তাওহীদ এইঃ

الا اله الا انت واحدا لا ثانی لک محمد رسول الله امام المتقین رسول رب العلمین - ॥

কালিমায়ে তামজীদ[১] প্রভৃতি কালিমা সমূহ মুখস্ত করা জরূরী নয়, শুধু তার বিষয়বস্তুতে বিশ্বাস করাই যথেষ্ট।[২]

* কোন মু'মিনের পক্ষে একথা বলা শোভনীয় নয় যে, আমি ইন্‌শাআল্লাহ ঈমানদার। কেননা "ইন্‌শাআল্লাহ" (অর্থাৎ, যদি আল্লাহ চান) কথাটি যদি ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহের ভিত্তিতে হয়ে থাকে তাহলে সেটা হবে নিশ্চিত কুফরী। আর যদি আদবের কারণে কিংবা সব বিষয়কে আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করণের আওতায় কিংবা পরিণাম সম্পর্কে সন্দেহের ভিত্তিতে কিংবা আল্লাহ্‌র যিক্‌রের দ্বারা বরকত হাসিল করার উদ্দেশ্যে অথবা নিজের গুণকির্তন হয়ে যাওয়া থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে বলা হয়, তবুও এরূপ বলা উত্তম নয়। কেননা এ কথাটি ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ পরিজ্ঞাপক।[৩]

* আমল ঈমানের অংশ কি-না এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (রহঃ), ইমাম আহ্‌মদ (রহঃ) ও আশাইরাদের নিকট ঈমানের মধ্যে বৃদ্ধি ও হ্রাস ঘটে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিকট ঈমানের মধ্যে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে না। মূলতঃ এই মতবিরোধ আমল ঈমানের অংশ (جزء) কি-না এ বিষয়ে মতবিরোধের উপর নির্ভরশীল। যারা বলেন আমল ঈমানের অংশ, তাদের নিকট আমলের কারণে ঈমানের মধ্যে বৃদ্ধি ঘটে আর আমল বিহনে ঈমান হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে যারা বলেন আমল ঈমানের অংশ নয় তাদের নিকট আমল না থাকলে ঈমানের মধ্যে হ্রাস ঘটে না এবং আমল থাকলে ঈমানের মধ্যে বৃদ্ধি ঘটে না। তবে এই মতবিরোধ মূলতঃ শাব্দিক মতবিরোধ। বস্তুত যারা আমলকে ঈমানের অংশ বলেন, তারাও খাওয়ারিজদের ন্যায় এমন অংশ বলেন না যে, আমল না থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মু'মিনই থাকবে না। আবার যারা আমলকে ঈমানের অংশ বলেন না, তারাও আমলের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন না। বরং বলেন আমলের দ্বারা ঈমানের নূর বৃদ্ধি পায়। এর বিপরীত গোনাহ দ্বারা ঈমানের নূর হ্রাস পায় এবং এভাবে ঈমানের ক্ষতি হয়। তাই বিদআত, কুসংস্কার, ইত্যাদি দ্বারা ঈমানের ক্ষতি হয়।

বিদ'আত সম্বন্ধে আকীদা

* বিদআত শরী'আতে হারাম। বিদ'আতের শাব্দিক অর্থ নতুন সৃষ্টি। শরীআতের পরিভাষায় বিদআত বলা হয় দ্বীনের মধ্যে কোন নতুন সৃষ্টিকে[৪] অর্থাৎ, দ্বীনের মধ্যে ইবাদত মনে করে এবং অতিরিক্ত ছওয়াবের আশায় এমন কিছু আকীদা বা আমল সংযোজন ও বৃদ্ধি করা, যা রাসূল (সাঃ) সাহাবী ও তাবেয়ীদের যুগে অর্থাৎ, আদর্শ যুগে ছিল-না। তবে যেসব নেক কাজের প্রেক্ষাপট সে যুগে হয়নি, পরবর্তীতে নতুন প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হওয়ায় নতুন

১.কালিমায়ে তামজীদ এইঃ

لا اله الا انت نورا يهدى الله لنوره من يشاء محمد رسول الله امام المرسلين خاتم النبيين -

২.১/ جـ خير الفتاوى ॥ ৩. شرح العقائد النسفيه ॥ ৪. নতুন সৃষ্টি বলতে বোঝায় যা কোনভাবে (لا نصا ولا اشارة ولا دلالة) কুরআন-হাদীছে নেই ॥

আঙ্গিকে দ্বীনের কোন কাজ করা হয় সেটা বিদআত নয় যেমন প্রচলিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। আমাদের উপমহাদেশে প্রচলিত কিছু বিদআতের তালিকা পেশ করা হল।

কতিপয় বিদআত

* কোন বুযুর্গের মাযারে ধুমধামের সাথে মেলা মিলানো।
* উরস করা।
* জন্ম বার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা।
* মৃতের কুলখানী করা (অর্থাৎ, চতুর্থ দিনে ঈছালে ছওয়াব করা)।
* মৃতের চেহলাম বা চল্লিশা করা।
* কবরের উপর চাদর দেয়া।
* কবরের উপর ফুল দেয়া।
* কবর পাকা করা।
* কবরের উপর গম্বুজ বানানো।
* মাযারে চাদর, শামিয়ানা, মিঠাই ইত্যাদি নযরানা দেয়া।
* প্রচলিত মিলাদ অনুষ্ঠান।
* মীলাদ অনুষ্ঠানে কেয়াম করা।
* জানাযার নামাযের পর আবার হাত উঠিয়ে দুআ করা।
* জানাযা নামাযের পর জোর আওয়াজে কালিমা পড়তে পড়তে জানাযা বহন করে নিয়ে যাওয়া।
* দাফনের পর কবরের কাছে আযান দেয়া।
* ঈদের নামাযের পর মুসাহাফা ও মুআ'নাকা বা কোলাকুলি করা।
* আযানের পর হাত উঠিয়ে দুআ করা।[১]
* আযান ইকামতের মধ্যে রাসুল (সঃ)-এর নাম এলে বৃদ্ধা আঙ্গুলে চুমু দিয়ে চোখে লাগানো।[২]
* রমযানের শেষ জুমুআর খুতবায় বিদায় জ্ঞাপন মূলক শব্দ (যেমন আল-বিদা) যোগ করা। "জুমুআতুল বিদা" বলে কোন ধারণা ইসলামে নেই।
* আমীন বলে মুনাজাত শেষ করা নিয়ম, অনেকে কালিমায়ে তাইয়্যেবা বলতে বলতে মুখে হাত বুলান এবং মুনাজাত শেষ করেন-এটা কুরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়, এটা বিদআত।[৩]

---

১. احسن الفتاوى جـ/١ ॥

২. احسن الفتاوى جـ/١ وراه سنت ॥

৩. احسن الفتاوى جـ/١ ॥

* জানাযার উপর কালিমা ইত্যাদি লেখা বা ফুলের চাদর বিছানো।

(ماخوذ از تعلیم الدین. آپ کے مسائل اور انکا حل. راہ سنت. واحسن الفتاوی ج ۱. الفرقان وغیرھا)

নিম্নে কতিপয় রসম বা কুসংস্কার ও কুপ্রথার তালিকা পেশ করা হল, যা সরাসরি বিদ'আতের সংজ্ঞার আওতাভূক্ত নয় তবে তা শরী'আতে গর্হিত। এগুলো বিদ'আতেরই মত বা বিদ'আতের সোপান।

কতিপয় রসম বা কুসংস্কার ও কুপ্রথা

* বিবাহ শাদিতে হিন্দুদের রছম পালন করা যেমন ফুল-কুল দ্বারা বৌ বরণ করা, ভরা মজলিসে বউ-এর মুখ দেখানো, গীত গেয়ে নারী পুরুষ একত্রিত হয়ে বর কনেকে গোসল দেয়া ইত্যাদি।
* মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত কাপড়- চোপড়কে দোষণীয় মনে করা।
* বিবাহ-শাদি, খতনা ইত্যাদিতে হাদিয়া উপঢৌকন দেয়া। এসব উপঢৌকন প্রদানের পশ্চাতে ভাল নিয়ত থাকে না বা খারাপ নিয়ত থাকে, যেমন না দিলে অসম্মান হয়, দুর্নাম হয় বিধায় দেয়া হয় কিম্বা অমুক অনুষ্ঠানে তারা দিয়েছিল তাই দিতে হয় ইত্যাদি উদ্দেশ্যে মানুষ দিয়ে থাকে।
* শবে বরাতে হালুয়া রুটি করা, পটকা ফুটানো, আতশবাজী করা।
* আশুরায় খিচুড়ি ও শরবত তৈরি এবং বন্টন করা।
* শবে বরাত ও শবে কদরে রাত্র জাগরণের জন্য ফরয ওয়াজিব থেকে বেশী গুরুত্ব সহকারে লোকদের সমবেত করার উদ্যোগ নেয়া।
* শাব্দিক অর্থে "ঈদ মুবারক" বলা খারাপ ছিল না, কিন্তু এটা রছমে পরিণত হয়েছে বিধায় পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।
* ঈদগাহে বা মসজিদে যাওয়ার আগেই তাসবীহ বা জায়নামায দিয়ে স্থান দখল করে রাখা।
* মুয়াজ্জিনের জন্য জায়নামায দিয়ে স্থান নির্দিষ্ট করে রাখা।
* বিপদ-আপদে যে কোন দান সদকা করলে বিপদ দুরিভূত হয়, কিন্তু গরু ছাগল মোরগ প্রভৃতি কোন প্রাণীই জবাই করতে হবে- যেমন বলাও হয় জানের বদলে জান- এটা একটা রছম। জানের বদলে জান হওয়া জরুরী নয় বরং যে কোন ছদকা হলেই তা বিপদ দুরীভূত হওয়ার সহায়ক।
* তারাবীহ্তে কুরআন খতম হওয়ার দিন মিষ্টি বিতরণ করা।
* মাইয়্যেতের জন্য ঈছালে ছওয়াব করা দুআ করা শরী'আত সম্মত বিষয়, কিন্তু সেটা সম্মিলিত হয়েই করতে হবে এরূপ বাধ্যবাধকতার পেছনে পড়াও রছমে পরিণত হয়েছে।

(ماخوذ از بہشتی زیور. تعلیم الدین. اصلاح الرسوم. واحسن الفتاوی وغیرھا)

গোনাহ্ সম্পর্কে আকীদা

* কোন গোনাহকে গোনাহ না মনে করা কুফ্‌রী।
* গোনাহ দুই ধরনেরঃ কবীরা গোনাহ ও সগীরা গোনাহ।
* কবীরা গোনাহ করলে ইসলাম থেকে খারেজ ও কাফের হয়ে যায় না।
* কবীরা গোনাহ করলে অনন্তকাল জাহান্নামে থাকতে হবে না।
* সগীরা গোনাহ বিভিন্ন নেক আমল দ্বারাও মোচন হয়ে যায়।
* এক হিসেবে কোন গোনাহকেই সগীরা বা ছোট মনে করতে নেই। সগীরা বা ছোট বলা হয় কোনটা কোনটা থেকে ছোট এ হিসেবে। নতুবা এক হিসেবে কোন গোনাহই ছোট নয়। যেমন ছোট সাপও ছোট নয়, সেটাও জীবন ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট।
* সগীরা গোনাহের উপর হটকারিতা করলে সেটা কবীরা হয়ে যায়।

বিঃ দ্রঃ কবীরা ও সগীরা গোনাহের বিস্তারিত বিবরণ ও তালিকার জন্য "আহ্‌কামে যিন্দেগী" مفتی محمد شفیع. گناہ بے لذت ও شمس الدین الذهبی . كتاب الكبائر প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ পাঠ করা যেতে পারে।

* কবীরা গোনাহ তওবা করলে মাফ হয়ে যায়। তবে শির্‌ক মাফ হয় না। শির্‌ক করলে ইস্‌লাম নবায়ন করে নিতে হয়।

নিম্নে কতিপয় শির্‌কের বিষয়কে চিহ্নিত করে দেয়া হল ঃ

কতিপয় শির্‌ক

* কোন বুযুর্গ বা পীর সম্বন্ধে এই আকীদা রাখা যে, তিনি সব সময় আমাদের অবস্থা জানেন। তিনি সর্বত্র হাযির নাযির।
* কোন পীর বুযুর্গকে দূর দেশ থেকে ডাকা এবং মনে করা যে, তিনি জানতে পেরেছেন।
* কোন পীর বুযুর্গের কবরের নিকট সম্মান বা অন্য কোন উদ্দেশ্য চাওয়া।
* পীর বা কবরকে সিজদা করা।
* কোন বুযুর্গের নাম অযীফার মত
* কোন পীর বুযুর্গের নামে শিন্নি, ছদকা বা মান্নত মানা।
* কোন পীর বুযুর্গের নামে জানোয়ার জবেহ করা।
* আল্লাহ ছাড়া কারও দোহাই দেয়া।
* কারও নামের কছম খাওয়া বা কিরা করা।
* আলীবখ্‌শ, হোছাইন বখ্‌শ ইত্যাদি নাম রাখা।
* নক্ষত্রের তাছীর (প্রভাব) মানা বা তিথি পালন করা,
* জ্যোতির্বিদ, গণক, ঠাকুর বা যার ঘাড়ে জিন এসেছে তার নিকট হাত দেখিয়ে অদৃষ্ট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা। তাদের ভবিষ্যদ্বাণী ও গায়েবী খবর বিশ্বাস করা।
* কোন জিনিস দেখে কু-লক্ষণ ধরা বা কু-যাত্রা মনে করা, যেমন অনেকে যাত্রা মুখে কেউ হাঁচি দিলে কু-যাত্রা মনে করে থাকে।

* কোন দিন বা মাসকে অশুভ মনে করা।
* মহররমের তাজিয়া বানানো।
* এরকম বলা যে, খোদা রাসূলের মর্জি থাকলে এই কাজ হবে বা খোদা রাসূল যদি চায় তাহলে এই কাজ হবে।
* এরকম বলা যে, উপরে খোদা নীচে আপনি (বা অমুক)
* কাউকে "পরম পূজনীয়" লেখা।
* "কষ্ট না করলে কেষ্ট (শ্রীকৃষ্ণ) পাওয়া যায় না" বলা বা "জয়কালী নেগাহ্‌বান " ইত্যাদি বলা।
* কোন পীর বুযুর্গ, দেও পরী, বা ভূত ব্রাহ্মণকে লাভ লোকসানের মালিক মনে করা।
* কোন পীর বুযুর্গের দরগাহ বা কবরের চতুর্দিক দিয়ে তওয়াফ করা।
* কোন পীর বযুর্গের খানকা বা বাড়ীকে কা'বা শরীফের ন্যায় আদব-তাযীম করা।[১]

* * * * *

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

---

১. ماخوذاز تعلیم الدین واحسن الفتاوی ॥

২য় খণ্ড

(বাতিল ফির্‌কা ও ভ্রান্ত মতবাদ বিষয়ক)

প্রথম অধ্যায়

(হক ও বাতিল সংক্রান্ত কিছু বিষয়)

কয়েকটি পরিভাষার পরিচয় ঃ

❒ ঈমান/ايمان ঃ

"ঈমান" শব্দের শাব্দিক অর্থ অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা, স্বীকার করা, ভরসা করা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করা ইত্যাদি। শরী'আতের পরিভাষায় ঈমান বলা হয় রাসূল (সাঃ) কর্তৃক আনীত ঐ সকল বিষয়াদি যা স্পষ্টভাবে এবং অবধারিত রূপে প্রমাণিত, সে সমুদয়কে রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি আস্থাশীল হয়ে বিশ্বাস করা ও মেনে নেয়া এবং মুখে তা স্বীকার করা (যদি স্বীকার করতে বলা হয়)। আর কুরআন, হাদীছ এবং সাহাবায়ে কেরাম ও উম্মতের সর্বসম্মত ব্যাখ্যা অনুযায়ী ধর্মের জরূরিয়্যাত তথা অবধারিত বিষয়গুলো-এর ব্যাখ্যা প্রদান করা। সংক্ষেপে ও সাধারণ কথায় ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়।

❒ মু'মিন/مؤمن ঃ

যার মধ্যে ঈমান আছে তাকে মু'মিন বলা হয়।

❒ ইসলাম/اسلام ঃ

"ইসলাম" শব্দের শাব্দিক অর্থ মেনে নেয়া, আনুগত্য করা। শরীআতের পরিভাষায় ইসলাম বলা হয় (ঈমানসহ) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে মেনে নেয়া। সংক্ষেপে ও সাধারণ ভাবে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কর্তৃক আনীত ধর্মকে ইসলাম বলা হয় বা ধর্মীয় কর্মকে ইসলাম বলা হয়।

বিঃ দ্রঃ 'ঈমান' ও 'ইসলাম' শব্দ দুটো সমার্থবোধক ভাবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

❒ মুসলমান/মুসলিম ঃ

'ইসলাম' ধর্ম অনুসারীকে মুসলমান বা মুসলিম বলা হয়।

❒ কুফ্‌র/كفر ঃ

যে সব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখাকে ঈমান বলা হয়, প্রকাশ্যে তার কোন কিছুকে মুখে অস্বীকার করা বা তার প্রতি অন্তরে বিশ্বাস না রাখা হল কুফ্‌র।

❒ কাফের/كافر ঃ

যার মধ্যে কুফ্‌র থাকে সে হল 'কাফের'।

❒ শির্‌ক/شرك ঃ

আল্লাহ্‌র যাত (ذات/সত্তা) তাঁর ছিফাত (صفات/গুণাবলী) এবং তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক বা অংশীদার বানানো হল শির্‌ক।

❒ মুশ্‌রিক/مشرك ঃ

যে শির্‌ক করে তাকে বলা হয় মুশ্‌রিক।

❒ নিফাক/মুনাফিকী ঃ

মুখে ঈমান প্রকাশ করা, প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করা অথচ অন্তরে কুফর প্রচ্ছন্ন রাখা-এরূপ কপটতাকে বলা হয় নিফাক বা মুনাফিকী।

❒ মুনাফিক/منافق ঃ

যে মুনাফিকী করে তাকে বলা হয় মুনাফিক।

❒ ক্বাত্‌ইয়্যুল লফ্‌জ/قطعي اللفظ ঃ যে সব ভাষ্যের শব্দ সন্দেহাতীত বা নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত। কুরআনের শব্দাবলী এবং মুতাওয়াতির (متواتر) হাদীছের শব্দাবলী এই পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত।

❒ ক্বাত্‌ইয়্যুল মা'না / قطعي المعنى ঃ কুরআন-হাদীছের যে সব ভাষ্যের শব্দার্থ দ্ব্যর্থহীন, তাকে ক্বাত্‌ইয়্যুল মা'না বলা হয়।

❒ ক্বাত্‌ইয়্যাত/قطعيات ঃ কুরআন-হাদীছের যে সব ভাষ্য একই সাথে কাত্‌ইয়্যুল লফ্‌জ ও ক্বাত্‌ইয়্যুল মা'না, তাকে বলা হয় ক্বাত্‌ইয়্যাত।

❒ জরূরিয়্যাত/ضروريات ঃ ক্বাত্‌ইয়্যাত দুই ধরনের। (১) যে সমস্ত ক্বাত্‌ইয়্যাত এমন পর্যায়ের যা আম (عوام) খাস (خواص) নির্বিশেষে সকলের নিকট সুবিদিত, যা জানার জন্য তেমন কোন লেখাপড়ার প্রয়োজন পড়ে না, মুসলমান মাত্রই যে সম্বন্ধে অবহিত। যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিষয়ের ফরয হওয়া, রাসূল (সাঃ)-এর খতমে নবুওয়াত বা শেষ নবী হওয়া ইত্যাদি। এসব ক্বাত্‌ইয়্যাতকে "জরূরিয়্যাত" বলা হয়। "জরূরিয়্যাত"কে "বদীহিয়্যাত" (بديهيات) ও বলা হয়। (২) আর যে সমস্ত ক্বাত্‌ইয়্যাত এমন পর্যায়ের নয়, তাকে কাত্‌ইয়্যাতে মাহ্‌যা (قطعيات محضه) বা সাধারণ ক্বাত্‌ইয়্যাত বলা হয়।

❒ আহ্‌লে কিব্‌লা/اهل القبلة ঃ যারা জরূরিয়্যাতে দ্বীন (ضروريات دين)কে স্বীকার করেন, তাদেরকে বলা হয় "আহ্‌লে কিব্‌লা"।

❑ মুলহিদ/যিন্দীক-ملحد/زنديق ঃ

যে ব্যক্তি মৌলিক ভাবে ও প্রকাশ্যে ইসলাম এবং ঈমান-এর অনুসারী কিন্তু নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি জরূরী তথা অবধারিত বিষয়গুলোর এমন ব্যাখ্যা দেয়, যা কুরআন-হাদীছের স্পষ্ট ভাষ্য ও উম্মতের সর্ব সম্মত ব্যাখ্যা বিরুদ্ধ, এরূপ লোক প্রকৃত মু'মিন মুসলমান নয়, কুরআনের পরিভাষায় তাকে বলা হয় "মুল্হিদ" আর হাদীছের পরিভাষায় তাকে বলা হয় "যিন্দীক"। কারও কারও ব্যাখ্যা মতে সব ধরনের ধর্ম বিরোধী বা মুশ্রিকদেরকেও যিন্দীক বলা হয়। যারা দাহ্রী বা নাস্তিক, তাদেরকেও যিন্দীক বলা হয়ে থাকে।

কুরআন-হাদীছের ভাষ্যসমূহ (نصوص)কে জাহিরী অর্থে গ্রহণ করতে হবে, যতক্ষণ জাহিরী অর্থ থেকে ফিরে যাওয়ার মত কোন কারণ না পাওয়া যাবে। বিনা কারণে জাহিরী অর্থ পরিত্যাগ করে বাতিনী অর্থ গ্রহণ করা এল্হাদ (الحاد)। এবং এমন লোককে বলা হবে মুল্হিদ।

❑ মুরতাদ/مرتد ঃ

ইসলাম ধর্মের অনুসারী কোন ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করলে কিংবা ঈমান পরিপন্থী কোন কথা বললে বা কাজ করলে তাকে মুর্তাদ বলে। সংক্ষেপে মুর্তাদ অর্থ ধর্মত্যাগী।

❑ আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত (اهل السنة والجماعة) ঃ

"আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত" বা হক্কপন্থীদের পরিচয় নিম্নে প্রদান করা হল।

হকপন্থীদের পরিচয়

রাসূল (সাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীছে হক্কপন্থীদের পরিচয় পাওয়া যায় ঃ

تفرقت اليهود على احدى وسبعين فرقة او اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق امتى على ثلاث وسبعين فرقة وفى رواية كلهم فى النار الا واحدة - قالوا من هى يا رسول الله ! قال ما انا عليه واصحابى - (رواه الترمذى)

অর্থাৎ, ইয়াহুদীরা একাত্তর/বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল। এমনিভাবে নাসারাগণও। আমার উম্মত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে একদল ব্যতীত আর সকলে জাহান্নামে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন (জাহান্নামে না যাওয়া অর্থাৎ, জান্নাতী) সেই দলটি কারা ? রাসূল (সাঃ) জওয়াবে বললেন ঃ তারা হল ঐ দল, যারা আমার ও আমার সাহাবীদের মত ও পথের অনুসারী।

এ হাদীছে হক্কপন্থী তথা মুক্তিপ্রাপ্ত ও জান্নাতী দলের পরিচয়ে বলা হয়েছেঃ ما انا عليه واصحابى অর্থাৎ, "যারা রাসূল (সাঃ) ও সাহাবীদের মত ও পথে থাকবে"। পরিভাষায় এদেরকে বলা হয় "আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত"। এ পরিভাষাটিও উপরোক্ত ما انا عليه واصحابى কথাটা থেকে গৃহীত হয়েছে। এ পরিভাষায়

উল্লেখিত "সুন্নাত" বলে বোঝানো হয়েছে মত ও পথ তথা কিতাবুল্লাহ্‌কে। আর "জামা'আত" বলে বোঝানো হয়েছে রিজালূল্লাহ্‌কে। বস্তুত আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত হল কিতাবুল্লাহ ও রিজালুল্লাহ্‌-র সু সমন্বিত নাম।

কিতাবুল্লাহ ও রিজালূল্লাহ উভয়টার সু সমন্বয় জরূরী-এ প্রসঙ্গ

কুরআনে কারীমে সূরা ফাতেহাতে "সিরাতে মুস্তাকীম" (الصراط المستقيم)-এর পরিচয় দিতে গিয়ে "অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের পথ" (صراط الذين انعمت عليهم) কথাটা বলে বোঝানো হয়েছে যে, রিজালুল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে শুধু কিতাবুল্লাহ দ্বারা হক পথ নির্ণয় করা সম্ভব নয় এবং এরূপ নীতি বিধিবদ্ধও নয়। হেদায়েতের জন্য কিতাবুল্লাহ এবং রিজালুল্লাহ উভয়টাই জরূরী। কিতাবুল্লাহ এবং রিজালুল্লাহ এই দুটো হল হেদায়েতের দুই বাহু। হক অনুধাবন ও হেদায়েতের জন্য শুধু কিতাবুল্লাহ যথেষ্ট হলে নবী রাসূলদের প্রেরণের প্রয়োজন হত না। বরং আসমান থেকে লিখিত আকারে আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান সম্বলিত কিতাব প্রেরণ করে দেয়াই যথেষ্ট হত।

"অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ" তথা রিজালূল্লাহ কারা তাদের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে ঃ

ومن يطع الله والرسول فاولئک مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصلحين وحسن اولئک رفيقا ـ

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্‌র ও রাসূলের আনুগত্য করবে, তাঁরা ঐসব লোকদের সাথে থাকবে, যাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন অর্থাৎ, নবী, সিদ্দীকীন, শুহাদা ও সালিহীন। আর বন্ধু হিসেবে তাঁরা কত উত্তম ! (সূরাঃ ৪- নিসাঃ ৬৯)

উপরোক্ত আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী নবী, সিদ্দীকীন, শুহাদা, সালিহীন তথা উম্মতের হক্কপন্থী সমস্ত পূর্বসূরী হলেন রিজালুল্লাহ্‌-র অন্তর্ভুক্ত। উম্মতের সাহাবা, তাবিয়ীন, তাবে তাবিয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন সকলেই এই রিজালুল্লাহ্‌-র জামা'আতের অংশ। সাহাবায়ে কেরাম হলেন এই জামা'আতের প্রথম ও প্রধান দিকপাল।

কুরআনে কারীমে ঈমান আমল সব কিছুর ক্ষেত্রে সাহাবীদের ঈমান আমলকে নমূনা ও মাপকাঠি হিসেবে তুলে ধরে ঈমান আমলের সবক্ষেত্রে রিজালুল্লাহ্‌র প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করা হয়েছে। বোঝানো হয়েছে যে, রিজালুল্লাহ্ ব্যতীত ঈমান আমল কোনটির সঠিকতায় পৌঁছা সম্ভব নয়। ইরশাদ হয়েছে ঃ

امنوا كما امن الناس ـ

অর্থাৎ, তোমরা ঈমান আন এই লোকেরা (সাহাবীরা) যেমন ঈমান এনেছে। (সূরাঃ ২- বাকারাঃ ১৩)

فان امنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم فى شقاق -
অর্থাৎ, তোমরা (সাহাবীরা) যেমন ঈমান এনেছ, তারা অনুরূপ ঈমান আনলে, তারা হিদায়াত প্রাপ্ত হল। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তারা সুদূর বিরোধে রয়েছে। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ১৩৭)

এ আয়াতে ঈমানের ক্ষেত্রে সাহাবীদের ঈমান মাপকাঠি হওয়ার কথা বিধৃত হয়েছে। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم -
অর্থাৎ, আর যার নিকট হেদায়াত সুস্পষ্ট হওয়ার পর এই রাসূলের বিরোধিতা করবে এবং এই মু'মিনদের (সাহাবীদের) পথ ছাড়া অন্য পথ অবলম্বন করবে, তাকে আমি করতে দিব যা সে করতে চায়, আর তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করব। (সূরাঃ ৪-নিসাঃ ১১৫)

এ আয়াতে আমল ও মাসলাক তথা মত ও পথের ক্ষেত্রে সাহাবীদের মাপকাঠি হওয়ার কথা বিধৃত হয়েছে।

এ ছাড়াও নিম্নোক্ত আয়াত সমূহে রিজালুল্লাহ্-র অনুসরণ ও আনুগত্যের তাগীদ প্রদান করা হয়েছে ঃ

(১) يايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصدقين -
অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যপন্থীদের সাথে থাক। (সূরাঃ ৯-তাওবাঃ ১১৯)

(২) واتبع سبيل من اناب الى -
অর্থাৎ, যারা বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে, তাঁদের পথ অনুসরণ কর। (সূরাঃ ৩১-লুকমানঃ ১৫)

(৩) اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم -
অর্থাৎ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে কর্তৃত্বের অধিকারী। (সূরাঃ ৪-নিসাঃ ৫৯)

হকপন্থীদের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

১. আহ্লে হক কিতাবুল্লাহ ও রিজালুল্লাহ উভয়টা মান্য করেন ঃ

আহ্লে হকের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তারা কিতাবুল্লাহ ও রিজালুল্লাহ উভয়কে ভিত্তি করে কুরআন-হাদীছ অনুধাবন, মাসলাক-মাশরাব নির্ধারণ ও চিন্তা-চেতনাকে পরিচালিত করে থাকেন। তারা কিতাবুল্লাহ তথা কুরআন ও তার ব্যাখ্যা হাদীছকে বাদ দিয়ে যেমন কোন ব্যক্তির অন্ধ অনুকরণে লিপ্ত হয়ে সিরাতে মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত হন না, তেমনিভাবে রিজালুল্লাহ তথা হক্কপন্থী আস্লাফ ও পূর্বসূরীদেরকে বাদ দিয়ে নিজেদের

খেয়াল খুশী মত কুরআন-হাদীছ অনুধাবন করেও সিরাতে মুস্তাকীম থেকে বিচ্ছিন্ন হন না। তারা রিজালুল্লাহ তথা আস্‌লাফ এবং পূবসূরীদের ব্যাখ্যা ও নীতির আলোকে কুরআন হাদীছ অনুধাবন করে থাকেন। তারা কিতাবুল্লাহ্‌র ভিত্তিতে রিজালুল্লাহ্‌কে বিচার করেন এবং সেই রিজালুল্লাহ্‌র আশ্রয়ে কুরআন-হাদীছ অনুধাবন ও হেদায়েত সন্ধান করেন।

বাতিল ফির্‌কা সমূহের মতবাদ ও চিন্তাধারাসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পূর্বসূরী ও আসলাফের কৃত কুরআন-হাদীছের ব্যাখ্যা এবং তাদের নীতি ও চিন্তাধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াই অধিকাংশ দলের গোমরাহীর মূল কারণ। খারিজীগণ ان الحكم الا لله আয়াতের সাহাবায়ে কেরাম কৃত ব্যাখ্যা থেকে বিচ্যুত হয়ে নতুন ব্যাখ্যার অবতারণা করেই তাদের যাত্রা শুরু করেছিল।[১] মুতাশাবিহাত (متشابهات) আয়াত সমূহের ক্ষেত্রে পূর্বসূরী আহ্‌লে হকের ব্যাখ্যা থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলেই মুজাস্‌সিমা,[২] মুশাব্বিহা[৩] ও মুআত্তিলা[৪] ফিরকার জন্ম হয়েছে। খেলাফতের ব্যাপারে পূর্বসূরী জমহুরের মতামত থেকে সরে যাওয়ার ফলেই শী'আ সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছে। গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী "খাতামুন্নাবিয়্যীন" কথাটার পূর্বসূরী উলামায়ে কেরাম কৃত ব্যাখ্যা থেকে সরে নিজস্ব ব্যাখ্যা গ্রহণ করেই তার গোমরাহী প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে।[৫] মওদূদী সাহেব সাহাবায়ে কেরামকে সমালোচনার উর্ধ্বে মনে না করে, তাঁদের সমালোচনা করে এবং পূর্বসূরী আসলাফ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নীতি গ্রহণ করে এরূপ গোমরাহীর পথকেই উন্মুক্ত করেছেন।[৬]

২ . আকীদা আমল ও কর্মপদ্ধতিতে মধ্যম পন্থা গ্রহণ করা ঃ

আহ্‌লে হকের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল আকীদা আমল ও কর্মপদ্ধতিতে মধ্যম পন্থা গ্রহণ তথা ভারসাম্যতা অবলম্বন করা। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وكذلك جعلنكم امة وسطا. الاية -

অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে বানিয়েছি মধ্যপন্থী উম্মত। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ১৪৩)

মধ্যম পন্থা গ্রহণ করার অর্থ কোন ক্ষেত্রে افراط / تفريط বা বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি না করা বরং মধ্যম পন্থা গ্রহণ করা তথা ভারসাম্যতা অবলম্বন করা। মূলতঃ ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস ও আমল সব ক্ষেত্রেই রয়েছে اعتدال বা ভারসাম্যতা। কোন ক্ষেত্রেই افراط বা বাড়াবাড়িও নেই تفريط বা ছাড়াছাড়িও নেই। যেমন ঃ

* আল্লাহ্‌র সত্তার প্রতি ঈমানের ক্ষেত্রে ঃ

এক্ষেত্রেও রয়েছে ভারসাম্যতা। বাড়াবাড়িও নেই ছাড়াছাড়িও নেই। যারা একেবারে খোদাকেই স্বীকার না করার মত ছাড়াছাড়ি করে, তারা হল নাস্তিক। আর যারা খোদাকে স্বীকার করে কিন্তু একাধিক খোদাকে স্বীকার করে, তারা বাড়াবাড়ি করে। যেমন খৃষ্টান, ইয়াহুদী, হিন্দুগণ এরূপ বাড়াবাড়ির শিকার।

---

১. দেখুন ২১৬-২১৭ পৃষ্ঠা ॥ ২. দেখুন ৭১-৭৩ পৃষ্ঠা ॥ ৩. দেখুন ৭১-৭৩ পৃষ্ঠা ॥ ৪. দেখুন ৭১-৭৩ পৃষ্ঠা ॥ ৫. দেখুন ৩২১ পৃষ্ঠা ॥ ৬. দেখুন ৩৬৩-৪০৯ পৃষ্ঠা ॥

*** রিসালাত সম্পর্কে ঃ**

এক্ষেত্রেও রয়েছে ভারসাম্যতা। বাড়াবাড়িও নেই ছাড়াছাড়িও নেই। রাসূলদের ব্যাপারে আগের যুগেও বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি ছিল এখনও আছে। খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে খোদা বা খোদার পুত্র সাব্যস্ত করে তাঁর সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছিল। ইয়াহুদীরা হযরত ওযায়ের (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে বাড়াবাড়ি করেছিল। পক্ষান্তরে যারা নবী রাসূলদেরকে অমান্য করেছে, এমনকি নবীদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে, তারা নবীদের সম্পর্কে ছাড়াছাড়ি করেছে।

এক শ্রেণীর লোক রয়েছেন যারা বলেন রাসূল মানুষ নন, তারা রাসূল (সাঃ) আর খোদার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই বলতে চান, তারা বাড়াবাড়িতে আছেন। যেমন দেওয়া-নবাগীর পীর এবং তার অনুসারীরা বলে থাকেন। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে তিনি মানুষ ছিলেন। ইরশাদ হয়েছেঃ

قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد -

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, আমিতো তোমাদের মত মানুষ। আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ একক ইলাহ। (সূরাঃ ১৮-কাহ্‌ফ ঃ ১১০)

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যারা সরাসরি রাসূল (সাঃ) কে খোদা বলেন না, তবে রাসূলের প্রতি এমন বিষয় আরোপ করেন যা আল্লাহ্‌র একান্ত বিষয়, যেমনঃ তারা বলেন, রাসূল গায়েব জানেন অর্থাৎ, রাসূল অদৃশ্যের কথা জানেন। একথা বলার পশ্চাতে তাদের উদ্দেশ্য হল মীলাদের ভিতর কেয়াম করা। তারা বলতে চান মীলাদের ভিতর যখন রাসূল (সাঃ)-এর নাম উচ্চারণ হয়, যখন দুরূদ শরীফ পড়া হয়, তখন দাঁড়াতে হবে; কারণ রাসূল (সাঃ)-এর নামে দুরূদ শরীফ পাঠ করা হলে রাসূল (সাঃ) জানতে পারেন এবং তিনি সেই মজলিসে হাজির হয়ে যান, তাই তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়াতে হবে। হক্কানী উলামায়ে কেরাম বলেনঃ যেহেতু রাসূল (সাঃ) গায়েব জানেন না, তাই তাঁর নামে দুরূদ শরীফ পাঠ করা হলে তিনি জানবেন কি করে ? মানুষ গায়েব জানে না, গায়েব জানেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। তবে আল্লাহ তাঁর কোন খাস বান্দাকে গায়েবের অর্থাৎ, অদৃশ্যের বিষয়ে জানাতেও পারেন। কিন্তু মীলাদের ক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ) কে জানানো হয় এবং তিনি হাজির হয়ে যান-এমন কোন দলীল নেই; বরং তার বিপরীত এমন দলীল রয়েছে যাতে বোঝা যায় তিনি হাজির হন না। হাদীছে পরিষ্কার আছেঃ

صلوا على فان صلا تكم تُبَلِّغُنِى حيث كنتم - (مشكوة عن النسائى)

অর্থাৎ, তোমরা আমার প্রতি দুরূদ পাঠ কর। বস্তুত তোমরা যেখানেই থাকনা কেন তোমাদের দুরূদ আমার কাছে পৌঁছানো হয়।

অন্য এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছেঃ

ان لله ملئكة سياحين فى الارض يبلغونى من امتى السلام - (مشكوة عن النسائى والدارمى)

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র একদল ফেরেশতা রয়েছে যারা পৃথিবীতে ভ্রমন করে। তারা আমার উম্মতের সালাম আমার কাছে পৌঁছে দেয়।

*** ইবাদতের ক্ষেত্রে ঃ**

এক্ষেত্রেও রয়েছে ভারসাম্যতা। বাড়াবাড়িও নেই ছাড়াছাড়িও নেই। যারা মনচাহী ও খাহেশাতের যিন্দেগী চালায়, তারা ছাড়াছাড়ি করে, যাদের সম্পর্কে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

اتخذوا دينهم لهوا و لعبا ـ

অর্থাৎ, তারা ক্রিড়া-কৌতুককে তাদের ধর্ম বানিয়েছে। (সূরাঃ ৭-আ'রাফঃ ৫১)

আবার যদি কেউ ইবাদতে লিপ্ত হয়ে, দ্বীনী কাজে লিপ্ত হয়ে বিবি বাচ্চার খোঁজ-খবর রাখা ছেড়ে দেন, কিংবা বিবাহ-শাদী পর্যন্ত না করতে চান, তাহলে সেটাও হবে এক ধরনের বাড়াবাড়ি। এ শ্রেণীর লোকেরা হচ্ছে সন্যাসী গোছের লোক। হাদীছে ইরশাদ হয়েছেঃ

ان الرهبانية لم تكتب علينا . (رواه احمد وابن حبان)

অর্থাৎ, আমাদেরকে সন্যাসবাদের বিধান দেয়া হয়নি।

ইসলামে কোন সন্যাসবাদ নেই। বরং ইবাদতও করতে হবে, সেই সাথে সাথে ঘর সংসার এবং সমাজের সাথে সম্পর্ক সামঞ্জস্যও রাখতে হবে। বিবি বাচ্চার খোঁজ-খবরও রাখতে হবে, তাদের ব্যাপারে ইসলাম যে দায়িত্ব অর্পন করেছে তাও পালন করতে হবে।

*** সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভক্তির ক্ষেত্রেঃ**

এক্ষেত্রেও রয়েছে ভারসাম্যতা। বাড়াবাড়িও নেই ছাড়াছাড়িও নেই। যারা বাড়াবাড়ি করেছে যেমন এক দল গালী শী'আ হযরত আলী (রাঃ) কে অতি ভক্তির কারণে খোদা পর্যন্ত বলে ফেলেছিল। তারা বাড়াবাড়ি করে হকপন্থী জামা'আত থেকে বের হয়ে গেছে। আবার একদল লোক (যারা "শী'আ" নামে পরিচিত) হযরত আলী (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর পরিবারের সদস্য হেতু তাঁর প্রতি অতিভক্তিতে বলে ফেলেছে যে, হযরত আলী (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর প্রথম খলীফা হওয়ার যোগ্য, যেহেতু তিনি রাসূল (সাঃ)-এর পরিবারের লোক। এভাবে বাড়াবাড়ির কারণেও তারা হকপন্থী দল থেকে বের হয়ে গেছে।

শী'আগণ হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রতি অতিভক্তির কারণে একদিকে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়েছে, আবার তিন খলীফাসহ অন্যান্য অনেক সাহাবীদের ব্যাপারে কঠোর সমালোচনায় জড়িত হয়ে ছাড়াছাড়িতে লিপ্ত হয়েছে। এভাবেও তারা হকপন্থী জামা'আত থেকে বের হয়ে গেছে। আবার কোন এক ঘটনার প্রেক্ষিতে কতিপয় খারিজী হযরত আলী (রাঃ)কে কাফের পর্যন্ত বলে ফেলেছিল। এরাও সাহাবীর ব্যাপারে ছাড়াছাড়িতে লিপ্ত হয়ে হকপন্থী দল থেকে বের হয়ে গেছে। মওদূদী সাহেব সাহাবাদের সমালোচনায় লিপ্ত হয়ে সাহাবী ভক্তির ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা ত্যাগ করে ছাড়াছাড়িতে লিপ্ত হয়েছেন।

*** উলামায়ে কেরামের প্রতি ভক্তি ও তাঁদের ব্যাপারে অবস্থান ঃ**

এক্ষেত্রেও রয়েছে ভারসাম্যতা। বাড়াবাড়িও নেই ছাড়াছাড়িও নেই। এ ক্ষেত্রেও আহ্‌লে হক ভারসাম্যনীতি বজায় রাখেন। এর বিপরীত যারা উলামায়ে কেরামকে একেবারেই মানেন না, অহেতুক তাঁদের সমালোচনায় লিপ্ত হন, তারা আলেম সমাজের ব্যাপারে ছাড়াছাড়িতে আছেন। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون -

অর্থাৎ, তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীজনকে জিজ্ঞাসা কর। (সূরাঃ ১৬-নাহ্‌ল ঃ ৪৩)

আবার একদল লোক আছেন, যারা কোন আলেম বা পীর ভক্তির ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে খোদা বানিয়ে ফেলেছেন। যেমন করেছিল ইয়াহুদীরা। তাদের সম্পর্কে কুর-আনে এসেছেঃ

اتخذوا احبا رهم ورهبانهم اربابا من دون الله -

অর্থাৎ, তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিত ও দরবেশদেরকে খোদা বানিয়ে নিয়েছে। (সূরাঃ ৯-তাওবাঃ ৩১)

অর্থাৎ, তাদের ধর্মীয় নেতাদেরকে তারা খোদা বানিয়ে ফেলেছে। অর্থাৎ, খোদার কথা যেমন বিনা যুক্তিতে মানতে হয়, কোন বিচার-বিবেচনা ছাড়াই মানতে হয়, এরা ধর্মীয় গুরুদের বেলায়ও তাই করে।

*** ওয়াজ-নছীহতের ক্ষেত্রে ঃ**

এক্ষেত্রেও রয়েছে ভারসাম্যতা। বাড়াবাড়িও নেই ছাড়াছাড়িও নেই। যারা সাধারণ মানুষের সামনে তাদের ধারণ ক্ষমতার বাইরের কথাও ব্যক্ত করেন, তারা এ ক্ষেত্রে বাড়াবা-ড়ি করেন। এটাও নিষেধ। যেমন নিম্নের রুখসুতের হাদীছ ঃ

ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذالك الا دخل الجنة. (مسلم)

অর্থাৎ, যে কোন বান্দা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে তার উপর মৃত্যু হলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হযরত ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ

ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. (مسلم)

অর্থাৎ, তুমি যদি সাধারণ মানুষের সামনে এমন কথা বয়ান কর যা তাদের ধারণ ক্ষমতার বাইরে, যা তারা বুঝতে পারবে না, তাহলে এটা তাদের কারও কারও জন্য ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তুমি তাহলে সত্যিকার আলেম আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য নও, তুমি বিবেচনা সম্পন্ন আলেম নও।

আবার প্রয়োজনীয় স্থানে ইল্‌ম গোপন করা ছাড়াছাড়ির অন্তর্ভুক্ত, সেটাও অন্যায়। হাদীছে ইরশাদ হয়েছেঃ

من كتم علما مما ينفع الله به فى امر الناس امر الدين الجمه الله يوم القيامة بلجام من النار - (رواه ابن ماجة باسناد حسن)

অর্থাৎ, মানুষের দ্বীনী বিষয়ে যে ইল্‌ম দ্বারা আল্লাহ্ উপকার দান করেন, তা যদি কেউ গোপন করে রাখে, তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দিবেন।

*** পীর মাশায়েখ ও বুযুর্গদের ব্যাপারে অবস্থান ঃ**

এক্ষেত্রেও রয়েছে ভারসাম্যতা। বাড়াবাড়িও নেই ছাড়াছাড়িও নেই। যারা মনে করেন পীর না ধরলে মুক্তি নেই তারা বাড়াবাড়িতে আছেন। পীর ধরা ফরয/ওয়াজিব নয়, পীরের হাতে বায়'আত হওয়া ফরয/ওয়াজিব নয়, এটাকে সুন্নাত বলা হয়। রাসূল (সাঃ)-এর হাতে অনেক সাহাবী বায়'আত করেছেন এই মর্মে যে, আমরা শির্ক করব না, জেনা করব না, চুরি করব না, কোন পাপ কাজ করব না, ভাল কাজ করব ইত্যাদি। এটাকে বায়'আতে সুলূক বলা যায়। কোন কোন সাহাবী রাসূল (সাঃ)-এর হাতে এরূপ বায়'আত হয়েছেন আবার অনেকে হননি। বায়'আত হওয়া ফরয/ওয়াজিব হলে সব সাহাবীই বায়'আত হতেন। পীর মাশায়েখগণ হলেন রূহানী ডাক্তার। তাঁরা আধ্যাত্মিক চিকিৎসক।

এমনি ভাবে যদি কেউ মনে করেন পীর ধরলে পীর-মাশায়েখগণ মুরীদদের পাপের বোঝা বহন করে বা কবরে হাশরে মুরীদদেরকে তা'লীম ও তাল্‌কীন দিয়ে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। যেমন মাইজভাণ্ডারী ও আটরশির পীরদ্বয় মনে করেন। (দেখুন ৪৭৭ ও ৫০৫ পৃষ্ঠা) এটা কুরআন-হাদীছ বিরোধী কথা। কুরআন শরীফে বলা হয়েছেঃ

ولا تزر وازرة وزر اخرى -

অর্থাৎ, কেউ কারও পাপের বোঝা বহন করবে না। (সূরাঃ ৬-আন্‌আম ঃ ১৬৪)

কেউ নিজে আমল করে নিজের নাজাতের ব্যবস্থা না করলে কোন পীর তাকে নাজাত দিতে পারবে না। রাসূল (সাঃ) থেকে বড়তো আর কোন পীর হতে পারে না। স্বয়ং রাসূল (সাঃ) তাঁর গোত্র বনূ হাশেম, বনূ মুত্তালিব ও নিজ কন্যা ফাতেমাকে ডেকে বলেছেনঃ

يا بنى هاشم ! انقذوا انفسكم من النار فانى لا اغنى عنكم من الله شيئا يا بنى عبد المطلب ! انقذوا انفسكم من النار فانى لا اغنى عنكم من الله شيئا يا فاطمة ! انقذى نفسك من النار فانى لا اغنى عنك من الله شيئا . الحديث - (مسلم)

অর্থাৎ, হে বনী হাশেম ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার ব্যবস্থা কর, আমি আল্লাহ্‌র আযাব থেকে তোমাদেরকে রক্ষায় কিছুই করতে পারব না। হে বনূ আব্দিল মুত্তালিব ! তোমরা তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার ব্যবস্থা কর, আমি আল্লাহ্‌র আযাব থেকে তোমাদেরকে রক্ষায় কিছুই করতে পারব না। হে ফাতেমা ! তুমি নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার ব্যবস্থা কর, আমি আল্লাহ্‌র আযাব থেকে তোমাকে রক্ষায় কিছুই করতে পারব না। .....।

আবার যারা মনে করেন পীর-মাশায়েখদের কাছে যাওয়ারই কোন দরকার নেই, তারা ছাড়াছাড়িতে রয়েছেন।

*** অর্থনীতির ক্ষেত্রে ঃ**

এক্ষেত্রেও রয়েছে ভারসাম্যতা। বাড়াবাড়িও নেই ছাড়াছাড়িও নেই। ইসলাম সাম্যবাদের ন্যায় ব্যক্তি মালিকানাকে একেবারে অস্বীকারও করেনি, আবার পূজিঁবাদের ন্যায় অবাধ ও বল্গাহীন মালিকানাকেও প্রশ্রয় দেয়নি। বরং হালাল-হারামের বন্ধনী এঁটে বল্গাহীন সম্পদ অর্জনের পথকে রুদ্ধ করেছে। আবার ধনীর সম্পদে গরীব মিসকীনের অধিকার প্রবর্তিত করে সর্বশ্রেণীর মাঝে সম্পদ আবর্তিত হওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

كيلا يكون دولة بين الاغنياء منكم -

অর্থাৎ, যাতে কেবল তোমাদের মধ্যকার বিত্তবান লোকদের মধ্যেই সম্পদ আবর্তন করতে না থাকে। (সূরাঃ ৫৯ -হাশ্‌র ঃ ৭)

এমনিভাবে আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-আমল, মু'আমালা-মু'আশারা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইসলামের সব কিছুতে মধ্যম পন্থা তথা ভারসাম্যতা রয়েছে।

৩. متشابهات -কে মাসআলা-মাসায়েল ও চিন্তাধারার বুনিয়াদ না বানানো ঃ

আহ্‌লে হকের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল তারা কুরআন-হাদীছের متشابهات বা অস্পষ্ট অর্থ বিশিষ্ট অংশ নিয়ে চর্চা ও ঘাটাঘাটি করেন না। তাঁরা মাসআলা-মাসায়েলের ন্যায় তাঁদের চিন্তাধারারও বুনিয়াদ রাখেন محكمات বা স্পষ্ট অর্থবোধক نصوص বা ভাষ্যসমূহের উপর। পক্ষান্তরে বহু বাতিল ফির্‌কা متشابهات বা অস্পষ্ট অর্থ বিশিষ্ট ভাষ্যসমূহ নিয়ে অতিরিক্ত ঘাটাঘাটি করে এবং তাদের চিন্তাধারার বুনিয়াদ রাখে সেই সব متشابهات বা অস্পষ্ট অর্থ বিশিষ্ট ভাষ্যসমূহের উপর।

হাদীছে এসেছে - নবী করীম (সাঃ) একবার কুরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতটা তেলাওয়াত করলেনঃ

فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله الاية.....

এ আয়াতের ভিতর বলা হয়েছে যে, কিছু লোক বক্র চিন্তাধারার অধিকারী হয়ে থাকে, তারা তাদের ভ্রান্ত মতবাদ, তারা তাদের ভ্রান্ত চিন্তাধারাকে সমর্থিত করার জন্য কুরআন শরীফের কিছু অস্পষ্ট অর্থ বিশিষ্ট অংশের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। (সূরাঃ ৩-আলু ইমরানঃ ৭) নবী করীম (সাঃ) এ আয়াত তেলাওয়াত করার পর বললেনঃ

اذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم - (مسلم و ابن ماجة)

অর্থাৎ, যখন তোমরা ঐসব লোকদেরকে দেখবে, যারা তাদের ভ্রান্ত চিন্তাধারাকে সমর্থিত করার জন্য কুরআনের এসব অংশের- অর্থাৎ, যেগুলির অর্থ অস্পষ্ট বা যার অর্থ একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন আর কেউ জানে না, এরকম অংশের পেছনে পড়ে, তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে, তাদের থেকে বিরত থাকবে।

বহু বাতিল ফিরকার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কোন কোন متشابهات নিয়ে অতি চর্চা ও ঘাটাঘাটিই তাদের বুতলান বা বাতিল হওয়ার মূল কারণ। যেমন আল্লাহ্‌র আরশে সমাসীন হওয়া এবং তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিষয়টি ছিল متشابهات -এর পর্যায়ভুক্ত। এটা নিয়ে অতি ঘাটাঘাটির ফলে এক শ্রেণী হয়েছে মুজাস্‌সিমা/মুশাব্বিহা[১] (مجسمہ / مشبہ) আর এক শ্রেণী হয়েছে মুআত্‌তিলা[২] (معطلہ) যেমন মু'তাযিলাগণ। তাক্‌দীরের বিষয়টিও অনেকটা متشابهات-এর পর্যায়ভুক্ত। কারণ তাকদীরের পূর্ণ রহস্য মানব জ্ঞানের অগম্য। এই তাক্‌দীর বিষয়ে অতিরিক্ত ঘাটাঘাটির ফলে কেউ কেউ হয়েছে কাদরিয়া[৩] (قدریہ) কেউ কেউ হয়েছে জাব্‌রিয়া[৪] (جبریہ)। কিন্তু আহ্‌লে হক আল্লাহ্‌র আরশে সমাসীন হওয়া এবং তার অঙ্গ-প্রতঙ্গের বিষয়টি নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে সংক্ষিপ্তভাবে (اجمالا) তার প্রতি ঈমান এনেছেন এবং তার বিস্তারিত অবস্থা সম্পর্কিত জ্ঞান আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত করেছেন। তাক্‌দীরের ব্যাপারেও আহ্‌লে হক জাব্‌রিয়া ও কাদ্‌রিয়া মতবাদের মাঝামাঝি অবস্থান গ্রহণ করেছেন।

আল্লাহ্‌র নূর-এর বিষয়টিও অনেকটা متشابهات -এর পর্যায়ভুক্ত। কারণ আল্লাহ্‌র নূরের হাকীকত সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ না থাকায় সেটি অস্পষ্ট বা পরিপূর্ণ ভাবে মানব জ্ঞানের অগম্য। অতএব আল্লাহ্‌র যাতী নূর, সিফাতী নূর ইত্যাদি নিয়ে বেশী ঘাটাঘাটি করা এবং তার ভিত্তিতে কোন মাসআলা দাঁড় করানো এবং তা নিয়ে বাহাছ-মুবাহাছা করা সত্য থেকে বিচ্যুতির কারণ হতে পারে। যেমন সর্বপ্রথম রাসূল (সাঃ)-এর নূর তৈরি করা হয়েছে। অতএব রাসূল (সাঃ) নূরের তৈরী। তারপর তিনি কি যাতী নূরের তৈরী না সিফাতী নূরের তৈরী ইত্যাদি আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া এবং আরও আগে বেড়ে এর ভিত্তিতে রাসূল (সাঃ) মানুষ ছিলেন না-এমন আলোচনায় জড়িয়ে পড়া ইত্যাদি। এগুলি متشابهات নিয়ে ঘাটাঘাটি জনিত বিচ্যুতির আশংকা থেকে মুক্ত নয়।

৪. চার দলীলকে ভারসাম্যতার সাথে মান্য করা ঃ

আহ্‌লে হকের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল তারা কুরআন, হাদীছ, ইজমা' ও কিয়াস এই চার দলীলকে ভারসাম্যতার সাথে মান্য করেন। রাসুল (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদার পবিত্র যুগের অনুসরণীয় আমলসমূহ (متواترات) হাদীছের এবং শরীআতের দলীল সমূহের অন্তর্ভুক্ত। আহ্‌লে হক এই মুতাওয়ারিছাতকেও মান্য করেন।[৫] যারা এসব দলীলের কোন একটিকেও অস্বীকার করেন, তারা আহ্‌লে হকের জামা'আত বহির্ভূত। অতএব যারা কুরআন

---

১. দেখুন ৭১-৭৩ পৃষ্ঠা ॥ ২. দেখুন ৭১-৭৩ পৃষ্ঠা ॥ ৩. দেখুন ২৬৭ পৃষ্ঠা ॥ ৪. দেখুন ২৬৫ পৃষ্ঠা ॥
৫. তারাবিহ্‌র বিশ রাকআত এই পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত ॥

মানেন কিন্তু হাদীছ মানেন না, তারাও গোমরাহ। মুনকিরীনে হাদীছ যেমন পারভেজ গোলাম আহ্‌মদ প্রমুখের বিচ্যুতি হাদীছ না মানার কারণে। যারা ইজমা'কে অস্বীকার করেন, তারা আহ্‌লে হক থেকে বিচ্যুত। স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ খানের বিচ্যুতির একটি কারণ এই ইজমা' ভুক্ত বেশ কিছু বিষয়কে অস্বীকার করা। আল্লামা ইব্‌নে হুমাম (রহঃ) বলেন ঃ

انكار حكم الاجماع القطعي يكفر عند الحنفية وطائفة ـ

অর্থাৎ, হানাফী মতাবলম্বীদের নিটক অকাট্যভাবে প্রমাণিত ইজ্‌মার হুকুমকে অস্বীকার কারী কাফের।

আল্লামা সুবকী (রহঃ) তার جمع الجوامع গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر مطلقا ـ

অর্থাৎ, জরূরিয়াতে দ্বীন-যা সর্বযুগে সর্ব সম্মতভাবে গৃহীত- তা অস্বীকারকারী এক বাক্যে কাফের।

উল্লেখ্য ঃ যারা এসব দলীলের কোন একটির উপর নিজের আক্‌ল বা বুদ্ধিকে প্রাধান্য দেন, তারাও গোমরাহ। আহ্‌লে হক আক্‌ল প্রয়োগ করেন, তবে কুরআন-হাদীছের খাদেম বা সহায়ক হিসেবে। তারা আক্‌লকে কুরআন-হাদীছ ডিঙ্গিয়ে উপরে যেতে দেন না। পক্ষান্তরে বাতিল পন্থীগণ আক্‌লকে প্রধান নিয়ামক হিসেবে প্রয়োগ করে থাকে। ফলে তারা তাদের ঠুনকো আক্‌লে না ধরলে কুরআন-হাদীছ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত কোন বিষয়কেও অবলিলায় অস্বীকার করে বসেন। স্যার সৈয়দ আহ্‌মদের গোমরাহীর পশ্চাতে এরূপ কারণও বিদ্যমান ছিল।

এক শ্রেণীর লোক আছেন যারা কুরআন-হাদীছের দলীলের চেয়ে স্বপ্নকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তারা স্বপ্নকে অকাট্য দলীল মনে করেন এবং স্বপ্নের মাধ্যমে কিছু অবগত হলে সেটাকেই বড় দলীল হিসেবে মূল্যায়ন করে থাকেন। কিছু ভ্রান্ত সূফীদেরকে এরূপ করতে দেখা যায়। তারা রাসূল (সাঃ) কে স্বপ্নে কিছু বলতে দেখার দোহাই দিয়ে শরী'আত নির্ধারিত সীমানা লংঘন করে তারই অনুসরণ করতে থাকে। আল্লামা শাতিবী (রহঃ) বিদআত পন্থীদের দলীল সমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে এ কথাগুলিই অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে বলেছেন ঃ

واضعف هؤلاء احتجاجا قوم استندوا فى اخذ الاعمال الى المنامات واقبلوا واعرضوا بسببها ، فيقولون راينا الرجل الصالح . فقال لنا : اتركوا كذا واعملوا كذا ، ويتفق مثل هذا كثيرا للمترسمين برسم التصوف ، وربما قال بعضهم : رايت النبى ﷺ فى النوم . فقال لى كذا ، فيعمل بها ويترك بها معرضا عن الحدود الموضوعة فى الشرع ـ

দেওয়ানবাগী, রাজারবাগী, সুরেশ্বরী প্রমুখকে দেখা গেছে তারা স্বপ্নকে স্বতন্ত্র দলীল হিসেবে মূল্যায়ন করে থাকেন, যা পরবর্তিতে সংশ্লিষ্ট শিরোনামে আলোচনা করা হবে।

অথচ স্বপ্ন কোন দলীল নয়। কাযী ইয়ায বলেন ঃ স্বপ্নের দ্বারা কোন নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয় না। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ইজ্‌মা' রয়েছে। আল্লামা নববী বলেন ঃ তদ্রূপ স্বপ্নের দ্বারা কোন হুকুমের পরিবর্তন ঘটানো যায় না। এ ব্যাপারে ইত্তেফাক বা সর্বসম্মত মত রয়েছে। যদিও হাদীছে বলা হয়েছে ঃ

من رانى فى المنام فقد راى الحق -

অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে সত্য দেখল।

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে যে, রাসূল (সাঃ)কে স্বপ্নে দেখা মিথ্যা হতে পারে না। কেননা, শয়তান রাসূল (সাঃ)-এর আকৃতি ধারণ করতে পারে না। তবে স্বপ্নে সে যা শুনেছে তা সঠিক ভাবে বুঝতে পেরেছে এবং তা সঠিক ভাবে মনে রাখতে পেরেছে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই স্বপ্ন কোন দলীল হতে পারে না।

এখানে আরও মনে রাখা দরকার যে, কেউ রাসূল (সাঃ) কে সপ্নে দেখলে সেটা সত্য, কেননা শয়তান রাসূল (সাঃ)-এর রূপ ধরতে পারে না। কিন্তু স্বপ্নে রাসূল (সাঃ) কে যা বলতে শুনেছে, সেটা সঠিক মনে রাখতে পেরেছে, তার নিশ্চয়তা নেই। হতে পারে তার মনের মধ্যে শয়তান কোন কথার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে দিয়েছে। এ কারণেই উলামায়ে কেরাম বলেছেনঃ শরী'আতে প্রমাণ-নেই এমন কোন ব্যাপারে যদি কারও মনে হয় যে, স্বপ্নে রাসূল (সাঃ) এটাই বলেছিলেন, তাহলে সেই স্বপ্ন অনুযায়ী সে তা করতে পারবে না।

এ ব্যাপারে আল্লামা নববীর ইবারত নিম্নরূপ ঃ

قال القاضى عياض : ..... لا يقطع بامر المنام ولا انه تبطل بسببه سنة ثبتت ولا تثبت به سنة لم تثبت - وهذا باجماع العلماء - هذا كلام القاضى وكذا قاله غيره من اصحابنا وغيرهم فنقلوا الاتفاق على انه لا يغير به بسبب ما يراه النائم ما تقرر فى الشرع -

কেউ কেউ মনে করতে পারেন হাদীছে ভাল স্বপ্নকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে "সুসংবাদ" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অতএব স্বপ্ন দলীল। তার জওয়াব হল- হাদীছে ভাল স্বপ্নকে যেমন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুসংবাদ বলা হয়েছে, তদ্রূপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকেও হতে পারে এবং মনের কল্পনাঘটিতও হতে পারে-একথাও হাদীছে বলা হয়েছে। আর কোন্ স্বপ্নটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শরী'আতে তার পরিচয় যেহেতু দেয়া হয়নি, শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, সেটি ভাল স্বপ্ন। আর দ্বীনী ব্যাপারে ভাল-মন্দ নির্ধারণ শরী'আতের কোন দলীল ব্যতীত সম্ভব নয়। তাই কোন স্বপ্নকে ভাল বা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলতে গেলে অবশ্যই শরী'আতের কোন না কোন দলীলের আশ্রয় নিতে হবে। অতএব স্বপ্ন কোন স্বতন্ত্র দলীল নয়। কোন স্বপ্ন শরী'আতের অনুকূলে হলে সেটাকে সমর্থক হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারবে মাত্র।

স্বপ্ন দলীল হওয়ার পক্ষে কিছু লোক প্রমাণ পেশ করে থাকেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে যায়েদ (রাঃ) স্বপ্নে আযানের শব্দগুলো দেখেছিলেন এবং রাসূল (সাঃ) সে অনুযায়ী

আযান প্রবর্তন করেছিলেন-এ দ্বারা বোঝা যায় যে, সপ্ন দলীল। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কেননা সেখানে স্বপ্নটি সঠিক বলে রাসূল (সাঃ) স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

ان هذه لرؤيا حق - (ترمذى جـ١)

অর্থাৎ, এটা অবশ্যই সত্য স্বপ্ন।

রাসূল (সাঃ) এরূপ স্বীকৃতি না দিলে শুধু ঐ সাহাবীর স্বপ্নের ভিত্তিতে আযান প্রচলিত হত না। আর রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর কারও স্বপ্ন সত্য হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেয়ার যেহেতু কেউ থাকেনি, তাই এখন কারও স্বপ্নকে দলীল হিসেবে দাঁড় করানো যাবে না। এখানে এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত আছে - হযরত ওমর (রাঃ) এর ২০ দিন পূর্বে আযানের এরূপ শব্দ স্বপ্নে দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি সে স্বপ্নের ভিত্তিতে সেভাবে আযান দেয়া শুরু করেননি। এবং রাসূল (সাঃ)ও সেটা জানার পর ওমর (রাঃ)কে এ কথা বলেননি যে, স্বপ্নে দেখা সত্ত্বেও কেন তুমি সে মোতাবিক আমল শুরু করলে না? স্বপ্ন দলীল হলে অবশ্যই হযরত ওমর (রাঃ) স্বপ্ন মোতাবিক সেরূপ আমল করতেন বা রাসূল (সাঃ) জানার পর অনুরূপ বলতেন।

৫. হক প্রকাশে কারও পরোয়া না করা ঃ

আহ্‌লে হকের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল সহীহ্ কথা বলা হলে কে কি বলবে, কে সমালোচনা করবে, কে বিরুদ্ধে চলে যাবে তার পরোয়া না করা। হাদীছে ইরশাদ হয়েছেঃ

لا يزال طائفة من امتى على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى امر الله عز وجل -(رواه ابن ماجة باسناد ثقات) وفى رواية لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم - وفى رواية البخارى عن معاوية لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم -

অর্থাৎ, কিয়ামত পর্যন্ত একদল লোক হকের উপর টিকে থাকবে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। (তাদের বিরোধিতা হবে কিন্তু) কেউ বিরোধিতা করে তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। কে তাঁদের পক্ষে থাকল আর কে তাঁদের পক্ষে থাকল না, কে সাহায্য করল আর কে সাহায্য করল না - এর পরোয়া তাঁরা করবে না।[১]

৬. পরাভূত মানসিকতা নিয়ে কুরআন-হাদীছের ব্যাখ্যা না দেয়া ঃ

আহ্‌লে হকের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল তারা পরাভূত মানসিকতা নিয়ে কুরআন-হাদীছের ব্যাখ্যা দেন না। বিজ্ঞানের সামনে পরাভূত হয়ে অনেকে আম্বিয়ায়ে কেরামের মু'জিযা এবং আউলিয়ায়ে কেরামের কারামতকে অস্বীকার বা তার বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়ে

---

১. অনেকে বিদআত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বলা হলে, কিংবা কোন শক্ত মাসআলা বলা হলে সেটাকে বাড়াবাড়ি বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু সহীহ্ কথা যত কড়াই হোক তা বাড়াবাড়ি নয়। বাড়াবাড়ি হল ইসলামের মাত্রা ছেড়ে যাওয়া। যতটুকু বিধিবদ্ধ, তার মধ্যে অতিরঞ্জন সাধিত করা ॥

হক্ক থেকে বিচ্যুত হয়েছে। যুগের হাওয়া ও প্রগতির সামনে পরাভূত হয়ে কেউ কেউ ফটোকে জায়েয বলেছেন, কেউ কেউ প্রচলিত গণতন্ত্রকে ইসলাম সমর্থিত বলে মত ব্যক্ত করেছেন, কেউ কেউ নারী নেতৃত্বকে বৈধ বলে চালানোর চেষ্টা করেছেন। এভাবে পরাভূত মানসিকতার কারণে তারা হক্ক থেকে বিচ্যুত হয়েছেন।

যে সব বিষয় হক্কানী বা কামেল হওয়ার দলীল নয়

১. কারও কাছে যাওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি হওয়া হক্কানী হওয়ার দলীল নয়। নবী (সাঃ)-এর দরবারে আগমনকারী সাহাবীদের অধিকাংশই গরীব ও দরিদ্র ছিলেন।

২. কারও দরবারে বেশী লোক যাওয়া বা ভক্ত মুরীদের সংখ্যা বেশী হওয়া কিংবা সমর্থক বেশী হওয়া হক্কানী হওয়ার দলীল নয়। একাধিক আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, হকপন্থী লোক সংখ্যায় কম হতে পারে। কুরআনে কারীমে হযরত নূহ্ (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

وما امن معه الا قليل -

অর্থাৎ, অল্প সংখ্যক লোকই তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল। (সূরাঃ ১১-হুদঃ ৪০)

সাড়ে নয় শত বৎসর দাওয়াত দেয়ার পরও এক বর্ণনায় হযরত নূহ (আঃ)-এর অনুসারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৮০ জন। কওমের অবশিষ্ট সকলেই ছিল তাঁর বিরোধী।

৩. বেশী হারে নামী দামী ও ধনিক বণিক শ্রেণীর লোকদের কোন মতবাদ গ্রহণ করাও সেটা হক হওয়ার দলীল নয়। দূর্বল শ্রেণীর লোকেরাই সাধারণতঃ ইসলামের অনুসারী হয়ে থাকে। নিম্নোক্ত হাদীছের এক ব্যাখ্যা অনুরূপ ঃ

بدأ الاسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء - (مسلم)

অর্থাৎ, ইসলামের সূচনা হয়েছে মুসাফির অবস্থায়, আবার অচিরেই সেই মুসাফির অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে। তাই এই মুসাফির গোছের লোকদের জন্য সুসংবাদ।

৪. কোন মতবাদ অনুসারীদের জাগতিক শক্তি, আর্থিক শক্তি, প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশী হওয়া তার হক হওয়ার দলীল নয়। এগুলো কম থাকলেও হক হতে পারে। কুরআন শরীফে এসেছে হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে বলেছিলঃ

وما نرك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادى الراى وما نرى لكم علينا من فضل -

অর্থাৎ, আমরা তো দেখছি নাবুঝে তোমার অনুসরণ করছে তারাই, যারা আমাদের মধ্যে অধম। (সূরাঃ ১১-হুদঃ ২৭)

হযরত শুয়ায়িব (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে বলেছিলঃ

وانا لنرك فينا ضعيفا -

অর্থাৎ, আমরা তোমাকে দেখছি আমাদের মধ্যে দূর্বল। (সূরাঃ ১১-হুদঃ ৯১)

৫. কোন অলৌকিক বা অদ্ভুত ধরনের কিছু দেখাতে পারাও কারও হক হওয়ার দলীল নয়।

অদ্ভুত কিছু অনেকভাবে দেখানো যায়। খাঁটি সাধনার মাধ্যমেও দেখানো যায়, আবার গলত তরীকায় সাধনার মাধ্যমেও দেখানো যায়। বুযুর্গীর শক্তিতেও দেখানো যায়, আবার যাদু, টোনা, তুকতাকের মাধ্যমেও দেখানো যায়।[১]

তবে ঘটিতব্য অলৌকিক বিষয়টি যাদু টোনার মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে, না ভ্রান্ত সাধনার মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে, সেটা কি সত্যিকারের বুযুর্গী ঘটিত কারামত না ভেল্কিবাজী ? তা বিজ্ঞ আলেমগণ তার আমল আকীদা ও শরী'আতের পাবন্দী-র বিচার পূর্বক বুঝতে সক্ষম হন। জহুরী জওহর চেনে। প্রকৃত কারামত এবং ভেল্কিবাজির মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম মানুষদের পক্ষে কোন বিচক্ষণ আলেম বা বুযুর্গ থেকে সে ব্যাপারে পরিষ্কার জেনে না নিয়ে এগুলির পেছনে পড়ে বা এগুলি নিয়ে ঘাটাঘাটি করে কারও ভক্ত হওয়া ভুল।

৬. কারও তাবীজ-তদবীরে ভাল কাজ হওয়া তার হক্কানী বা কামেল হওয়ার দলীল নয়। কারও তাবীজ-তদবীরে নিঃসন্তান ব্যক্তির সন্তান লাভ হওয়া বা কোন জটিল রোগ-ব্যাধি সেরে যাওয়া তদবীর দাতার কামেল হওয়ার দলীল নয়। তাবীজ-তদবীর হল দু'আর মত। যা কিছুই হয় আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ীই হয়; এক্ষেত্রে তাবীজ দাতার কোন ক্ষমতা নেই। যেমন কারও দু'আ কবূল হওয়া তার কামেল হওয়ার কোন প্রমাণ নয়। ফাসেক ফাজের, এমনকি কাফেরের দু'আও কবূল হতে পারে। কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দান বিষয়ে সবচেয়ে বড় কাফের শয়তানের দু'আ কবূল হয়েছিল। তাই দু'আ কবূল হওয়া যেমন বুযুর্গীর প্রমাণ নয়, তাবীজ-তদবীরে কাজ হয়ে যাওয়াও তদ্রূপ। একজন সাধারণ মানুষের তাবীজ-তদবীরেও কাজ হতে পারে, আবার একজন বুযুর্গের তাবীজ-তদবীরেও কাজ না হতে পারে। এটা সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, এটা মানুষের হাতে নয়।

---

১. হযরত মুজাদ্দিদে আল্‌ফে ছানী (রহঃ)-এর দরবারে একজন লোক দশ বছর পর্যন্ত ছিলেন। এই দশ বছরের মধ্যে উক্ত লোকটি হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহঃ) থেকে অলৌকিক কিছু ঘটতে দেখেন নি। একদিন তিনি মনে মনে ভাবলেন, এই দশ বছর থাকলাম, অলৌকিক কিছু দেখলাম না, অতএব এখানে থেকে আর কী হবে? আগামী কাল চলে যাব। সকাল বেলায় মুজাদ্দিদে আল্‌ফে ছানী (রহঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বল তোমার মনে কি ইচ্ছা জেগেছে.? তিনি বললেনঃ হযরত, এতদিন আপনার কাছে থেকে কোনই কারামত দেখলাম না। তাই আজ আমি চলে যাব বলে ইচ্ছা করেছি। হযরত মুজাদ্দিদে আল্‌ফে ছানী (রহঃ) বললেনঃ তোমার কি কারামত আছে ? তিনি বললেন হুজুর! আমি ধ্যান করে কবরের মধ্যে ঢুকে যেতে পারি এবং মুর্দার সাথে কথা বলে তার খবরাখবর জেনে আসতে পারি। মুজাদ্দিদে আল্‌ফে ছানী (রহঃ) বললেনঃ তুমি ধ্যান করে কবরের ভিতর ঢুকে যেয়ে তাদের অবস্থা জানবে। আর আমি এখানে বসে ডাক দিলে সেরহিন্দের সব রূহ্ হাজির হয়ে যাবে। কিন্তু এটা কোন কামালিয়াত নয়, এটা কোন বুযুর্গী নয়। বুযুর্গী হল আমল করা, শরীআতের পাবন্দী করা, সুন্নাতের এত্তেবা' করা। তুমি বল এই দশ বছর যে আমার কাছে থেকেছ, এর মধ্যে আমার থেকে কোন ফরয, ওয়াজিব নয় কোন সুন্নাত, মোস্তাহাব ছুটতে দেখেছ ? তিনি বললেন জি না ছুটতে দেখিনি। তখন মুজাদ্দিদ সাহেব বললেনঃ এটাকেই বুযুর্গী বলা হয়, এটাকেই কামাল বলা হয়। . مجالس حکیم الامت ॥

৭. কারও কাশ্‌ফ হয়ে যাওয়া বা কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন গায়েবী খবর বলে দিতে পারা তার হক্কানী বা কামেল হওয়ার দলীল নয়। যেমন একজন বলল অমুক স্থান থেকে আমার দরবারে অমুক অমুক লোক আসছে বা এই এই মাল আসছে ইত্যাদি। কেউ এগুলোকে তার কামেল, হক্কানী বা বুযুর্গ হওয়ার দলীল ভাবলেন- এটা ভুল।

না দেখা খবর অনেক ভাবে বলে দেয়া যেতে পারে - তার নিয়োগ করা লোক ফোনের মাধ্যমে তাকে জানিয়ে দিচ্ছে আর এভাবে তিনি কামালাত প্রকাশের প্রয়াস নিচ্ছেন। এমনও হতে পারে। কিংবা এমনও হতে পারে তার দরবারে লোক ঠিক করা থাকে যে, অমুক সমস্যা কেউ নিয়ে আসলে তাকে দরবারে নিয়ে আসবে অমুকে। এভাবে তাকে যখন দরবারে আনা হয় তখন পীর সাহেব বলে দেন তুমি এই সমস্যা নিয়ে এসেছ না ? ইত্যাদি। অনেক সময় জিনদের মাধ্যমেও অনেক না দেখা বিষয় জানা যায়। আবার অনেক সময় শয়তান এ জাতীয় লোকদেরকে অনেক গোপন বিষয় জানিয়ে দেয় সাধারণ মানুষকে তার খপ্পরে ফেলে বিভ্রান্ত করার জন্য। কিংবা আরও বহুভাবে এমনটি হতে পারে।

যদি মেনে নেয়া হয় এসব কোন কৌশল বা ছল-চাতুরী নয় বরং প্রকৃত পক্ষেই তার কাশ্‌ফ হয়ে থাকে আর কাশ্‌ফের মাধ্যমেই গোপন বিষয় তিনি জানতে পারেন, তাহলেও এটাকে তার হক্কানী, কামেল বা বুযুর্গ হওয়ার দলীল মনে করা যাবে না। কারণ ফাসেক ফাজের এবং পাপী মানুষেরও কাশ্‌ফ হতে পারে। হেকিমী শাস্ত্রের কিতাবে আছে সাস্থ্যগত এবং মস্তিস্কগত বিভিন্ন কারণেও অনেক সময় না দেখা বিষয় মস্তিস্কে উদিত হয়ে যায়। তাই শিশু, এমনকি পাগলও অনেক সময় গায়েবী খবর বলে দিতে পারে। হযরত থানভী (রহঃ) কুদরাতুল্লাহ নামক এক ব্যক্তির ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, সে ছিল পথভ্রষ্ট ধরনের লোক, নামাযের পর্যন্ত ধার ধারত না, কিন্তু অনেক অজানা লোকের কবরের কাছে গিয়ে বলে দিত যে, এই এই কারণে এই কবরওয়ালার শাস্তি হচ্ছে বা সে এই অবস্থায় আছে। পরে তদন্ত করে দেখা গেছে তার কথা সত্য।[১]

কাউকে কাফের আখ্যায়িত করা-এর নীতি

(اصول تکفیر)

১. যখন কেউ প্রকৃতই কাফের হয়ে যায়, তখন তাকে কাফের বলে ফতওয়া দিয়ে দেয়া মুফতীদের কর্তব্য, যাতে অন্য মুসলমান তার আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যেতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে মুফতীদের এ কথার ভয় করা উচিত হবে না যে, মৌলভীরা শুধু ফতওয়াবাজী করে বেড়ায় বা নিজেদের মধ্যে কাদা ছুড়াছুড়ি করে। কেউ কাফের হয়ে গেলে তাকে তাক্‌ফীর (কাফের আখ্যায়িত) না করার অর্থ অনেকটা তাকে হেদায়েত প্রাপ্ত আখ্যায়িত করা। কেননা সাধারণ মানুষ তার তাক্‌ফীর হতে না দেখলে তাকে হেদায়েত প্রাপ্তই মনে করবে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে কারীমে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

---

১. مجالس حکیم الامت ॥

اتريدون ان تهدوا من اضل الله -

অর্থাৎ, আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তোমরা কি তাকে হেদায়েতপ্রাপ্ত বলতে চাও?(সূরা ঃ ৪-নিসা ঃ ৮৮)

২. যদি কেউ প্রকৃতঃই কাফের না হয়ে যায়, তাহলে তাকে কাফের আখ্যায়িত করা মহাপাপ। এতে এরূপ ফতওয়া প্রদানকারী স্বয়ং নিজেই কাফের হয়ে যাবে। কেননা এতে করে সে যেটা কুফ্‌রী নয় অর্থাৎ, যেটা সঠিক ঈমান-ইসলাম সেটাকেই কুফ্‌রী আখ্যায়িত করল। আর সঠিক ঈমান-ইসলামকে কুফ্‌রী আখ্যায়িত করা কুফ্‌রীই বটে। কাজেই কুফ্‌রীর ফতওয়া প্রদানের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে-এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া সংগত নয়। যে কাফের নয় তাকে কাফের আখ্যায়িত করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا -

অর্থাৎ, কেউ তোমাদেরকে সালাম করলে (অর্থাৎ, নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ করলে) তোমরা বলনা যে, তুমি মু'মিন নও। (সূরাঃ ৪-নিসাঃ ৯৪)

যে কাফের নয় তাকে কাফের আখ্যায়িত করা দ্বারা নিজে কাফের হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গে হাদীছে ইরশাদ হয়েছে ঃ

من قال لاخيه المسلم ياكافر فقد باء به احدهما ان كان كما قال والا رجع عليه -

অর্থাৎ, যে তার কোন মুসলমান ভাইকে বলবে হে কাফের!, তাহলে (এ ক্ষেত্রে) তাদের দু'জনের একজন এ কথার পাত্র হবে- যদি সম্বোধিত ব্যক্তি এমনই হয়, তবেতো তা-ই, অন্যথায় কথাটি বক্তার দিকে ফিরে আসবে।

৩. কোন মুসলমানের কোন কথা বা কাজ কুফ্‌র কি-না- এ ব্যাপারে উভয় দিকের সম্ভাবনা থাকলে তাকে সেই কথা বা কাজের ভিত্তিতে কাফের বলে ফতওয়া দেয়া যাবে না, এমন কি কুফ্‌রের দিকটার সম্ভাবনা বেশী থাকলেও। এমনকি সেটা কুফ্‌র হওয়ার সম্ভাবনা ৯৯ ভাগ আর কুফ্‌র না হওয়ার সম্ভাবনা ১ ভাগ হলেও। তবে হ্যাঁ একটি কথা বা একটি কাজও যদি এমন পাওয়া যায় যা নিশ্চিতই কুফ্‌রী, তাহলে তার কারণে তাকে কাফের আখ্যায়িত করা হবে।

বিঃ দ্র ঃ কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, আকাইদের কিতাবে উল্লেখিত আছে কোন আহ্‌লে কিবলাকে তাক্‌ফীর করা হবে না। এর দ্বারা শুধু শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য নয় যে, কেউ কেবলা মুখী হয়ে শুধু নামায পড়লেই আর তাকে তাক্‌ফীর করা হবে না, চাই তার মধ্যে যতই কুফ্‌রীর কারণ পাওয়া যাকনা কেন। কেননা "আহ্‌লে কিব্‌লা" একটি পরিভাষা, যার অর্থ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যারা দ্বীনের কোন জরূরিয়্যাতকে অস্বীকার করে, তারা পরিভাষায় আহ্‌লে কিবলা নয়। তাদের তাক্‌ফীর করা হবে। তদ্রূপ তাক্‌ফীরের

অন্যান্য কারণ পাওয়া গেলেও তাক্‌ফীর করা হবে। আবুল বাকা-এর كليات-য়ে এ কথাগুলি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে।

وفى كليات ابى البقاء : فلا نكفر اهل القبلة ما لم يأت بما يوجب الكفر وهذا من قبيل قوله تعالى : ان الله يغفر الذنوب جميعا - وفى شرح الفقه الاكبر : ولا يخفى ان المراد بقول علمائنا لا يجوز تكفير اهل القبلة بذنب ليس مجرد التوجه الى القبلة فان الغلاة من الروافض الذين يدعون ان جبرئيل غلط فى الوحى فان الله تعالى ارسله الى علىؓ وبعضهم قالوا ان اله وان صلوا الى القبلة ليسوا بمؤمنين وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : من صلى صلوتنا واكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فذالك مسلم -

যে সব কারণে কেউ কাফের হয়ে যায়

১. যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে কুরআনে বর্ণিত সুস্পষ্ট কোন বিধান বা খবরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অথবা কুরআন দ্বারা স্বীকৃত বিষয়কে অস্বীকার বা কুরআনের মাঝে অস্বীকৃত বিষয়কে স্বীকার করে কিংবা এ বিষয়ে সংশয় সন্দেহ পোষণ করে, নিঃসন্দেহে সে কাফের হয়ে যায়। كتاب الاعلام بقواطع الاسلام গ্রন্থে এ কথাগুলিই বলা হয়েছে।

من كذب بشى مما صرح به فى القران من حكم اوخبر او اثبت مانفاه او نفى ما اثبته على علم منه بذالك اوشك فى شى من ذالك كفر-

২. এমন কথা বলা বা উক্তি করা যার দ্বারা আল্লাহ্ অথবা রাসূলকে অস্বীকার করা বুঝায় অথবা রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা বোঝায়, অথবা শরীআতের সুস্পষ্ট বিধান সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে বিদ্রূপ করা, এমনিভাবে শরী'আতের জরূরিয়্যাতকে অস্বীকার করা, এসবের দরুন সে ব্যক্তি মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যাবে। حجة الله البالغه গ্রন্থে এ কথাগুলিই বলা হয়েছে।

وتثبت الردة بقول يدل على نفى الصانع او الرسل او تكذيب رسول او فعل تعمد به استهزاء صريحا بالدين وكذا انكار ضروريات الدين -

জরূরিয়্যাতে দ্বীনের মধ্যে ভিন্ন কোন ধরনের ব্যাখ্যা দেয়াও কুফ্‌রী।

وفى حاشية الخيالى للعلامة عبد الحكيم السيالكوتى : والتاويل فى ضروريات الدين لا يدفع الكفر - وقال الشيخ محى الدين ابن العربى فى الفتوحات المكية : التاويل الفاسد كالكفر - وفى ايثار الحق على الخلق للوزير اليمانى : لان الكفر هو جحد الضروريات من الدين او تاويلها -

(اسلام اور کفر قرآن کی روشنی میں۔ مفتی محمد شفیع)

৩. فتاوى ظهيريه গ্রন্থে আছে-

ان الاخبار المروية من رسول الله ﷺ على ثلث متواتر ، فمن انكره كفر ومشهور، فمن انكره كفر الا عند عيسى بن ابان فانه يضلل ولا يكفر، وخبرالواحد، فلا يكفر جاحده غير انه يأثم بترك القبول ومن سمع حديثا فقال سمعناه كثيرا بطريق الاستخفاف كفر -

অর্থাৎ, রাসূল (সাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছ তিন প্রকার ঃ

(এক) মুতাওয়াতির (متواتر) ঃ এ প্রকার হাদীছকে অস্বীকারকারী কাফের হয়ে যাবে।

(দুই) মাশ্হুর (مشهور) ঃ অধিকাংশ উলামার মতে এ প্রকার হাদীছকে অস্বীকার কারীও কাফের হয়ে যাবে। তবে হযরত ঈসা ইবনে আবান (রহঃ) তাকে কাফের বলেন না বরং তাকে গোমরাহ বলেন। এ মতটাই বিশুদ্ধ।

(তিন) খব্রে অহেদ (خبر واحد) ঃ এ প্রকার হাদীছকে অস্বীকারকারী কাফের হবে না বটে, তবে হাদীছকে গ্রহণ না করার অপরাধে সে অবশ্যই ফাসেক ও গোমরাহ হবে। আর যে ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর কোন হাদীছ শোনার পর তাচ্ছিল্যভরে বলবে যে, আমি অনেক শুনেছি সেও কাফের হয়ে যাবে।

৪. ইজ্মার হুকুমকে অস্বীকার করা কুফ্রী। আল্লামা ইব্নে হুমাম (রহঃ) বলেন ঃ

انكار حكم الاجماع القطعى يكفر عند الحنفية وطائفة -

অর্থাৎ, হানাফী মতাবলম্বীদের নিটক অকাট্যভাবে প্রমাণিত ইজমার হুকুমকে অস্বীকার কারী কাফের।

৫. যেসব জরূরিয়্যাতে দ্বীনের উপর ইজমা সংঘটিত হয়েছে এমন জরূরিয়্যাতে দ্বীনের অস্বীকার করা কুফ্রী। আল্লামা সুবকী (রহঃ) লিখেছেন-

جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر مطلقا - (جمع الجوامع)

অর্থাৎ, জরূরিয়্যাতে দ্বীন-যার উপর সর্বযুগে ইজ্মা সংঘটিত আছে- তার অস্বীকারকারী এক বাক্যে কাফের!

অবশ্য তাদের যদি কেউ এমন হয় যে, কুরআন-হাদীছের যেসব ভাষ্য অস্বীকার পূর্বক তারা যে ধ্যান-ধারণা পোষণ করেছে তা শরয়ী বিধানের মাঝে তাবীল বা ব্যাখ্যা সাপেক্ষে করেছে, আর কুরআন-হাদীছের কোন ভাষ্যের অস্বীকৃতি যদি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হয়, তাহলে তাকে কুফরী বলা যায় না। নিদেন পক্ষে সেটাকে মুজতাহিদ ব্যক্তির ইজতিহাদী ভুল বলে গণ্য করা যেতে পারে।

তবে এ ধরনের ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, প্রথমতঃ যদি তারা কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই বেধড়ক কুরআন-হাদীছের ভাষ্যকে অস্বীকার পূর্বক মনগড়া মতামত ব্যক্ত করে। কিংবা শরয়ী হুকুমের মাঝে যে ব্যাখ্যা মূলক মতামত (تاويل) তারা দেয় তা সঠিক ব্যাখ্যা (تاويل)-এর নিয়ম নীতি অনুসরণ করে না দেয়, তাহলে তারা যে ব্যাখ্যা (تاويل)-এর

আলোকে নিজেদের ধ্যান-ধারণা পোষণ করেছে তা শরী'আতের নীতি মাফিক না হওয়াতে তারা কুফরীতে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

৬. নুসূসে কাত্ইয়্যা (نصوص قطعيه) বা কাত্ইয়্যাতকে অস্বীকার করা কুফ্রী।

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) اكفار الملحدين গ্রন্থে বলেনঃ "যারা কুরআনে বর্ণিত কোন স্পষ্ট ভাষ্য (نص صريح)কে প্রত্যাখ্যান করবে বা তা নিয়ে বিরোধ করবে, তাদের তাক্ফীরের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ইজমা' রয়েছে। যেমন কতক বাতিনিয়ারা তার জাহিরী অর্থ বাদ দিয়ে ভিন্ন অর্থের দাবী করে থাকে। অথবা সকলের নিকট নির্ভরযোগ্য বর্ণনা সূত্রে বর্ণিত কোন ব্যাপক ও নিশ্চিত অর্থবোধক কোন হাদীছ -যার মানসূখ না হওয়া, তাতে কোনরূপ তাখসীস না থাকা এবং তার জাহিরী অর্থ গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে উলামা ও ফকীহদের ঐক্যমত্য রয়েছে-এমন কোন হাদীছকে তাখ্সীস করলেও তার ভিত্তিতে তাক্ফীর হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ইজমা' রয়েছে। যেমন খাওয়ারেজগণ কর্তৃক বিবাহিত যেনাকারী পুরুষ ও নারীদের রজম সম্পর্কিত বিধানকে অস্বীকার করার কারণে তাদেরকে তাক্ফীর করা। বিবাহিত যেনাকারী পুরুষ ও নারীদের রজম সম্পর্কিত বিষয়টি সর্বসম্মত ও বদীহী বিষয়।"

وفى فتح المغيث شرح الفية الحديث : لا نكفر احدا من اهل القبلة الا بانكار قطعى من الشريعة -

অর্থাৎ, কোন "আহ্লে কিবলা" কে তাক্ফীর করা হবেনা, তবে কেউ শরী'আতের কোন সুস্পষ্ট বিধানকে অস্বীকার করলে।

* * * * *

দ্বিতীয় অধ্যায়

(এ'তেকাদী ফিরকা বিষয়ক)

* প্রাচীন এ'তেকাদী ফিরকা সমূহ ঃ

খাওয়ারেজ
(الخوارج)

নাম ও নামকরণ রহস্যঃ

এই সম্প্রদায়ের অনেকগুলো নাম আছে। যথা ঃ

১. আল-খাওয়ারেজ (الخوارج)[১]
২. আল-হারূরিয়্যাহ (الحرورية)[২]

১.শব্দটি খারিজ (الخارج) কিংবা খারেজী (الخارجى)-এর বহুবচন। আরবী (الخروج) ধাতুমূল থেকে উদগত, যার অর্থ অবাধ্য হওয়া, বিদ্রোহ করা। এই শব্দে এদেরকে এ কারণে নামকরণ করা হয়েছে যেহেতু সিফ্ফীন যুদ্ধের সময় 'সালিস' নির্ধারণের দিন হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করেছিল। অনুরূপ ভাবে কেউ হক শাসক (الامام الحق)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে -চাই সেটা সাহাবী যুগের খোলাফায়ে রাশেদার বিরুদ্ধে হোক, তাবেয়ী যুগের শাসকদের বিরুদ্ধে হোক, বা অন্য যে কোন কালের হকপন্থী শাসকের বিরুদ্ধে হোক -এই বিদ্রোহীকে 'খারেজী' বলা হবে ॥

২.কূফার ছোট শহর কিংবা গ্রাম 'হারূরা'-র দিকে নিসবত করে এই নাম রাখা হয়েছে। এরাও হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। হযরত আলী (রাঃ) যখন সিফ্ফীন থেকে কূফায় ফিরে আসছিলেন, তখন এরা 'হারূরা' নামক স্থানে সংঘবদ্ধ হয়েছিল ॥

৩. আল-বুগাত (البغاة)[১]
৪. আল-হাকামিয়্যা বা আল-মুহাক্কিমা (الحكمية او المحكمة)[২]
৫. আল-মারেকা (المارقة)[৩]
৬. আশ-শুরাত (الشراة)[৪]
৭. আন-নাওয়াসিব বা আন-নাসিবী (النواصب او الناصبى)[৫]

খারিজী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও প্রেক্ষাপট ঃ

হযরত আলী এবং হযরত মু'আবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মধ্যে সিফফীন-যুদ্ধ যখন প্রচন্ডরূপ ধারণ করল, হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর বাহিনী যখন পালাতে শুরু করল, তাদের খুব সামান্য যোদ্ধাই ময়দানে বহাল রইল। তখনই এই অবশিষ্ট ক্ষুদ্র বাহিনীর মাথায় সালিসী চিন্তা চেপে বসল। তখন তারা পবিত্র কুরআনকে উঁচু করে ধরল। উদ্দেশ্য, যাতে প্রতিপক্ষ কুরআনের ফয়সালাকে মেনে নেয়। বিজ্ঞ সাহাবী হযরত আলী (রাঃ) তাঁর বাহিনীকে বিজয় না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম লড়ে যেতে আদেশ করলেন। আর তখনই হযরত আলী (রাঃ)-এর বাহিনীর একটি দল বিদ্রোহ করে বসল। তারা বললঃ ওরা আমাদেরকে কুরআনের প্রতি আহবান করছে আর আপনি ডাকছেন যুদ্ধের প্রতি, তলোয়ারের প্রতি ?

হযরত আলী (রাঃ) তখন বললেনঃ আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআনে কী আছে তা আমি তোমাদের চেয়ে ভাল জানি। সুতরাং অবশিষ্ট বাহিনীকে ধাওয়া কর, লড়। তারা বলল, আপনি উশতুর[৬] কে ফিরিয়ে আনুন, মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে বিরত করুন।

---

১. আরবী باغ শব্দের বহুবচন। অর্থ বিদ্রোহী। খারিজীরা হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। তাই এ শব্দে নামকরণ করা হয়েছে ॥

২.এ দলটির সার্বক্ষণিক শ্লোগানই ছিল "لاحكم الا لله" অর্থাৎ, শাসনের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্। তাই এই 'حكم' শব্দ থেকেই 'হাকামিয়্যা'র উৎপত্তি। অথবা তাহ্‌কীম (التحكيم -সালিস নির্ধারণ করা) শব্দ থেকে এই নামের সৃষ্টি। খারিজীদেরকে এ কারণেই 'মুহাক্কিমা'-ও বলা হয় ॥

৩. আরবী শব্দ المروق 'মুরূক' থেকে উদগত। যার অর্থ সটকে পড়া, দ্রুত বেরিয়ে পড়া। কারণ তীর যেমন ধনুক থেকে ছিটকে পড়ে এরাও তেমনি দ্বীন থেকে ছিটকে পড়েছিল। এই ছিটকে পড়া বা দ্বীন থেকে দ্রুত বেরিয়ে পড়া অর্থেই খারিজীদেরকে মারেকা (مارقة) বলা হয় ॥

৪. আরবী শব্দ شارين (শারিন)-এর বহুবচন। অর্থ ক্রেতা বা বিক্রেতা। এদের ধারণা, এরা তাদের জীবনকে আল্লাহ্‌র কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। এ অর্থেই এদেরকে শুরাত (বিক্রেতা) বলা হয় ॥

৫. আরবী নাসিব (ناصب) শব্দের বহুবচন হলো নাওয়াসিব (نواصب)। অর্থ কঠিন, ক্লান্তিকর। এই ফিরকাটি যেহেতু হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরোধিতায় খুবই প্রান্তিক, তাই এ শব্দে নামকরণ করে এদেরকে নাসিবীও বলা হয় ॥

৬. আল-উশতুর আন-নাখঈ। হযরত আলী (রাঃ)-এর অন্যতম সহযোদ্ধা ও তাঁর বাহিনীর অধিনায়ক ॥

নইলে আমরা আপনার সাথে সেই আচরণই করব, যেমনটি উছমানের সাথে করা হয়েছিল। অবশেষে বাধ্য হয়ে হযরত আলী (রাঃ) সালিসী মেনে নিলেন। তারপর সালিসী কর্তৃক যখন সালিসী কর্ম সমাপ্ত হলো, হযরত আলী (রাঃ) অপসারিত হলেন, বহাল রইলেন হযরত মু'আবিয়া (রাঃ), তখন এই সালিসীর কারণেই বিদ্রোহ আরও বলবান হয়ে উঠল। তখন আবার এই খারিজী-বিদ্রোহী গোষ্টীই হযরত আলী (রাঃ)-এর উপর চড়াও হয়ে বসল, বললঃ মানুষকে কেন সালিস নিযুক্ত করলেন? শাসন ও ফয়সালার মালিকতো কেবল আল্লাহ! তারা এ কারণে হযরত আলী (রাঃ)কে অপরাধী সাব্যস্ত করে বসল। বললঃ এই সালিসী মেনে নিয়ে তিনি কুফ্‌রী করেছেন। তাকে তওবা করতে হবে। যেমনটি তারা করেছে। আর এখান থেকেই এই নতুন চিন্তা ও দর্শনের উদ্ভব হল যে, যে ব্যক্তি কোন কবীরা গোনাহ করবে, সে ইসলামের সীমানা থেকে বেরিয়ে পড়বে। তারপর ধীরে ধীরে তাদের চিন্তাধারা আরও প্রসারিত হয়েছে, বিস্তৃত হয়েছে।[১]

প্রতিষ্ঠাতা ঃ

শাহরাসতানী লিখেছেনঃ[২] আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে সর্ব প্রথম যারা বিদ্রোহ করে, তারা সিফফীন যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী দলভূক্ত একটি জামা'আত। অধিকন্তু তাঁর বিরোধিতা ও ইসলাম থেকে ছিন্ন হয়ে পড়ার ক্ষেত্রে কঠোর ও অগ্রনী ছিল আশআছ ইব্‌ন কায়স আল-কিন্দী, মিসআর ইব্‌ন ফাদাক আত-তাইমী, যায়েদ ইব্‌ন হুসাইন আত-তাঈ। তারাই এই শ্লোগান তুলেছিলঃ এরাতো আমাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি ডাকছে আর আপনি ডাকছেন তলোয়ারের দিকে ?

খারেজীদের দল-উপদল সমূহ ঃ

খারেজী সম্প্রদায় মৌলিকভাবে আট দলে বিভক্ত। যথা ঃ

১. আল-মুহাককিমা আল-উলা (المحكمة الاولى)[৩]

---

১. দেখুন- تاريخ المذاهب الاسلامية والملل والنحل ॥

২. আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, মিসর, ১৯৭৬ ইং, ১ম খণ্ড, ১১৪ পৃঃ ॥

৩. আল-মুহাককিমা আল-উলা ঃ এরা সেই দল যারা আমীরুল মু'নিনীন হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে সালিসীর ঘটনাকালে বিদ্রোহ করেছিল এবং হারূরা নামক স্থানে সমবেত হয়েছিল। তাদের নেতা ছিল আবদুল্লাহ ইবনুল কাওয়া, আত্‌তাব ইবনুল আ'ওয়ার, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াহাব আর-রাসিবী, উরওয়া ইব্‌ন জারীর, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবু আসিম আল-মুহারিবী, হারকূস ইব্‌ন যুহায়র আল-বাজালী, যিনি "যুছ-ছাদ্‌য়া" (ذوالثدية) নামে খ্যাত ;

এই দলটির ধর্ম বিশ্বাস বলতে যা ছিল তা হল, হযরত আলী, হযরত উছমান, জঙ্গে জামালে অংশ গ্রহণকারী মুসলমানগণ, হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ও তার অনুসারীদেরকে কাফের মনে করা, অনুরূপভাবে গোনাহ্‌কারী পাপী বলতে সকলেই কাফের। তারা বলতঃ আমাদের বিরোধী যারা তারা সকলেই কাফের ॥

২. আল আযারিকা (الازارقة)[১]
৩. আন-নাজদাত (النجدات)[২]
৪. আল-আজারিদা (العجاردة)[৩]
৫. আছ-ছা'আলিবা (الثعالبة)[৪]
৬. আল-ইবাযিয়্যা (الاباضية)[৫]

---

১. আল-আযারিকা ঃ এ দলটি আবূ রাশিদ নাফি' ইব্‌নুল আযরাক (نافع بن الازرق) আল-হানাফীর অনুসারী। বনূ হানীফা গোত্রে জন্ম বলে তাকে 'হানাফী' বলা হয়। খারিজীদের মধ্যে এরা ছিল সর্বাধিক ভণ্ড-দুর্দান্ত। সংখ্যাধিক্য ও মর্যাদায় তারা খারেজীদের শীর্ষ দল। তাদের একটি অন্যতম বিশ্বাস হল- যে অঞ্চল বা দেশের লোকেরা তাদের বিরোধীতা করবে সে দেশ ও অঞ্চল হবে দারুল কুফ্‌র। সেখানকার শিশু নারী ও বৃদ্ধদেরকে হত্যা করা জায়েয আছে। তারা মনে করে, তাদের বিরোধীরা এমনকি এই বিরোধীদের ছোট শিশুরা পর্যন্ত অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে। তারা ব্যভিচারীদের উপর পাথর মারার শাস্তি-বিধানকে অস্বীকার করে এবং এও বিশ্বাস করে নবীরা সগীরা এমনকি কবীরা গোনাহ্‌ও করতে পারেন। তাদের মতে, তাদের অনুসারী ছিল এমন ব্যক্তি যদি তাদের কাছে 'হিজরত' করে চলে না যায় তাহলে তারা মুশরিক। এমনকি যদি তাদের বিশ্বাসের অনুসারী হয় তবুও। এই দলের নেতা আযরাক মৃত্যু বরণ করে ৬৮৫ ঈঃ সালে। المنجد فى قسم الاعلام ॥

২.আন-নাজ্‌দাত ঃ এটি নাজদা ইব্‌ন আমির এর অনুসারী দল। কেউ কেউ আবার বলেছেনঃ নাজদা ইব্‌ন আসিম। আবার কারো কারো মতে নাজদা ইব্‌ন উমায়র আল-হানাফী। বনূ হানীফা গোত্রভুক্ত। সে ইয়ামামা অঞ্চলে বিদ্রোহ করেছিল। তার গোমরাহীর অন্যতম কয়েকটি দিক হলো সে মদ পানের শাস্তি 'হদ' কে রহিত করে দিয়েছে। তার মতে, তার ধর্ম- মতের যে বিরোধিতা করবে সেই জাহান্নামী। তাকে তার-ই অনুসারীরা হিজরী ৬৯ সাল মোতাবেক ৬৮৮ খৃষ্টাব্দে হত্যা করে দেয়। المنجد فى قسم الاعلام ॥

৩.আল-আজারিদা ঃ এ দলটি মূলতঃ আবদুল করীম ইবনুল আজারিদ-এর অনুসারী। এই আব্দুল করীম আতিয়্যা ইবনুল আসওয়াদ আল-হানাফী-র একজন অনুসারী। আল-আতিয়্যা নাজ্‌দার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। অতঃপর নাজদাতের একটি ক্ষুদ্র দলসহ সিজিস্‌তানে চলে যায় ॥

৪. আছ-ছা'আলিবা ঃ ছা'লাবা ইব্‌ন মিশ্‌কান (ثعلبة بن مشكان)-এর অনুসারী দল। (الفرق بين الفرق) আর الملل النحل গ্রন্থে এর নাম লেখা হয়েছেঃ ছা'লাবা ইব্‌ন আমের। خطط المقريزى তেও অনুরূপই উল্লেখিত হয়েছে। সে মনে করত তাদের গোলাম যখন সম্পদশালী হয়ে ওঠবে তখন তাদের থেকে যাকাত নেয়া হবে। আর তাদেরকে যাকাত দেয়া হবে তখন, যখন তারা অভাবী হবে ॥

৫. আল-ইবাযিয়্যা ঃ এরা হল আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইবায আল-মারী আত-তামিমীর অনুসারী। তাদের মতাবলীর মধ্যে রয়েছে- মুসলমানদের মধ্যে যারা তাদের বিরোধী তারা মুশরিক নয়। তবে মু'মিনও নয়। এরা তাদেরকে কাফের বলে এই অর্থে যে, এরা আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের অস্বীকারকারী উল্লেখ্য "কাফের" শব্দটি আভিধানিক ভাবে নেয়ামত অস্বীকারকারী -অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তার এও বলেঃ তাদের বিরোধীদের দেশ তাওহীদের দেশ। তাদের সৈনিকদের অঞ্চল হল বিদ্রোহীদের অঞ্চল। তার মৃত্যু হয়েছে আনুমানিক ঈঃ ৭০৬ সালে। المنجد فى اللغة والاعلام ॥

৭. আস-সাফারিয়্যা আয-যিয়াদিয়্যা (الصفرية الزيادية)[১]
৮. আল-বায়হাসিয়্যা (البيهسية)[২]

উল্লেখিত আজারিদা আবার সাত দলে বিভক্ত। তার মধ্যে একটি হল আল হাযিমিয়্যা (الحازمية)। এই হাযিমিয়্যা আবার ২ দলে বিভক্ত। এতে করে আজারিদার মোট শাখা দাঁড়ায় ৮টি। অনুরূপভাবে উল্লেখিত ছা'আলিবাও ৬ দলে বিভক্ত। ইবাযিয়্যা বিভক্ত ৫ দলে। এভাবে খারিজীদের মোট দল সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪।[৩]

খারিজীদের মৌলিক আকীদা ও চিন্তাধারা ঃ

ইমাম আবূ যুহ্‌রা আল-মিসরী বলেছেনঃ যেসব বুনিয়াদী চিন্তাধারা খারেজীদের সকল ফিরকার মধ্যেই পাওয়া যায় তা হল ঃ

১. খলীফা নির্বাচনের একমাত্র পদ্ধতি হল সুস্থ স্বাধীন লোকের নির্বাচন। এই দায়িত্ব পালন করবে সাধারণ মুসলমানগণ। তাদের নির্দিষ্ট কোন দল নয়। খলীফা যতক্ষণ ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, শরী'আতের বিধি-বিধান বাস্তবায়িত করবে, ভুল, বিচ্যুতি ও ভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত থাকবে, ততক্ষণ সে-ই খলীফা থাকবে। আর যদি সে সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, তাহলে তাকে অপসারণ করা কিংবা হত্যা করা ওয়াজিব।

(আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল খলীফা দু'ভাবে হতে পারে। অধিকারীদের নির্বাচন অথবা পূর্ববর্তী খলীফার পক্ষ থেকে মনোনয়ন দ্বারা। দেখুন, ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারেদী কৃত "আল-আহকামুস সুলতনিয়্যা"।)

---

১. আস-সাফরিয়্যা আয-যিয়াদিয়্যা ঃ এরা হলো যিয়াদ ইব্‌নুল আস্‌ফারের অনুসারী। তাদের মতে তাকিয়্যা (সত্য গোপন করা) জায়েয আছে কথায়-কর্মে নয়। সাফরিয়্যাদের একটি ফিরকার ধারণা হলো যে, সব পাপে 'হদ' নেই- যেমন নামায-রোযা বর্জন এসব পাপ কুফ্‌রী। যারা এসব পাপ করে তারা কাফের ॥

২. আল-বাইহাসিয়্যা ঃ الفرق بين الفرق গ্রন্থে বলা হয়েছে আবূ বাইহাস হাইছাম ইব্‌ন আমেরের অনুসারী দল এটি। الملل والنحل গ্রন্থে শাহরাসতানী বলেছেন তার নাম হাইছাম ইব্‌ন জাবির। আবূ বাইহাছ থেকে বর্ণিত আছে, তার মত হল - হক ও বাতিলকে জানার নামই ঈমান। সে আরও বলেছেঃ ঈমান হলো ক্বলব দ্বারা জানার নাম। কওল ও আমল- তথা মুখে স্বীকার ও তা আমলে রূপায়ন নয়। তবে তার থেকে এরূপও বর্ণিত আছে যে, মুখে স্বীকৃতি ও অন্তরে জানার সমন্বিত রূপ হল ঈমান। দুটোর যে কোন একটিকে ঈমান বলা যাবে না। আর সাধারণ বাইহাসিয়্যাদের মতে অন্তর দিয়ে জানা, মুখে স্বীকারোক্তি করা এবং আমল করা সবটার সমন্বিত রূপই হল ঈমান। উল্লেখ্যঃ কেউ কেউ উমাবিয়্যা, ইয়া'কূবিয়্যা, ফাদ্‌লিয়্যা এবং দাহিকিয়্যাকেও এ ফিরকার অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তবে খারিজীদের মধ্যে আযারিকা, ইবাযিয়্যা, সাফারিয়্যা প্রভৃতিই অধিক পরিচিত ॥

৩. এই ২৪ দলের ছক ও তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আমার الاستفادة من شرح ابن ماجة দেখা যেতে পারে ॥

২. খলীফা কুরাইশী হবে এমন কোন কথা নেই- যেমনটি অন্যরা বলে। অনুরূপভাবে কোন আরবী কোন অনারবীর চাইতে অধিক হকদারও নয়। বরং সকলেই এক্ষেত্রে সমান। তবে তারা অ-কুরাইশী খলীফা হওয়াকেই বেশী প্রাধান্য দেয়। এটা এ কারণে, যাতে তাকে অপসারণ করা কিংবা হত্যা করা সহজ হয় -যদি সে শরীআত বিরোধী কিছু করে অথবা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

(এ বিষয়ে আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ভিন্ন মত রয়েছে। তাদের মত জানার জন্যদেখুন تاريخ المذاهب الاسلامية . الاحكام السلطانية ও مقدمة ابن خلدون)

৩. খারিজীদের বিশিষ্ট ফিরকা 'নাজ্‌দাত'-এর মত হল, যদি জনগণ পরস্পরে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় তাহলে 'ইমাম' বা 'খলীফা' নির্বাচনের কোন প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ জনগণ যদি মনে করে, ইমাম ব্যতীত পরিপূর্ণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়, তারা যদি মনে করে, তাদেরকে সত্য ও হকের উপর উৎসাহিত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একজন ইমাম দরকার এবং তারা তা করেও নেয় তাহলে জায়েয আছে। তাদের দৃষ্টিতে শরী'আতের পক্ষ থেকে নির্ধারিত কর্তব্য হিসেবে ইমাম নির্বাচন করা ওয়াজিব নয় বরং জায়েয। যদি ওয়াজিব হয় সেটা জনগণের কল্যাণ ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে, ইসলামের আদেশ হিসেবে নয়।

(ইমাম আবূ যুহ্‌রা মিসরী (রহঃ) বলেছেনঃ জমহূর উলামা একমত, এমন একজন ইমাম নির্বাচন করা আবশ্যক যিনি মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য-সংহতি ও পারস্পরিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করবেন; হুদূদে শরী'আত ও দণ্ড-বিধি বাস্তবায়ন করবেন; ধনীদের থেকে যাকাত আদায় করবেন; যারা ঝগড়া-বিবাদে তাঁর স্মরণাপন্ন হবে তিনি তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন; একতা প্রতিষ্ঠা করবেন; ইসলামী আইন-কানূন বাস্তবায়ন করবেন; বিশৃংখলা দূর করবেন; শৃংখলা কায়েম করবেন; এমন শহর প্রতিষ্ঠিত করবেন যেমন শহর প্রতিষ্ঠিত করতে ইসলাম উৎসাহিত করেছে।)

. খারিজীরা পাপীদেরকে কাফের মনে করে। তারা বড় পাপ আর ছোট পাপের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। বরং তারা মতের ভুলকেও পাপ মনে করে, যদি সে মত তাদের দৃষ্টিতে যা সঠিক তার বিপরীত হয়। তারা সালিস মানার কারণে হযরত আলী (রাঃ) কেও কাফের মনে করে। হযরত আলী, হযরত উছমান, জঙ্গে জামালে অশংগ্রহণকারী সকল মুসলমান এবং উভয় সালিসকেও তারা কাফের মনে করে। অধিকন্তু যারা এটাকে সাঠিক মনে করেছে কিংবা যে কোন একজন সালিসকে হক মনে করেছে, অথবা যারা সালিসী মেনে নিয়েছে তারা সকলেই কাফের। এটা সকল খারিজীদের ঐকমত্যের অভিমত।[১]

(আর আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মত হলো, যেমনটি আকীদাতুত-তাহাবীতে আছেঃ আহ্‌লে কিবলার[২] কাউকে কোন গোনাহের কারণে আমরা কাফের মনে করি না। যতক্ষণ সে তা বৈধ মনে না করে।)

---

১. الفرق بين الفرق ॥ ২. আহলে কিবলা হল, যে বা যারা জরূরিয়্যাতে দ্বীনের স্বীকৃতি দেয় ॥

৫. তারা অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে জায়েয মনে করে। বরং বলেঃ শাসক যদি বিচ্যুত হয়ে পড়ে তখন তাকে হত্যা কিংবা অপসারণ করা ওয়াজিব।

(আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলেনঃ আমরা আমাদের ইমাম/খলীফা কিংবা শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে জায়েয মনে করি না। যদি তারা অত্যাচার করে-তবুও না। আমরা তাদের জন্যে বদ-দুআও করি না। তাদের আনুগত্য থেকে আমরা আমাদের হাতকে সরিয়েও নেই না। আমরা তাদের আনুগত্যকে আল্লাহ তা'আলার আ-নুগত্যের মত কর্তব্য মনে করি। কারণ, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত কোন অপরাধের আদেশ না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাদের অনুসরণ করতে আদেশ করেছেন।[১]

৬. তারা হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রতি লা'ণত ও অভিশম্পাত করে।[২]

(পক্ষান্তরে আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তাঁকে খোলাফায়ে রাশেদার অন্তর্ভুক্ত এবং সঠিক পথপ্রাপ্ত ইমামদের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। তাঁরা কোন সাহাবীকেই মন্দ ভাবে স্মরণ করেন না।)

৭. তারা নামায ও জামা'আতের সুন্নাতকে অস্বীকার করে।[৩]

শায়েখ আবুল হাসান (রহঃ) বলেনঃ খারেজী গোষ্ঠী তাদের দলের দর্শন এবং চিন্তাগত বিভক্তি ও বিভাজন সত্ত্বেও হযরত আলী, হযরত উছমান, জঙ্গে জামালে অংশগ্রহণ-কারীগণ, দুই সালিস, সালিসীর প্রতি সমর্থক ও সন্তুষ্ট, উভয় সালিস কিংবা যে কোন একজনকে সত্যায়নকারী - এই সকলকে তারা কাফের মনে করে এবং যালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকেও বৈধ মনে করে। এ সব বিষয়ে তাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই।

খারিজীদের দলীলসমূহ ঃ

খারিজীদের আকীদাসমূহের মূল হলঃ গোনাহে কবীরায় লিপ্ত হলে কেউ মুসলমান থাকে না বরং সে কাফের হয়ে যায়। তারা তাদের এ আকীদার পক্ষে দলীল স্বরূপ পেশ করে থাকে ঐ সব আয়াত ও হাদীছ, যেগুলোর বাহ্যিক অর্থ দৃষ্টে মনে হয় কোন নেক আমল বর্জন করলে বা কোন গোনাহে লিপ্ত হলে সে মু'মিন থাকে না, কাফের হয়ে যায়। যেমনঃ এক আয়াতে এসেছেঃ

(١) ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العلمين -

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করা কর্তব্য ঐ সব লোকদের উপর যারা সে পর্যন্ত যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। আর কেউ কুফ্‌রী করলে আল্লাহ জগৎবাসীদের মুখাপেক্ষী নন। (সূরাঃ ৩-আলু ইমরান ঃ ৯৭)

---

১. عقيدة الطحاوى ॥

২. المصدر السابق. مقدمه ॥

৩. المصدر السابق.. ॥

(٢) فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون -

অর্থাৎ, আর যাদের মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন হবে, (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা ঈমানের পর কুফ্‌রী করেছিলে? অতএব তোমাদের কুফ্‌রীর কারণে তোমরা শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করতে থাক। (সুরাঃ ৩-আলুইমরান ঃ ১০৬)

(٣) ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قترة اولئك هم الكفرة الفجرة -

অর্থাৎ, আর অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলিধূসর। সেগুলিকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা। তারাই কাফের ও পাপাচারী। (সুরাঃ ৮০-আবাসা ঃ ৪০-৪১)

(٤) الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة -

অর্থাৎ, যেনাকারী পুরুষ ও যেনাকারিনী নারী, তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত কর। (সূরাঃ ২৪-নুর ঃ ২)

এছাড়া তারা ঐ সমস্ত হাদীছও দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে থাকে যেসব হাদীছে বাহ্যতঃ কবীরা গোনাহের কারণে বেহেশতে প্রবেশ না করার কথা এবং জাহান্নামে প্রবেশ করার কথা বিধৃত হয়েছে। যেমন-

(١) لايدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر - (مسلم جـ١)

অর্থাৎ, যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

(٢) لايدخل الجنة قتات (متفق عليه)

অর্থাৎ, চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

(٣) ومن قتل نفسه بشى عذب به وفى رواية خالدا مخلدا فيها ابدا (مسلم جـ١)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন কিছু দিয়ে আত্মহত্যা করবে, তাকে ঐ বস্তু দিয়ে শাস্তি দেয়া হবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে সে জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে।

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এ সমস্ত আয়াত ও হাদীছ সমূহকে কঠিন অভিব্যক্তি জ্ঞাপক (تشدد) অর্থে গ্রহণ করেছেন বা আরও বিভিন্ন ভাবে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অন্যান্য সহীহ্ হাদীছের আলোকে সেরূপ ব্যাখ্যা দেয়া বৈ গত্যন্তর নেই।

খারিজীদের তাক্‌ফীর (تكفير) সম্পর্কিত বিধান ঃ

এটি যে একটি নিন্দিত ও ভ্রান্ত দল বা ফিরকা এতে উম্মতের কারও কোন মতবিরোধ নেই। কিন্তু তারা কি কাফের ? এ প্রশ্নে এসে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। আমরা এ সুবাদে দুই রকমের অভিমত পাই। ১. তারা বিদ্রোহী, ফাসেক, অপরাধী। ২. তারা কাফের। যারা তাদেরকে কাফের নয় বরং ফাসেক মনে করেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লামা খাত্তাবী, ইমাম গাযালী, কাযী ইয়ায প্রমুখ মনীষীগণ। আর যারা কাফের মনে

করেন তাদের মধ্যে রয়েছেন শায়েখ তকী উদ্দীন সুব্‌কী, ইমাম তাবারী। ইমাম বুখারীর ঝোঁকও এই দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতি বলে অনুমিত হয়। তিরমিযী শরীফের বাখ্যাগ্রন্থে কাযী আবূ বকর ইবনুল আরাবী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, বিশুদ্ধ মত হল তারা কাফের। ইমাম কুরতুবীও তদীয় গ্রন্থ 'المفهم'-য়ে একথা বলেছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ, যারা খাওয়ারেজদের তাক্‌ফীর করেন তাদের দলীল সমূহ ঃ

১. বিভিন্ন হাদীছ ঃ যেমন-

(١) قوله عليه السلام : يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ـ

অর্থাৎ, তারা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যায় যেমন তীর শিকার থেকে বেরিয়ে যায়।

(٢) و قوله عليه السلام : هم شرار الخلق والخليقة ـ

অর্থাৎ, তারা মাখ্‌লূকের মধ্যে নিকৃষ্টতর।

(٣) وقوله عليه السلام : لاقتلنهم قتل عاد وفى لفظ ثمود ـ

অর্থাৎ, তাদেরকে পেলে আদ/ছামূদ গোত্রের মত হত্যা করব।

(٤) وقوله عليه السلام : كلاب اهل النار ـ

অর্থাৎ, তারা জাহান্নামের কুকুর।

২. তারা বিশিষ্ট সাহাবীদেরকে কাফের আখ্যায়িত করেছিল। প্রকারান্তরে নবী (সাঃ)কেই অস্বীকার করা হয়। কেননা নবী করীম (সাঃ) তাদেরকে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন।

৩. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্‌মীরী (রহঃ) বলেন ঃ খাওয়ারেজদের কাফের আখ্যায়িত করার ব্যাপারে সবচেয়ে স্পষ্ট দলীল হল ইব্‌নে মাজা শরীফে বর্ণিত হাদীছ, যা হযরত আবূ উমামাহ (রাঃ) বয়ান করেছেনঃ

قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا ـ

অর্থাৎ, তারা মুসলমান ছিল অতঃপর কাফের হয়ে গিয়েছে।

প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ, যারা খারেজীদেরকে কাফের মনে করেন না, তাদের দলীল সমূহ ঃ

১. উপরে বর্ণিত প্রথম হাদীছ অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে খারেজীদের ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার কথা বলা এবং তীর নিক্ষেপকারী কর্তৃক তীরের দিকে দৃষ্টিপাত করার কথা বলার পর সবশেষে বলা হয়েছে ঃ

فتمارى هل يرى شيئا ام لا ؟

অর্থাৎ, তখন সন্দেহ হল যে, সে কিছু দেখল কি না।

এখানে تمارى অর্থ সন্দেহ। অর্থাৎ, তাদের ইসলাম থেকে বের হওয়াটা সন্দেহপূর্ণ হয়ে গেল। আর কারও ইসলামে প্রবেশের ব্যাপারে একীন অথচ বের হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকলে এমন কাউকে কাফের আখ্যায়িত করা যায় না।

২. হযরত আলী (রাঃ) কে নাহ্‌রওয়ান অধিবাসীদের সম্পর্কে (তারা ছিল খাওয়ারেজ) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তারা কি কাফের? তিনি জওয়াব দিয়েছিলেন ঃ

من الكفر فروا -

অর্থাৎ, তারাতো কুফ্‌রী থেকে ভেগেছে। আবার জিজ্ঞাসা করা হল তারা কি মুনাফিক ? তিনি বললেন ঃ

ان المنافقين لا يذكرون الله الا قليلا ، وهؤلاء يذكرون الله بكرة واصيلا -

অর্থাৎ, মুনাফিকরা খুবই কম আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, অথচ এরা সকাল-সন্ধা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে।

আবার জিজ্ঞাসা করা হল তবে তারা কি ? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ

قوم اصابتهم فتنة فعموا وصموا -

অর্থাৎ, তারা এমন এক সম্প্রদায়, ফিতনায় পতিত হওয়ার ফলে যারা অন্ধ ও বধির হয়ে গেছে।

হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্‌মীরী (রহঃ) اكفار الملحدين গ্রন্থে বলেন ঃ হযরত আলী (রাঃ) থেকে উপরোক্ত উক্তি যদি প্রমাণিত থেকে থাকে, তবে তা খারেজীদের কুফ্‌র প্রমাণিত হতে পারে এমন আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে হযরত আলী (রা)-এর অবগত না থাকার ভিত্তিতেই হয়ে থাকবে। তা দ্বারা দলীল দেয়া চলবে না এ কারণে যে, উপরোক্ত হাদীছের কোন কোন তুরুকে لم يعلق منه بشئ বাক্য এসেছে। আবার কোন কোন তুরুকে سبق الفرث والدم বাক্য এসেছে। সবগুলি তুরুকের সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, মূল সন্দেহ ছিল তীরের উপরিভাগে শিকারের কোন রক্ত মাংস লেগে আছে কি না সে ব্যাপারে। তারপর দেখা গেল তীর বা তার কোন অংশেই শিকারের কোন চিহ্ন লেগে নেই। এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে, মতবিরোধ মূলতঃ খারিজীদের কিছু ব্যক্তি সম্পর্কে। এমতাবস্থায় يتمارى উক্তিটি দ্বারা ইংগিত হবে যে, তাদের কতক ব্যক্তির মধ্যে ইসলামের কিছুটা অবশিষ্ট থাকবে। আল্লামা কুরতুবী المفهم গ্রন্থে বলেনঃ খারিজীদের কাফের বলার উক্তিটি হাদীছে অধিকতর স্পষ্ট।

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্‌মীরী (রহঃ) اكفار الملحدين গ্রন্থের অন্যত্র বলেনঃ "যারা কুরআনে বর্ণিত কোন স্পষ্ট ভাষ্য (نص صريح)কে প্রত্যাখ্যান করবে বা তা নিয়ে বিরোধ করবে, তাদের তাক্‌ফীরের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ইজমা' রয়েছে। যেমন কতক বাতিনিয়ারা তার জাহিরী অর্থ বাদ দিয়ে ভিন্ন অর্থের দাবী করে থাকে। অথবা সকলের নিকট নির্ভরযোগ্য বর্ণনা সূত্রে বর্ণিত কোন ব্যাপক ও নিশ্চিত অর্থবোধক কোন হাদীছ -যার মানসূখ না হওয়া, তাতে কোনরূপ তাখসীস না থাকা এবং তার জাহিরী অর্থ গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে উলামা ও ফকীহদের ঐক্যমত্য রয়েছে-এমন কোন হাদীছকে তাখ্‌সীস করলেও তার ভিত্তিতে তাক্‌ফীর হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ইজ্‌মা' রয়েছে। যেমন খাওয়ারেজগণ কর্তৃক বিবাহিত যেনাকারী পুরুষ ও নারীদের রজম সম্পর্কিত বিধানকে অস্বীকার করার কারণে তাদেরকে তাক্‌ফীর করা। বিবাহিত যেনাকারী পুরুষ ও নারীদের রজম সম্পর্কিত বিষয়টি একটি সর্বসম্মত ও দ্বীনের জরূরিয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত বিষয়।"

খাওয়ারেজদের তাক্‌ফীর সম্পর্কিত اكفار الملحدين গ্রন্থে বর্ণিত উপরোক্ত উলামায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্টতঃ বোঝা গেল যে, নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামের একটা বিরাট অংশ তাদের তাক্‌ফীরের পক্ষে রয়েছেন। এতদসত্ত্বেও আল্লামা খাত্তাবী বলেন ঃ খাওয়ারিজগণ গোমরাহ হওয়া সত্ত্বেও তারা মুসলমানদের একটা দল - এ ব্যাপারে উলামাদের ইজমা' রয়েছে। আরও অনেকে জমহুরের মত তাদের তাক্‌ফীর না করার ব্যাপারে রয়েছে বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাক্‌ফীর করার পক্ষে উপরোক্ত নির্ভরযোগ্য বহু সংখ্যক উলামায়ে কেরামের মতামতকে বাদ দিয়ে কিভাবে ইজমা' সংঘটিত হওয়ার দাবী করা যায় তা কিছুটা বিবেচনার অপেক্ষা রাখে।

শী'আ মতবাদ

শী'আ (الشيعة) শব্দটির আভিধানিক অর্থ দল, অনুসারী, সমর্থক ও সাহায্যকারী। বর্তমানের পরিভাষায় শী'আ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি হযরত আলী (রাঃ) ও আহ্‌লে বায়ত-এর সমর্থক, ইমামত আকীদায় বিশ্বাসী এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর চেয়ে হযরত আলী (রাঃ)-এর অধিক মর্তবা থাকার প্রবক্তা।[১] শী'আদেরকে "রাফিজী"ও বলা হয়।[২]

শী'আ মতবাদ সৃষ্টির প্রেক্ষাপট ও সূচনা ঃ

ইয়ামানের সানআ শহরের জনৈক ইয়াহুদী আলেম ছিল আব্দুল্লাহ ইব্‌নে সাবা ওরফে ইব্‌নে সাওদা' (ابن سوداء)। হযরত উছমান (রাঃ)-এর খেলাফত কালে সে ইসলাম গ্রহণ করে। তার আসল লক্ষ্য ছিল নিজেকে মুসলমান বলে জাহির করে মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ ও ফাটল সৃষ্টি করে মুসলামনদের মধ্যে ফিৎনা ও গোলযোগ সৃষ্টি করত ঃ ভিতর থেকে ইসলামকে বিকৃত ও ধ্বংস করা। সে মদীনায় কিছু দিন কাজ করে সফলকাম হতে না পেরে বসরা গেল। এক সময় সিরিয়া গেল। কিন্তু এসব জায়গায় পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে না পেরে অবশেষে মিসর গমন করল। এখানে সে কিছু লোককে তার দুরভিসন্ধিতে সাহায্যকারী পেয়ে গেল।

---

১. رد شیعیت. مولانا محمد جمال صاحب استاد تفسیر دار العلوم دیوبند ॥

২. এই নাম শী'আদের ইমাম যায়েদ ইব্‌নে আলী (রাঃ) প্রদান করেন। ১২১ হিজরীতে যখন যায়েদ ইব্‌নে আলী হিশাম ইব্‌নে আব্দুল মালিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন তখন যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায়ই শী'আদের একটি দল তাকে বলেছিল আমরা এই শর্তে আপনার সহযোগিতা করতে পারি যে, আপনি হযরত আবূ বকর ও ওমর সম্বন্ধে আপনার মত প্রকাশ করবেন। যায়েদ ইব্‌নে আলী প্রথমতঃ হযরত আবূ বকর ও ওমর (রাঃ)-এর জন্য রহমতের দুআ করলেন এবং বললেন আমি তাঁদের সম্বন্ধে ভাল কথাই বলব। তখন শী'আগণ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল হযরত যায়েদ ইব্‌নে আলীর সাথে থাকল আর একদল তার পক্ষ ত্যাগ করল। হযরত যায়েদ ইব্‌নে আলী তখন দলত্যাগী লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ رفضتمونی অর্থাৎ, তোমরা আমাকে ত্যাগ করলে? এখান থেকেই তাদের নাম হয়ে যায় "রাফিজী" বা দলত্যাগী ॥

ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে সে সর্ব প্রথম এই ধোঁয়া ছাড়ল যে, মুসলমানদের প্রতি আমার আশ্চর্য লাগে, যারা এ পৃথিবীতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর পুনরায় আগমন করার কথা বিশ্বাস রাখে কিন্তু সাইয়্যিদুল আম্বিয়া মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর এ ধরনের পুনরাগমনে বিশ্বাস রাখে না। অথচ তিনি সকল পয়গম্বরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। তিনি অবশ্যই পুনরায় এ পৃথিবীতে আগমন করবেন। অতপর যখন সে দেখল এ কথাটি মেনে নেয়া হয়েছে, তখন সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে হযরত আলী (রাঃ)-এর বিশেষ আত্মীয়তার ভিত্তিতে তাঁর প্রতি অসাধারণ ভক্তি ও মহব্বত প্রকাশ করে তাঁর শানে নানারকম বাড়াবাড়ির কথা-বার্তা শুরু করে দিল। এক পর্যায়ে সে বলল প্রত্যেক নবীর একজন ওসী বা ভারপ্রাপ্ত থাকেন। নবীর ইন্তেকালের পর সেই ভারপ্রাপ্তই নবীর স্থানে উম্মতের প্রধান হয়ে থাকেন। রাসূল (সাঃ)-এর পরও নিয়মানুযায়ী একজন ভারপ্রাপ্ত থাকার কথা। তিনি কে ? তিনি হলেন হযরত আলী (রাঃ)। সে বলল তাওরাতেও তাঁকেই ভারপ্রাপ্ত বলা হয়েছে। অতএব রাসূল (সাঃ)-এর পর খলীফা হওয়ার অধিকার প্রকৃতপক্ষে হযরত আলী (রাঃ)-এর। কিন্তু রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পর চক্রান্ত করে আলীর অধিকারকে ছিনিয়ে নিয়ে তাঁর স্থলে আবূ বকরকে খলীফা বানানো হয়েছে। তারপর তিনি পরবর্তী সময়ের জন্য ওমরকে মনোনীত করে গেছেন। ওমরের পরও আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে চক্রান্ত হয়েছে এবং উছমানকে খলীফা করা হয়েছে, যে এর মোটেই যোগ্য নয়। সে হযরত উছমান (রাঃ)কে অযোগ্য প্রমাণিত করার জন্য তার বিভিন্ন গভর্নরদের নানান বিষয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতির দিক তুলে ধরতে থাকল। এভাবে এক পর্যায়ে আব্দুল্লাহ ইব্‌নে সাবার অনুসারী একদল লোক হযরত উছমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠল এই বলে যে, উছমান এবং তার গভর্ণরদের কারণে উম্মতের মধ্যে যে ভ্রষ্টতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তা দূর করা দরকার। শেষ পর্যন্ত তারা হযরত উছমান (রাঃ)কে হত্যা করল। এবং তারাই তলোয়ারের মুখে হযরত আলী (রাঃ)কে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য করল। কিন্তু হযরত উছমান (রাঃ)-এর মজলূম সুলভ শাহাদাতের কারণে অথবা এ শাহাদাতের খোদায়ী শাস্তি স্বরূপ মুসলিম উম্মাহ দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল এবং এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফীনের মত পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহ পর্যন্ত সংঘটিত হল।

এই জঙ্গে সিফফীনে আব্দুল্লাহ ইব্‌নে সাবার বিপুল সংখ্যক ভক্ত হযরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষে ছিল। তাদেরকে বলা হত "শী'আনে আলী" সংক্ষেপে "শী'আ"। "শী'আনে আলী" কথাটার অর্থ হল আলীর দল। আব্দুল্লাহ ইব্‌নে সাবাই হল শী'আ দলের প্রতিষ্ঠাতা।[১]

১.শী'আদের ইতিহাসের এই কলঙ্ক মুছে ফেলার জন্য কতিপয় শী'আ ঐতিহাসিক বলেছেনঃ আব্দুল্লাহ ইব্‌নে সাবা নামে ইতিহাসে কোন ব্যক্তি অতিবাহিত হয়নি। তার নাম হল একটা কাল্পনিক নাম। বাগদাদ ইউনিভার্সিটির শিক্ষক মুর্তজা আল-আসকারী عبد الله ابن سبا গ্রন্থে এরূপ বলেছেন। ডক্টর তাহা হোসাইনও তার গ্রন্থ التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية جـ/١ صفحـ/٤٣٢ য়েতে আব্দুল্লাহ ইব্‌নে সাবা নামের কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকার ব্যাপারে সন্দেহ ব্যক্ত করেছেন। অথচ মুসলমানদের সর্বজন বিদিত শত্রু সার উইলিয়াম ম্যুরের ন্যায় ব্যক্তিও আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে সাবার কথা স্বীকার করেছেন। প্রসিদ্ধ শী'আ ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ হাছান ইব্‌নে মূসাও অনুরূপ স্বীকৃতি দিয়েছেন। শী'আদের নিকট নির্ভরযোগ্য গ্রন্থেও তার কথা স্বীকার করা হয়েছে।

رد شیعیت. مولانا محمد جمال صاحب استاد تفسیر دار العلوم دیوبند۔ থেকে গৃহীত ॥

এই ঐতিহাসিক পেক্ষাপটে শী'আ সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে ছিল একটি রাজনৈতিক দল। যদিও তাদের উদ্ভব হয় রাজনৈতিকভাবে, কিন্তু কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত ব্যাপারে অভূতপূর্ব বিতর্ক ও বিভ্রান্তির সূচনা করে। জঙ্গে সিফফীনের সময় থেকেই এই আকীদা-বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির সূচনা হয়। জঙ্গে সিফফীনের সময়ে আব্দুল্লাহ ইব্‌নে সাবা ও তার অনুসারীগণ তখনকার বিশেষ পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে হযরত আলী (রাঃ)-এর বাহিনীতে তাঁর সম্পর্কে গোমরাহী মূলক প্রচার শুরু করে। ইব্‌নে সাবা কিছু সংখ্যক মূর্খ ও সরলপ্রাণ লোককে এই সবক দেয় যে, হযরত আলী এ পৃথিবীতে খোদার রূপ।[১] তাঁর দেহে খোদায়ী আত্মা রয়েছে এবং তিনিই খোদা। সে আরও বলে, "মূলতঃ আল্লাহ নবুওয়াত ও রেসালাতের জন্য আলীকে মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু ওহী বাহক ফেরেশ্‌তা জিবরাঈল ভুল বশতঃ ওহী নিয়ে মুহাম্মাদ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে গেলেন।" নাউযুবিল্লাহ। এভাবেই শী'আদের মধ্যে আকীদাগত বিভ্রান্তির সূত্রপাত ঘটতে আরম্ভ করে, পরবর্তিতে যার আরও বিস্তৃতি ঘটে। পরবর্তিতে বিভিন্ন আকীদাগত বিষয়ে তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধও দেখা দেয়, যার ফলে শী'আদের মধ্যে সৃষ্টি হয় নানান দল উপদল।

শী'আদের দল-উপদল সমূহ ঃ

শী'আদের প্রথমতঃ তিনটি দল।

১. তাফযীলিয়া (تفضيليه) শী'আ। এরা হযরত আলী (রাঃ)কে শায়খাইনের উপর ফযীলত দিয়ে থাকেন।

২. সাবইয়্যা (سبئيه) শী'আ। এদেরকে "তাব্‌রিয়া"ও (تبريه) বলা হয়। এরা হযরত সালমান ফারসী, আবূ জর গিফারী, মেকদাদ ও আম্মার ইব্‌নে ইয়াছির প্রমুখ অল্প সংখ্যক সাহাবী ব্যতীত অন্য সকল সাহাবী থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে, এমনকি তাঁদেরকে মুনাফিক এবং কাফের পর্যন্ত বলে।[২]

৩. গুলাত (غلاة) বা চরমপন্থী শী'আ। এদের কতক হযরত আলী (রাঃ)-এর খোদা হওয়ার প্রবক্তা ছিল। আর কতক মনে করত খোদা তাঁর মধ্যে প্রবেশ (حلول) করেছেন অর্থাৎ, তিনি ছিলেন খোদার অবতার বা প্রকাশ।

---

১. কুচক্রি সেন্ট পলও খৃষ্টানদের মধ্যে হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে এরূপ আকীদার শিক্ষা দিয়েছিল। বংশগতভাবে সেও ছিল ইয়াহুদী। তার ইয়াহুদী নাম ছিল "সাউল"। ايرانى انقلاب. منظور نعمانى ॥

২. কিতাবুর রওযায় ইমাম বাকের থেকে রেওয়ায়েত আছে-

قال كان الناس اهل ردة بعد النبى صلى الله عليه الا الثلثة فقلت ومن الثلاثة فقال المقداد بن الاسود وابوذر الغفارى وسلمان الفارسى رحمة الله عليهم وبركته -

তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর তিনজন বাদে সকলেই মুরতাদ হয়ে যায়। (রাবী বলেনঃ) আমি আরয করলাম ঃ সেই তিনজন কে ? ইমাম বললেন ঃ মেকদাদ ইবনুল আসওয়াদ, আবূ যর গেফারী ও সালমান ফারসী। তাঁদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত নাযিল হোক। ॥

গুলাত (غلاة) বা চরমপন্থী শী'আদের ২৪ টি উপদল ছিল। যাদের একটি দল ছিল ইমামিআ (امامیہ)। এই ইমামিয়া ছিল শী'আদের একটি বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ট দল। সাবইয়্যাদের ছিল ৩৯ টি উপদল।[১] ইমামিয়া দলের মধ্যে প্রধান ও প্রসিদ্ধ হল ৩টি উপদল। যথা ঃ

১. ইছনা আশারিয়া (اثناعشریہ)।
২. ইসমাঈলিয়া (اسماعیلیہ)।
৩. যায়দিয়া (زیدیہ)।

ইছনা আশারিয়া
(اثناعشریہ)

শী'আদের উপরোক্ত ৩ টি উপদলের মধ্যে "ইছনা আশারিয়া"(বার ইমামপন্থী) শী'আদের অস্তিত্বই প্রবল। এদেরকে"ইমামিয়া"ও বলা হয়। বর্তমানে "ইছনা আশারিয়া" এবং "ইমামিয়া" নাম দুটো প্রায় সমার্থবোধকে পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে সাধারণভাবে শী'আ বলতে এই "ইছনা আশারিয়া" বা "ইমামিয়া" শী'আদেরকে বোঝানো হয়ে থাকে। তাদেরকেই শী'আ বলা হয়। শী'আদের মধ্যে সবচেয়ে এদের সংখ্যাই অধিক। উপমহাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র তাদের অনুসারী রয়েছে। বর্তমান ইরানে তারাই ক্ষমতাসীন।[২] ইরাকেও প্রচুর সংখ্যক এরূপ শী'আ রয়েছে। নিম্নে তাদের বিশেষ কিছু আকীদা-বিশ্বাসের উল্লেখ করা হল।[৩]

---

১. শী'আদের এসব দল ও তাদের তাফসীলী আকায়েদ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য مختصر التحفة الاثنا عشرية/التحفة الاثنا عشرية. عبد العزيز الدهلوى দেখা যেতে পারে ॥

২. আমরা অত্র গ্রন্থে ইছনা আশারিয়াদের যেসব আকীদা-বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করেছি, বর্তমান ইরানের শী'আগণ সে-ই ইছনা আশারিয়া এবং তারা সেসব আকীদাই পোষণ করে থাকেন। তারা যে এই ইছনা আশারিয়া এবং তাদের আকীদা- বিশ্বাসও যে এগুলো, তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ হল রুহুল্লাহ খোমেনী-র লিখিত বই-পত্র। উল্লেখ্য ঃ রুহুল্লাহ খোমেনী সাহেব একাধারে ইছনা আশারিয়া পন্থী আলেম ও ইরানের বর্তমান শীআদের সর্বজনমান্য ধর্মীয় নেতা ও গ্রন্থকার। তিনি "الحكومة الاسلامية" ও "كشف الاسرار" গ্রন্থদ্বয়ে ইছনা আশারিয়া শী'আদের প্রসিদ্ধ আকীদা তথা ইমামত, সাহাবা বিদ্বেষ ও কুরআন বিকৃতি বিষয়ে হুবহু সেই আকীদা-বিশ্বাস তুলে ধরেছেন যেগুলোতে ইছনা আশারিয়াদের আকীদা-বিশ্বাস হিসেবে আমরা অত্র গ্রন্থে তুলে ধরেছি। সংক্ষিপ্তভাবে এর প্রমাণের জন্য মাওলানা মানযূর নোমানী রচিত 'ইরানী ইনকিলাব' গ্রন্থখানা দেখা যেতে পারে ॥

৩.তাদের অধিকাংশ আকীদা উল্লেখ করা হয়েছে ابو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكلينى الرازى . المتوفى ٣٢٨/٣٢٩ھ রচিত اصول كافى থেকে। এ কিতাবটি শী'আদের নিকট প্রায় সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য। আমার নিকট ছিল এ কিতাবের از انتشارات كتاب فروشى علميه اسلاميه. طهران خيابان ناصر خسرو -এর নুসখা। আরও ছিল كشف الاسرار -এর از انتشارات در ستكار كتابهاى مذهبى كلى وجزئى ناصر خسرو تهران، ايران নুসখা। কিছু আকীদা অন্যান্য শী'আ মনীষী যেমন মজলিসী প্রমুখের কিতাব থেকেও নেয়া হয়েছে। এগুলির বরাত মাওলানা মানযূর নো'মানী রচিত "ইরানী ইনকিলাব" থেকে নেয়া হয়েছে ॥

বার ইমামপন্থী শী'আদের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস ঃ

"ইছনা আশারিয়া" বা বার ইমামপন্থী শী'আদের সাথে আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বহু বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান হল তিনটি। যথা ঃ

১. ইমামত সংক্রান্ত আকীদা ঃ

ইমামত সংক্রান্ত আকীদা (عقيدة امامت)-এর অর্থ হল আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের হেদায়েত ও পথ প্রদর্শন এবং নেতৃত্বের জন্যে যেমন তাঁর পক্ষ থেকে রাসূলগণকে মনোনীত করে এসেছেন। তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর থেকে বান্দার পথ প্রদর্শন ও নেতৃত্বের জন্যে ইমাম মনোনীত করা শুরু করেন। কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে তিনি এরূপ ইমাম মনোনীত করেছেন। ইছনা আশারিয়াদের মতে আল্লাহ তা'আলা এরূপ বারজন ইমাম মনোনীত করেছেন। দ্বাদশতম ইমামের উপর পৃথিবীর লয় ও কিয়ামত হবে। এই বারজন ইমাম হলেন ঃ

১. ইমাম হযরত আলী মুর্তযা (রাঃ)। এরপর হযরত আলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র
২. হাসান ইব্‌নে আলী (রাঃ)। তাঁরপর তাঁর ছোটভাই
৩. হযরত হুসাইন ইব্‌নে আলী (রাঃ)। এরপর তার পুত্র
৪. আলী ইবনে হুসাইন ওরফে জয়নুল আবেদীন। এরপর তার পুত্র
৫. মোহাম্মাদ ইবনে আলী ওরফে ইমাম বাকের। এরপর তার পুত্র
৬. জা'ফর ছাদেক ইব্‌নে বাকের। এরপর তার পুত্র
৭. মূসা কাযেম ইব্‌নে জা'ফর ছাদেক। এরপর তার পুত্র
৮. আলী রেযা ইব্‌নে মূসা কাযেম। এরপর তার পুত্র
৯. মোহাম্মাদ তাকী ইব্‌নে আলী রেযা ওরফে জাওয়াদ। এরপর তার পুত্র
১০. আলী নাকী ইব্‌নে মুহাম্মাদ তাকী ওরফে হাদী। এরপর তার পুত্র
১১. হাসান আসকারী ইব্‌নে আলী নাকী ওরফে যাকী। এরপর তার পুত্র দ্বাদশতম ও সর্বশেষ ইমাম।
১২. মোহাম্মদ আল্‌-মাহ্‌দী আল-মুন্‌তাজার ইব্‌নে হাসান আস্‌কারী। (অন্তর্হিত ইমাম মেহদী), যিনি শী'আ আকীদা অনুযায়ী এখন থেকে প্রায় সাড়ে এগার শত বছর পূর্বে ২৫৫ অথবা ২৫৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করে চার অথবা পাঁচ বছর বয়সে অলৌকিকভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যান এবং এখন পর্যন্ত একটি গুহায়[১] আত্মগোপন করে আছেন। তাঁর উপর ইমামত শেষ হয়ে গেছে। শেষ যমানায় তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটবে।[২]

---

১. গুহাটি "সুর্‌রা মান রাআ" (سر من راى) নামক শহরে অবস্থিত ॥

২. ইমামিয়া ইছনা আশারিয়া শী'আদের ধারণায় দ্বাদশতম ইমাম (মাহ্‌দী মুন্‌তাজার)-ই শেষ যমানার ইমাম (অন্তর্হিত ইমাম)। তার আত্মপ্রকাশ কবে হবে ? এ সম্পর্কে তাদের নিষ্পাপ ইমামগণের উক্তি নিম্নরূপ ঃ

"ইহ্‌তিজাজে তবরিযীতে" উল্লেখিত নবম ইমাম মোহাম্মাদ ইব্‌নে আলী ইব্‌নে মূসার একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে। তিনি "আল-কায়েম" (অন্তর্হিত ইমাম) সম্পর্কে বলেন ঃ পরবর্তী পৃষ্ঠায় টীকা দ্রষ্টব্য

ইমামদের সম্বন্ধে শী'আদের আকীদা-বিশ্বাস ঃ

(এক) ইমামগণের গর্ভ ও জন্ম হয় অদ্ভুত প্রক্রিয়ায়।

শী'আগণ ইমামগণের গর্ভ ও জন্ম সম্পর্কে অদ্ভুত বিশ্বাস রাখেন। এ ব্যাপারে উছূলে কাফীতে[১] উল্লেখিত একটি সুদীর্ঘ রেওয়ায়েতের সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ

ইমাম জাফর ছাদেকের বিশেষ মুরীদ আবূ বছীর বর্ণনা করেন ঃ যে দিন ইমাম সাহেবের পুত্র ইমাম মূসা কাযেম জন্মগ্রহণ করেন (যিনি সপ্তম ইমাম), সেদিন তিনি বর্ণনা করলেন যে, প্রত্যেক ইমামের জন্ম এমনিভাবে হয়- যে রাত্রিতে মায়ের গর্ভে তার গর্ভসঞ্চার আল্লাহর পক্ষ থেকে অবধারিত থাকে, সে রাত্রিতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এক আগন্তুক (ফেরেশতা) অত্যন্ত সুস্বাদু শরবতের একটি গ্লাস নিয়ে তাঁর পিতার কাছে আসেন এবং তা তাকে পান করিয়ে দেন। এরপর আগন্তুক বলেন ঃ এখন আপনি স্ত্রীর সাথে সহবাস করুন। সহবাসের পর ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণকারী ইমামের গর্ভ মায়ের জরায়ূতে স্থির হয়ে যায়। এ স্থলে ইমাম জাফর ছাদেক সবিস্তারে বর্ণনা করলেনঃ আমার প্রপিতামহ (ইমাম হুসাইন)-এর সাথে তাই হয়েছে এবং এর ফলশ্রুতিতে আমার পিতামহ ইমাম জয়নুল আবেদীন জন্মগ্রহণ করেন। এরপর তার সাথেও তাই হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে আমর পিতা ইমাম বাকের জন্মগ্রহণ করেন। এরপর তার সাথেও সম্পূর্ণ এমনি ধরনের ঘটনা ঘটে এবং আমার জন্ম হয়। তারপর আমার সাথেও এরূপ ঘটে, অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এক আগন্তুক (ফেরেশতা) অত্যন্ত সুস্বাদু ও উৎকৃষ্ট শরবতের গ্লাস নিয়ে আমার কাছে আসে এবং আমাকে স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে বলে। আমি সহবাস করলে এ পুত্রের গর্ভ স্থিতি লাভ করে। এ রেওয়ায়েতে আরও আছে যে, ইমাম যখন মায়ের গর্ভ থেকে বাইরে আসে, তখন তার হাত মাটিতে এবং মস্তক আকাশের দিকে উঠানো থাকে।[২] ইমামগণের গর্ভ মায়ের জরায়ূতে নয়-পার্শ্বে কায়েম হয় এবং তারা মেয়েদের উরু দিয়ে ভূমিষ্ট হন ঃ

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা ..... هو الذى يخفى على الناس ولادته ويغيب عنهم شخصه يجتمع اليه من اصحابه عدة اهل بدر ثلاث مأة وثلاثة عشر رجلا من اقاصى الارض ..... فاذا اجتمعت له هذه العدة من اهل الاخلاص اظهر الله امره -

অর্থাৎ, তার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তার জন্ম হবে গোপনে। মানুষ টেরও পাবে না। তার ব্যক্তিত্ব মানুষের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য থাকবে। বিশ্বের প্রতি প্রান্ত থেকে বদর যোদ্ধাদের সংখ্যার অনুরূপ তার ৩১৩ জন অনুচর তার কাছে সমবেত হবে। যখন তিনশ' তেরজন খাঁটি লোক তার জন্যে সমবেত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার ব্যাপার প্রকাশ করবেন। (অর্থাৎ, তিনি গুহা থেকে বাইরে এসে আপন কাজ শুরু করবেন।)

মাওলানা মানযূর নো'মানী সাহেব বলেন, "এখানে একটি চিন্তার বিষয় হল - শেষ ইমামের এ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ না করাটা ইমাম মোহাম্মাদ ইব্‌নে আলী ইব্‌নে মূসার উক্তি অনুযায়ী এ বিষয়ের প্রমাণ যে, ২৬০ হিঃ থেকে এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে এগারশ' বছর সময়ের মধ্যে তার অকৃত্রিম সহচর ৩১৩ জন শী'আও কখনও হয়নি এবং আজও নেই। নতুবা তার আত্মপ্রকাশ কবে হয়ে যেত"। ॥

১. اصول كافى جـ/٢. صفحـ/٢٢٧-٢٢٦(مع اختصار) .٢ ॥باب مواليد الائمة عليهم السلام ॥

আল্লামা মাজলিসী "হাক্কুল এয়াকীন" গ্রন্থে[১] একাদশতম ইমাম- হাসান আসকারী থেকে আরও রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ আমাদের ইমামগণের গর্ভ জননীর পেটে অর্থাৎ, জরায়ূতে স্থিত হয় না; বরং পার্শ্বে থাকে এবং আমরা জরায়ূ থেকে বাইরে আসি না; বরং জননীর উরু থেকে জন্ম গ্রহণ করি। কেননা, আমরা আল্লাহ্ তা'আলার নূর। তাই আমাদেরকে নোংরামী, আবর্জনা ও নাপাকী থেকে দূরে রাখা হয়।

দুই) ইমামগণ নবীর ন্যায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মনোনীত হন।

শী'আদের বিশ্বাস হল-নবী যেমন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মনোনীত হন, তেমনি আমিরুল মু'মিনীন (আলী) থেকে নিয়ে বার জন ইমাম কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মনোনীত হয়েছেন। তাদের মনোনয়ন ও নিযুক্তি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়েছে; যেমন তিনি নবী ও রাসূলগণকে নিযুক্ত করেছেন। এতে কোন মানুষের মতামত ও ক্ষমতার দখল থাকে না। স্বয়ং ইমামেরও ক্ষমতা নেই যে, তিনি পরবর্তী ইমাম ও খলীফাভিষিক্ত নিযুক্ত করবেন ঃ

উছূলে কাফীতে আছে, ইমাম জাফর ছাদেক বলেনঃ

ان الامامة عهد من الله عزوجل معهود لرجال مسمين ليس للامام ان يزويها عن الذى يكون من بعده . الخ - (اصول كافى . جـ/٢. صفحـ/٢٦-٢٥)

অর্থাৎ, ইমামত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট লোকদের জন্যে একটি অঙ্গীকার! ইমামেরও অধিকার নেই যে, সে তার পরবর্তী সময়ের জন্যে মনোনীত ইমাম ছাড়া অন্যের কাছে ইমামত হস্তান্তর করবে।

উক্ত গ্রন্থে আরও আছে- ইমাম জাফর ছাদেক তার বিশেষ সহচরদেরকে এ মর্মে অনুরূপই বলেন ঃ

اترون الموصى منا يوصى الى من يريد ؟ لا والله ولكن عهد من الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم لرجل فرجل حتى ينتهى الامر الى صاحبه - (ايضا. صفحـ/٢٥)

আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ইমাম মনোনয়ন সম্পর্কিত বিষয় কিভাবে নবীকে জানানো হয় তার বর্ণনায় উছূলে কাফীতে প্রায় দুই পৃষ্ঠাব্যাপী একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে।[২] তার সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ

---

১. ১২৬ পৃঃ ইরানী মুদ্রণ ॥

২. ايضا. صفحـ/٣٠-٢٩ ॥

ইমাম জাফর ছাদেক বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পূর্বে তাঁর প্রতি জিবরাঈলের মাধ্যমে আকাশ থেকে ইমামত ও ইমামগণ সম্পর্কে নির্দেশনামা স্বর্ণের মোহ আঁটা কিতাবের আকারে নাযিল হয়েছিল। এতে প্রত্যেক ইমামের জন্যে আলাদা আলাদা মোহর আঁটা খাম ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেগুলো হযরত আলীর হাতে সমর্পন করেন। হযরত আলী কেবল নিজের নামের খামটির মোহর ভেঙ্গে তাঁর সম্পর্কিত নির্দেশনামা পাঠ করেন। এরপর প্রত্যেক ইমাম এমনিভাবে তার নামের মোহর আঁটা খাম পেয়েছেন এবং তিনিই নিজের খামের মোহর ভেঙ্গে তা পাঠ করতেন। এমনিভাবে সর্বশেষ খাম দ্বাদশ ইমাম মেহদী (অন্তর্হিত ইমাম) পাবেন।

আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বার ইমামের মনোনয়ন প্রসঙ্গে উছূলে কাফীতে[১] আকাশ থেকে একটি আশ্চর্যজনক ফলক অবতীর্ণ হওয়ার কিস্সাও বর্ণিত হয়েছে, যাতে আকাশ থেকে অবতীর্ণ সবুজ রঙ্গের একটি ফলকের অদ্ভুত কিস্সা বর্ণনা করা হয়েছে, যার উপর নূরানী অক্ষরে ক্রমিক অনুসারে বার ইমামের নাম, তাদের বিস্তারিত পরিচিতিসহ লিপিবদ্ধ ছিল। বর্ণনায় আছে ঃ ইমাম বাকের জাবের ইব্নে আবদুল্লাহ আনছারী (সাহাবী)কে বললেনঃ আপনার সাথে আমার একটি বিশেষ কাজ আছে। তাই একান্তে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই এবং একটি ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই। জাবের বললেন ঃ আপনি যখন ইচ্ছা করেন, আসতে পারেন। সেমতে একদিন তিনি তার কাছে গেলেন এবং বললেনঃ আমাকে সেই ফলক সম্পর্কে বলুন, যা আপনি আমাদের (পরদাদী) আম্মা হযরত ফাতেমা বিন্তে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতে দেখেছিলেন। এ ফলক সম্পর্কে তিনি আপনাকে যা বলেছিলেন এবং তাতে যা লেখা ছিল, তাও বলুন। জাবের ইব্নে আবদুল্লাহ বললেনঃ আমি আল্লাহ্কে সাক্ষী করে এ ঘটনা বর্ণনা করছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় আপনার (পরদাদী) আম্মা হযরত ফাতেমার কাছে তাঁর পুত্র হুসাইনের জন্ম উপলক্ষে মোবারকবাদ দিতে গিয়েছিলাম। আমি তার হাতে একটি সবুজ রঙ্গের ফলক দেখলাম। আমি ধারণা করলাম যে, সেটি পান্নার এবং তাতে সূর্যের ন্যায় চকচকে সাদা রঙ্গে কিছু লিখা রয়েছে। আমি তাকে বললামঃ হে রাসূল তনয়া, আমার পিতামাতা আপনার জন্যে উৎসর্গ হোক! আমাকে বলুন এ ফলকটি কি এবং কেমন ? তিনি বললেনঃ এ ফলক আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের কছে প্রেরণ করেছেন। এতে আমার আব্বাজান রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ), আমার স্বামী (আলী), আমার উভয় পুত্র (হাসান-হুসাইন) এবং আমার আওলাদের মধ্যে আরও যারা ইমাম হবে, তাদের সকলের নাম রয়েছে। আব্বাজান আমাকে সুসংবাদ দেয়ার জন্যে এই ফলক আমাকে দান করেছেন।

১. اصول كافى باب ماجاء فى الاثنى عشر والنص عليهم جـ/٢. صفحـ/٤٧١-٤٧٠ ॥

(তিন) শী'আদের বক্তব্য হল কুরআন মজীদে ইমামত ও ইমামগণের বর্ণনা ছিল ।

উছূলে কাফীতে আছে ঃ[১] আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার কছে যে আমানত পেশ করেছিলেন এবং যা বহন করতে তারা অস্বীকার করেছিল, সেটা ছিল ইমামত।

সূরা আহযাবের ৭২ নং আয়াত-

انا عرضنا الامانة على السموت والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ـ

(অর্থাৎ, আমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও পর্বতসমূহের কাছে এই আমানত[২] পেশ করেছিলাম, তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং তাতে শংকিত হল; কিন্তু মানুষ তা বহন করল। সেতো অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ।)

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে যে, বলেন,

هى الولاية لامير المؤمنين عليه السلام ـ (اصول كافى جـ/٢. صفحـ/٢٧٧)

অর্থাৎ, আয়াতে "আমানত" বলে হযরত আলী মুর্তযার ইমামত বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আলীর ইমামতের বিষয়টি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে পেশ করেছিলেন এবং তাদেরকে তা কবূল করতে বলেছিলেন। কিন্তু আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা আমিরুল মু'মিনীনের ইমামতের বিষয়টি কবূল করার মহাদায়িত্ব বহন করার সাহস করতে পারল না এবং তারা ভীত হয়ে অস্বীকার করল।

এসব রেওয়ায়েতের উপরই শী'আদের মৌলিক বিষয়-ইমামতের ভিত্তি স্থাপিত।

সূরা শু'আরার শেষ রুকূর ১৯৩-১৯৪ নং আয়াত ঃ

نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربى مبين ـ

(অর্থাৎ, রুহুল আমীন অর্থাৎ, জিবরাঈল এ কুরআন নিয়ে -যা সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় রয়েছে- (হে রাসূল) আপনার অন্তরে অবতীর্ণ হয়েছে [অর্থাৎ, আপনার অন্তর পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে], যাতে আপনি (কুপরিণাম সম্পর্কে) সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।)

১. اصول كافى باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية جـ/٢ . এ অধ্যায়ে ইমামগণের সেইসব রেওয়ায়েত ও বাণী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যেগুলোতে ইমামত ও ইমামগণের শান সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার অবতীর্ণ কিতাব -কুরআন মাজীদের তথ্যাবলী বর্ণিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে এতদসম্পর্কিত প্রায় একশ' রেওয়ায়েত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ॥

২."আমানত" হল ঈমান ও হিদায়াত কবূল করার স্বাভাবিক ক্ষমতা। অন্য মতে আল্লাহ্র আদেশ নিষেধসমূহ ॥

কিন্তু উছূলে কাফীতে ইমাম বাকের থেকে রেওয়ায়েত আছে যে, তিনি এ আয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ জিবরাঈল যে বিষয় নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অন্তরে নাযিল হয়েছিল তা ছিল আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলীর ইমামত।[১] এর অর্থ হল- এ আয়াতটি কুরআন মাজীদের সাথে নয়; বরং ইমামতের সাথে সম্পৃক্ত।

সূরা মায়েদার নবম রুকূর ৬৬ আয়াত ঃ

ولوانهم اقاموا التورة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم -

এ আয়াতে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যদি তারা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং সেই সর্বশেষ ওহী কুরআন মাজীদের উপর- যা তাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে তাদের জন্য নাযিল করা হয়েছে- ঠিকঠিক আমল করত, তবে তাদের প্রতি আল্লাহ্র বিশেষ রহমত ও বরকত নাযিল হত। কিন্তু উছূলে কাফীতে ইমাম বাকের থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ আয়াতের তাফসীরেও الولاية বলেছেন।[২] উদ্দেশ্য এই যে, ما انزل اليهم من ربهم এর অর্থ (مصداق) কোরআন মাজীদ নয়; বরংইমামত।

(চার) ইমামগণ পয়গম্বরগণের মতই আল্লাহ্র প্রমাণ, নিষ্পাপ ও আনুগত্যশীল।

উছূলে কাফীতে সনদ সহকারে ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে- তিনি বলেন ঃ

ان الحجة لا تقوم لله عزوجل على خلقه الا بامام حتى يعرف - (اصول كافى جـ/١. صفحـ/٢٥٠)

অর্থাৎ, সৃষ্টিজীবের উপর আল্লাহ্ তা'আলার প্রমাণ- ইমাম ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হয় না, যাতে তার মাধ্যমে (আল্লাহ্র এবং তাঁর ধর্মে) মারেফত অর্জিত হয়।

(পাঁচ) ইমামগণ পয়গম্বরগণের মত নিষ্পাপ ঃ

উছূলে কাফীতে এক শিরোনাম আছে- باب نادر جامع فى فضل الامام وصفاته - এতে অষ্টম ইমাম ইব্নে মূসা রেযার একটি দীর্ঘ খুতবা রয়েছে, যাতে ইমামগণের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বারবার তাদের নিষ্পাপতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

الامام المطهر من الذنوب والمبرأ من العيوب - (اصول كافى جـ/١. صفحـ/ ٢٨٧)

এরপর এ খুতবায় ইমাম সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে ঃ

فهو معصوم موید موفق مسدد قد امن من الخطاء والزلل والعثار، يخصه الله بذلك ليكون حجة على عباده وشاهده على خلقه - (اصول كافى جـ/١. صفحـ/٢٩٠)

১ ॥ اصول كافى جـ/٢. صفحـ/٢٧٧.

২ ॥ ايضا. صفحـ/٢٧٨.

অর্থাৎ, তিনি নিষ্পাপ। আল্লাহ তা'আলার বিশেষ সমর্থন ও তাওফীক তাঁর সাথে থাকে। আল্লাহ তাঁকে সোজা রাখেন। তিনি ভুলত্রুটি ও পদস্খলন থেকে হেফাযত থাকেন। আল্লাহ এসব নেয়ামত দ্বারা তাঁকে খাছ করেন, যাতে তিনি তাঁর বান্দাদের উপর তাঁর প্রমাণ হন এবং তাঁর সৃষ্টির উপর সাক্ষী হন।

(ছয়) ইমামগণের মর্তবা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সমান এবং অন্য সকল পয়গম্বরের উর্ধ্বে ঃ

উছূলে কাফীতে আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী মুর্তযা ও তাঁর পরবর্তী ইমামগণের ফযীলত ও মর্তবার বর্ণনায় ইমাম জাফর ছাদেকের একটি দীর্ঘ বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। তার প্রাথমিক অংশ নিম্নরূপ-

ما جاء به علىّ اخذُ به وما نهى عنه انتهى عنه جرى له من الفضل مثل ماجرى لمحمد ولمحمد الفضل على جميع خلق الله عزوجل المتعقب عليه فى شئى من احكامه كالمتعقب على الله وعلى رسوله والراد عليه فى صغيرة او كبيرة على حد الشرك بالله كان امير المؤمنين باب الله الذى لايؤتى الامنه و سبيله الذى من سلك بغيره يهلك وكذلك جرى لائمة الهدى واحد بعد واحد -

অর্থাৎ, আলী যে সকল বিধান এনেছেন, আমি তা মেনে চলি। আর যে কাজ তিনি নিষেধ করেছেন, আমি তা করি না। তার ফযীলত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর অনুরূপ। আর মুহাম্মাদ সকল মাখলূকের উপর ফযীলত রাখেন। আলীর কোন আদেশে আপত্তিকারী রাসূলের আদেশে আপত্তিকারীর মত। কোন ছোট অথবা বড় বিষয়ে তার খণ্ডনকারী আল্লাহ্র সাথে শির্ক করার পর্যায়ে থাকে। আমিরুল মু'মিনীন আল্লাহ্র এমন দরজা ছিলেন যে, এ দরজা ছাড়া অন্য কোন দরজা দিয়ে আল্লাহ্র কাছে যাওয়া যায় না এবং তিনি আল্লাহ্র এমন পথ ছিলেন যে, কেউ অন্য পথে চললে ধ্বংস হয়ে যাবে। এমনি ভাবে ইমামগণের একের পর একের জন্য ফযীলত অব্যাহত রয়েছে। অর্থাৎ, সকলের এই মর্তবা।

আল্লামা বাকের মজলিসী তার "হায়াতুল কুলূব" গ্রন্থে লিখেন ঃ ইমামতের মর্তবা নবুওয়াত ও পয়গম্বরীর উর্ধ্বে। (৩য় খণ্ড, ১০ পৃঃ)

(সাত) ইমামগণ যা ইচ্ছা হালাল অথবা হারাম করার ক্ষমতা রাখেন ঃ

উছূলে কাফীতে মুহাম্মাদ ইবনে সিনান থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে তিনি বলেনঃ আমি আবূ জা'ফর ছানী (মুহাম্মাদ ইব্নে আলী তাকী)কে হালাল ও হারাম সম্পর্কে শী'আদের পারস্পরিক মতভেদের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ

يا محمد ان الله تبارک وتعالى لم يزل منفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا و فاطمة فمكثوا الف دهر ثم خلق جميع الاشياء فاشهدهم خلقها واجرى طاعتهم عليها و فوض امورها اليهم فهم يحلون ما يشائون ويحرمون مايشائون ولن يشاء وا الا ان يشاء الله تبارک وتعالى - (اصول كافى جـ/٢. صفحـ/٣٢٦)

অর্থাৎ হে মোহাম্মাদ, আল্লাহ্ তা'আলা অনাদিকাল থেকে আপন একক সত্তায় ভূষিত ছিলেন। অতঃপর তিনি মুহাম্মাদ, আলী ও ফাতেমাকে সৃষ্টি করেন। এরপর তাঁরা হাজারো শতাব্দী অবস্থান করলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার সকল বস্তু সৃষ্টি করেন এবং তাঁদের সৃষ্টির উপর তাঁদেরকে সাক্ষী করলেন। তাঁদের আনুগত্য সকল সৃষ্টির উপর ফরয করলেন এবং সৃষ্টির সকল ব্যাপারাদি তাদের হাতে সোপর্দ করলেন। কাজেই তাঁরা যা ইচ্ছা হালাল করেন এবং যা ইচ্ছা হারাম করেন। তবে তাঁরা তা-ই ইচ্ছা করেন, যা আল্লাহ ইচ্ছা করেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আল্লামা কাযভীনী এ রেওয়ায়েতের ব্যাখ্যায় বলেন-এখানে মুহাম্মাদ, আলী ও ফাতেমা বলে তাঁদের তিন জন এবং তাঁদের বংশের সকল ইমামকে বুঝানো হয়েছে।

মোটকথা, ইমাম আবূ জা'ফর ছানীর (যিনি নবম ইমাম) জওয়াবের সারকথা হল ইমামগণকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তারা যে কোন বস্তুকে হালাল অথবা হারাম করতে পারবেন। তাই এ ক্ষমতার অধীনে কোন বস্তুকে অথবা কোন কাজকে এক ইমাম হালাল করেছেন এবং অন্য ইমাম হারাম করেছেন। ফলে আমাদের শী'আদের মধ্যে হালাল-হারামের মতভেদ সৃষ্টি হয়ে গেছে।

(আট) ইমাম ব্যতীত দুনিয়া কায়েম থাকতে পারে না ।

উছূলে কাফীতে সনদ সহকারে বর্ণিত আছে-

عن ابى حمزة قال لابى عبد الله أتبقى الارض بغير امام ؟ قال لو بقيت الارض بغير امام لساخت -

অর্থাৎ, আবূ হামযা থেকে বর্ণিত আছে- আমি ইমাম জা'ফর ছাদেককে জিজ্ঞেস করলাম, এ পৃথিবী ইমাম ব্যতীত কায়েম থাকতে পারে কি? তিনি বললেনঃ যদি পৃথিবী ইমাম ব্যতীত কায়েম (বাকী) থাকে, তবে ধ্বসে যাবে (কায়েম থাকতে পারবে না)।[১]

আরও বর্ণিত আছে - জা'ফর ছাদেক বলেন ঃ

لوان الامام رفع من الارض ساعة لماجت باهلها كما يموج البحر باهله - (اصول كافى . جـ/١. صفحـ/٢٥٣)

॥ اصول كافى باب ان الارض لاتخلو من حجة . جـ/١. صفحـ/٢٥٢.١

অর্থাৎ, যদি ইমামকে এক মুহূর্তের জন্যেও পৃথিবী থেকে তুলে নেয়া হয়, তাহলে পৃথিবী তার অধিবাসীদের নিয়ে এমন উদ্বেলিত হবে, যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ তার অধিবাসীদের নিয়ে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

(নয়) ইমামগণের অতীত ও ভবিষ্যতের জ্ঞান অর্জিত ছিল।

শীআদের মতে তাদের ইমামগণ হযরত মূসা (আঃ)-এর ন্যায় উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পয়গম্বরেরও উর্ধ্বে ছিলেন ঃ উছূলে কাফীর এক অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে-

ان الائمة عليهم السلام يعلمون ما كان وما يكون وانه لايخفى عليهم شئ صلوات الله عليهم -

এ অধ্যায়ের প্রথম রেওয়ায়েত হল, ইমাম জা'ফর ছাদেক তার বিশেষ অন্তরঙ্গ সহচরদের এক মজলিসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে হযরত মূসা ও খিযিরের চেয়ে বেশী জ্ঞান রাখার কথা ব্যক্ত করেন এবং বলেন মূসা ও খিযিরের অতীতের জ্ঞান ছিল কিন্তু আমাদের ইমামগণের কিয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যতের জ্ঞানও ছিল। রেওয়ায়েতের আরবী ইবারত নিম্নরূপ ঃ

لوكنت بين موسى والخضر لاخبرتهما انى اعلم منهما ولانبأتهما ما ليس فى ايديهما لان موسى والخضر عليهما السلام اعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة وقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه واله وراثة - (اصول كافى جـ/١. صفحـ/٣٨٨)

(দশ) ইমামগণের জন্যে কুরআন-হাদীছ ছাড়াও জ্ঞানের অন্যান্য অত্যাশ্চর্য সূত্র রয়েছে।

উছূলে কাফীর باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليها السلام - নামক অধ্যায়ে বর্ণিত সুদীর্ঘ প্রথম রেওয়ায়েতটির সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

আবূ বছীর[১] বর্ণনা করেন- আমি একদিন ইমাম জা'ফর ছাদেকের খেদমতে হাজির হয়ে আরয করলামঃ আমি একটি বিশেষ কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। এখানে ভিন্ন মতাবলম্বী কেউ নেই তো ? ইমাম সাহেব এ গৃহ ও অন্য গৃহের মাঝখানে ঝুলানো একটি পর্দা তুলে ভিতরে দেখে বললেন ঃ এখন এখানে কেউ নেই। যা মনে চায় জিজ্ঞেস করতে পার। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম (প্রশ্নটি হযরত আলী মুর্তযা ও ইমামগণের ইল্ম সম্পর্কে ছিল।) ইমাম জাফর ছাদেক এ প্রশ্নের বিস্তারিত জওয়াব দিলেন। তার শেষাংশ এইঃ-

১. শী'আ রেওয়ায়েত অনুযায়ী আবূ বছীর ইমাম জা'ফর ছাদেকের বিশেষ অন্তরঙ্গ শী'আ মুরীদ। ॥

وان عند نا الجفر وما يدريهم ما الجفر؟ قال وعاء من ادم فيه علم النبيين والوصين وعلم العلماء الذين مضوا من بنى اسرائيل -

অর্থাৎ, আমাদের কাছে "আল-জাফ্‌র" রয়েছে। মানুষ জানে না "আল-জাফ্‌র" কি ? আমি আরয করলাম ঃ আমাকে বলুন আল-জাফ্‌র কি ? ইমাম বললেনঃ এটা চামড়ার একটা থলে। এতে সকল নবী ও ওছীর ইল্‌ম রয়েছে। বনী ইসরাঈলের মধ্যে যত আলেম পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছেন, তাদের ইল্‌মও এতে রয়েছে। (ফলে এটা সকল অতীত নবী, ওছী ও ইসরাঈলী আলেমগণের ইল্‌মের ভাণ্ডার।[১] তারপর বললেন ঃ

ثم قال وان عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة؟ قال قلت : وما مصحف فاطمة ؟ قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات والله مافيه من قرانكم حرف واحد - (اصول كافى جـ١. صفحه/٣٤٦-٣٤٥)

অর্থাৎ, আমাদের কাছে "মাসহাফে ফাতেমা"[২] রয়েছে। মানুষ জানে না মাসহাফে ফাতেমা কি ? ইমাম বললেনঃ এটা তোমাদের এই কুরআনের চেয়ে তিনগুণ বড়। আল্লাহর কসম, এতে তোমাদের কুরআনের একটি অক্ষরও নেই।

১.রেওয়ায়েতের এ অংশ দ্বারা শী'আ মাযহাবের পূর্ণ স্বরূপ বুঝা যেতে পারে। ইমাম জা'ফর ছাদেক ইমাম বাকের প্রমুখ ইমামগণ থেকে শী'আ মাযহাবের শিক্ষা রেওয়ায়েতকারী আবূ বছীর ও যুরারা প্রমুখরা নিজেকে ইমাম জা'ফর ছাদেক ও ইমাম বাকেরের বিশেষ অন্তরঙ্গ বলে ব্যক্ত করতেন। তারা তাদের সম্প্রদায়ের বিশেষ লোকদেরকে বলতেনঃ এই ইমামগণ আমাদেরকে শী'আ মাযহাবের কথাবার্তা গোপনীয়তা সহকারে একান্তে বলতেন। এভাবে তারা যা চাইতেন, তাই এই ইমামগণের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে বলতে পারতেন। তারা তাই করেছেন। আমাদের এবং উম্মতে মোহাম্মাদীর অধিকাংশের মতে এই ইমামগণ আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং উচ্চস্তরের আলেম ও পরহেযগার ছিলেন। তাঁদের যাহের ও বাতেন এক ছিল। তাঁরা সকলকে প্রকাশ্যে ধর্ম শিক্ষা দিতেন। তাঁদের জীবনে নিফাকের নামগন্ধও ছিল না, যার নাম শী'আরা "তাকিয়্যাহ" রেখেছে। ইরানী ইনকিলাব ॥

২. মাসহাফে ফাতেমা সম্পর্কে ইমাম জা'ফর ছাদেকেরই বিস্তারিত বর্ণনা উছূলে কাফীর এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে উল্লেখিত হয়েছে। মাসহাফে ফাতেমা সম্পর্কে এক প্রশ্নের জওয়াবে ইমাম জা'ফর ছাদেক বলেনঃ -

ان الله لما قبض نبيه ﷺ دخل على فاطمة من وفاته من الحزن ما لايعلمه الا الله عزوجل فارسل الله اليها ملكا يسلى غمها ويحدثها فشكت ذلك الى امير المؤمنين عليه السلام فقال اذا حسست بذالك وسمعت الصوت قولى لى فاعلمته بذلك فجعل امير المؤمنين عليه السلام يكتب كاما سمع حتى اثبت من ذلك مصحفا - (اصول كافى جـ١. صفحه/ ٣٤٧-٣٤٦)

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর নবী (সাঃ) কে দুনিয়া থেকে তুলে নেন, তখন ফাতেমার এত দুঃখ হলো, যা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। তখন আল্লাহ এক ফেরেশতাকে তার কাছে (পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

কুরআন-হাদীছ ছাড়াও ইমামগণের নিকট জ্ঞানের অন্যান্য অত্যাশ্চর্য সূত্র রয়েছে বলে শী'আদের যে, দাবী এ পর্যায়ে তারা এও বলেন যে, পরবর্তী পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ সকল গ্রন্থ- তাওরাত, ইঞ্জীল, যবূর ইত্যাদি ইমামগণের কাছে থাকে এবং তারা এগুলো মূল ভাষায় পাঠ করেন।

উছূলে কাফীর একটি শিরোনাম হচ্ছে-[১]

ان الائمة عند هم جميع الكتب التى نزلت من عند الله عزوجل وانهم يعرفونها على اختلاف السنتها - (اصول كافى جـ١. صفحه/٣٢٩)

এ অধ্যায়ে এ বিষয়বস্তুর রেওয়ায়েত এবং ইমাম জা'ফর ছাদেক ও তার পুত্র মূসা কাযেমের এ সম্পর্কিত ঘটনাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। এর পূর্ববর্তী অধ্যায়েও এ বিষয়বস্তুর রেওয়ায়েত রয়েছে। উদাহরণতঃ এক রেওয়ায়েতে আছে যে, ইমাম জা'ফর ছাদেক বলেনঃ

وان عندنا علم التوراة والانجيل والزبور وتبيان ما فى الالواح - (اصول كافى جـ١. صفحه/٣٢٦)

অর্থাৎ,"আমাদের কাছে তাওরাত, ইঞ্জীল ও যবূরের ইল্‌ম আছে এবং আলওয়াহে যা ছিল, তার সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে। "অন্য এক অধ্যায়ে জা'ফর ছাদেকেরই এই উক্তি বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমাদের কাছে "আল-জাফরুল আবইয়াম" আছে। এটা কি, প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন ঃ

الواح موسى عندنا - (اصول كافى جـ١. صفحه/٣٣٥)

অর্থাৎ, মূসার আল্‌ওয়াহ বা ফলকগুলো আমাদের নিকট রয়েছে।

(এগার) ইমামগণের এমন জ্ঞান আছে, যা ফেরেশতা ও নবীগণেরও নেই।

উছূলে কাফীতে[২] আছে-

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার অবশিষ্ট টীকা) পাঠালেন দুঃখে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে এবং তাঁর সাথে কথা বলার জন্যে। ফাতেমা আমীরুল মু'মিনীনকে একথা জানালে তিনি বললেনঃ যখন তুমি এই ফেরেশতার আগমন অনুভব কর এবং তার আওয়াজ শুন, তখন আমাকে বল। অতঃপর ফেরেশতা আগমন করলে ফাতেমা তাকে জানালেন। অতঃপর আমীরুল মু'মনীন ফেরেশতার কাছে যা শুনতেন, তা লিখতে লাগলেন। অবশেষে তিনি এর দ্বারা একটি মাসহাফ তৈরী করে নিলেন। (এটাই মাসহাফে ফাতেমা) ॥

১. শিরোনাম-এর অর্থ হচ্ছে - ইমামগণের পরবর্তী পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ সকল কিতাব রয়েছে। ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও তারা এগুলো পাঠ করেন এবং জানেন ॥

২. শিরোনাম ان الائمة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم خرجت الى الملائكة والانبياء والرسل عليهم السلام (ইমামগণ সেই সকল ইল্‌মের আলেম হন, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফেরেশতা, নবী ও রাসূলগণকে দান করা হয়।) ॥

عن ابی عبد الله السلام قال ان لله تبارک وتعالی علمین علما اظهر علیه ملائکة وانبیائه ورسله فما اظهر علیه ملائکته ورسله وانبیائه فقد علمناه وعلما استاثر به فاذا بدأ الله فی شئ منه اعلمنا ذلک وعرض علی الائمة الذین کانوامن قبلنا - (اصول کافی جـ/١. صفحـ/٣٧٥)

অর্থাৎ, ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলার দু'প্রকার ইল্‌ম আছে। এক প্রকার এলম সম্পর্কে তিনি ফেরেশতা, নবী ও রাসূলগণকে অবহিত করেছেন। অতএব এ সম্পর্কে আমরাও অবহিত হয়েছি। দ্বিতীয় প্রকার এল্‌ম তিনি নিজের জন্যে নির্দিষ্ট রেখেছেন। (অর্থাৎ, নবী, রাসূল ও ফেরেশতাগণকেও এ সম্পর্কে অবহিত করেননি।) আল্লাহ যখন এই বিশেষ ইল্‌মের কোন কিছু শুরু করেন, তখন আমাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন এবং আমাদের পূর্ববর্তী ইমামগণের সামনেও পেশ করেন।

(বার) প্রত্যেক জুমুআর রাত্রিতে ইমামগণের মে'রাজ হয়, তারা আরশ পর্যন্ত পৌঁছেন ।

প্রত্যেক জুমুআর রাত্রিতে ইমামগণের মে'রাজ হয়, তারা আরশ পর্যন্ত পৌঁছেন এবং সেখানে তারা অসংখ্য নতুন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা প্রাপ্ত হন। উছূলে কাফীতে ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন ঃ

ان لنا فی لیالی الجمعة لشانا من الشان ..... یوذن لارواح الانبیاء الموتی علیهم السلام وارواح الاوصیاء الموتی وروح الوصی الذی بین ظهرانیکم یعرج بها الی السماء حتی توافی عرش ربها فتطوف به اسبوعا وتصلی عند کل قائمة من قوائم العرش رکعتین ثم ترد الی الابدان التی کانت فیها فتصبح الانبیاء والاوصیاء قد ملئوا سرورا ویصبح الوصی الذی بین ظهرانیکم وقد زید فی علمه مثل الجم الغفیر - (اصول کافی جـ/١. صفحـ/ ٣٧٣-٣٧٢)

অর্থাৎ, আমাদের জন্যে জুমুআর রাত্রিগুলোতে এক মহান শান হয়ে থাকে। ওফাতপ্রাপ্ত পয়গম্বরগণের রূহ, ওফাতপ্রাপ্ত ওছীগণের রূহ এবং তোমাদের সামনে বিদ্যমান জীবিত ওছীর রূহকে অনুমতি দেয়া হয়। তাদেরকে আকাশে তুলে নেয়া হয়। এমনকি, তারা সকলেই খোদার আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যান। সেখানে পৌঁছে তাঁরা আরশকে সাতবার তাওয়াফ করেন। অতঃপর আরশের প্রত্যেক পায়ার কাছে দু'রাকআত নামায পড়েন। এরপর তাদের প্রত্যেক রূহকে সেই দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়, যেখানে পূর্বে ছিল। তাঁরা আনন্দে ভরপুর অবস্থায় সকাল করেন এবং তোমাদের মধ্যকার ওছীর এমন অবস্থা হয় যে, তার ইল্‌ম বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

(তের) ইমামগণের প্রতি প্রতিবছরের শবে কদরে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক কিতাব নাযিল হয়, যা ফেরেশতা ও "রূহ" নিয়ে আসেন ।

উছূলে কাফীতে ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি কুরআনের আয়াত ঃ

یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتب -

অর্থাৎ, আল্লাহ যা ইচ্ছা নিশ্চিহ্ন করেন এবং যা ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং তারই নিকট আছে কিতাবের মূল। (সূরাঃ ১৩-রা'দঃ ৩৯)

এর তাফসীর ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে,

وهل یمحی الا ما کان ثابتا وهل یثبت الا ما لم یکن -

অর্থাৎ, কিতাবের সেই বিষয় মিটানো হয়, যা পূর্বে বিদ্যমান ছিল এবং সেই বস্তুই প্রতিষ্ঠিত করা হয়, যা পূর্বে ছিল না।

এ কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা কাযভীনী লিখেন ঃ

برائی ہر سال کتاب علیحدہ است مراد کتاب است کہ دران تفسیر احکام حوادث کہ محتاج الیہ امام است تا سال دیگر نازل بان کتاب ملائکہ وروح در شب قدر برامام زمان -

অর্থাৎ, প্রতি বছরের জন্যে একটি আলাদা কিতাব থাকে। এর অর্থ সেই কিতাব যাতে পরবর্তী বছর পর্যন্ত সমসাময়িক ইমামের প্রয়োজনীয় বিধানাবলীর তাফসীর থাকে। এ কিতাব নিয়ে ফেরেশতারা এবং "আররূহ" শবে কদরে সমসাময়িক ইমামের প্রতি অবতীর্ণ হয়। (২২৯ পৃঃ) প্রকাশ থাকে যে, শী'আদের মতে, "আররূহ" অর্থ জিবরাঈল নন, বরং এটি এমন একটি মাখলূক যে জিবরাঈল ও সকল ফেরেশতা অপেক্ষা মহান। (ব্যাখ্যাগ্রন্থ আছ-ছাফীতে একথা পরিস্কার লিখা আছে)

উছূলে কাফীতেই ইমাম বাকের থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ রেওয়ায়েতে[১] আছে তিনি বলেন ঃ

ولقد قضی ان یکون فی کل سنة لیلة یهبط فیها بتفسیر الامور الی مثلها من السنة المقبلة - (اصول کافی جـ/١. صفحـ/٣٦٦)

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একথা স্থিরিকৃত যে, প্রতি বছর এক রাত্রে পরবর্তী বছরের এ রাত্রি পর্যন্ত সময়ের সকল ব্যাপারে ব্যাখ্যা ও তাফসীর নাযিল করা হবে।

(চৌদ্দ) ইমামগণ তাদের মৃত্যুর সময়ও জানেন এবং তাদের মৃত্যু তাদের ইচ্ছাধীন থাকে ।

উছূলে কাফীতে[২] আছে -

---

১. অধ্যায় باب فی شان انا انزلناه فی لیلة القدر وتفسیرها ॥

২. অধ্যায়ের শিরোনাম ان الائمة علیهم السلام یعلمون متی یموتون وانهم لا یموتون الا باختیار منهم (অর্থাৎ, ইমামগণ জানেন তাদের ওফাত কবে হবে এবং তাদের ওফাত তাদের ইচ্ছায় হয়।) ॥

عن ابی جعفر علیه السلام قال : انزل الله عزوجل النصر علی الحسین علیه السلام حتی کان [ما] بین السماء والارض ثم خیر: النصر او لقاء الله ، فاختار لقاء الله تعالی - (اصول کافی جـ/١. صفحـ/٣٨٧)

অর্থাৎ, ইমাম বাকের থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা (কারবলায়) হুসাইন (আঃ)-এর জন্য আকাশ থেকে সাহায্য (ফেরেশতাদের সৈন্যবাহিনী) প্রেরণ করেছিলেন, যা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে এসে পড়েছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা হুসাইন (আঃ)কে ক্ষমতা দিলেন যে, তিনি খোদার সাহায্য (আসমানী ফওজ) কবূল করবেন এবং একে কাজে লাগাবেন, অথবা আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত (অর্থাৎ, শাহাদাত ও ওফাত) পছন্দ করবেন। তিনি আল্লাহ্র সাক্ষাত (অর্থাৎ, শাহাদাত)কে পছন্দ করলেন।[১]

(পনের) ইমামগণের সামনেও মানুষের দিবারাত্রির আমল পেশ হয় ।

উছূলে কাফীতে[২] আছে-

ইমাম রেযা (আঃ)-এর কাছে তার এক বিশেষ লোক- আব্দুল্লাহ ইবনে আবান যাইয়াত আবেদন করলেন ঃ

ادع الله لی ولاهل بیتی فقال او لست افعل ؟ والله ان اعمالکم لتعرض علی فی کل یوم ولیلة - (اصول کافی جـ/١. صفحـ/٣١٩)

অর্থাৎ, আমার জন্য এবং আমার পরিবার-পরিজনের জন্য দুআ করুন। তিনি বললেনঃ আমি দুআ করি না। আল্লাহ্র কসম, প্রত্যেক দিনে ও রাত্রে তোমাদের আমলসমূহ আমার সামনে পেশ করা হয় (অর্থাৎ, প্রত্যেক দিন যখন আমার সামনে তোমাদের আমল পেশ হয়, তখন আমি দুআ করি)।

এরপর রেওয়ায়েতে আছে যে, আবেদনকারী আব্দুল্লাহ ইবনে অবান একে অসাধারণ ব্যাপার মনে করলে ইমাম রেযা বললেনঃ তুমি কি কুরআনের এই আয়াত পাঠ কর না ?-

فسیری الله عملکم ورسوله والمؤمنون -

অর্থাৎ, "তোমাদের আমল আল্লাহ্ দেখবেন এবং তাঁর রাসূল মু'মিনগণ দেখবেন।" (সূরাঃ ৯-তাওবা ঃ ১৫)

---

১. হযরত মাওলানা মানযূর নো'মানী সাহেব বলেনঃ এ রেওয়ায়েতের আলোকে শী'আদের হযরত হুসাইনের শাহাদাতের কারণে "হায় হুসাইন হায় হুসাইন" বলে কান্নার আচরণ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত ॥

২.শিরোনাম باب عرض الاعمال عند النبی والائمة علیهم السلام (বান্দার আমল রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও ইমামগণের সামনে পেশ হয়।) ॥

এ আয়াতে "মু'মিন" বলে খোদার কসম আলী ইবনে আবী তালেবকে[১] বোঝানো হয়েছে।

(ষোল) ইমামগণ কিয়ামতের দিন সমসাময়িক লোকদের জন্য সাক্ষ্য দিবেন ।

উছূলে কাফীতে আছে[২] - ইমাম জাফর ছাদেককে নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়-

فکیف اذا جئنامن کل امة بشهید وجئنابک علی هؤلاء شهیدا -

অর্থাৎ, "তখন কি অবস্থা হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষ্যদাতা উপস্থিত করব এবং হে পয়গম্বর, তোমাকে তাদের সকলের উপর সাক্ষ্যদাতা রূপে উপস্থিত করব ?" (সূরাঃ ৪-নিসাঃ ৪১) জওয়াবে ইমাম জা'ফর ছাদেক বললেন ঃ

نزلت فی امة محمد ﷺ خاصة فی کل قرن منهم امام منا شاهد علیهم ومحمد شاهد علینا - (اصول کافی جـ/١. صفحـ/٢٧٠)

অর্থাৎ, এ আয়াতটি (অন্যান্য উম্মত সম্পর্কে নয়) বিশেষভাবে উম্মতে মুহাম্মাদিয়া সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। প্রতি যুগে তাদের মধ্যে আমাদের মধ্য থেকে একজন ইমাম হবেন। তিনি সমসাময়িক লোকদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) আমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন।

এ অধ্যায়ের শেষ রেওয়ায়েতে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রাঃ) থেকেও উপরোক্ত বিষয়ে নিম্নোক্ত বর্ণনা এসেছে ঃ

ان الله تبارک وتعالی طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء علی خلقه وحجة فی ارضه - (اصول کافی جـ/١. صفحـ/٢٧٢)

(সতের) ইমামগণের আনুগত্য করা ফরয।

উছূলে কাফী গ্রন্থে এক বর্ণনায় আলী, হাসান, হুসাইন, জয়নুল আবেদীন ও ইমাম বাকের প্রমুখ সকল ইমাম এবং সকলের আনুগত্য আল্লাহ তা'আলা ফরয করেছেন-এ মর্মে রেওয়ায়েত পেশ করা হয়েছে। তার ইবারত নিম্নরূপ ঃ

عن ابی الصباح قال اشهد انی سمعت ابا عبد الله یقول : اشهد ان علیا امام فرض الله طاعته، وان الحسن امام فرض الله طاعته، وان الحسین امام فرض الله طاعته، وان علی بن الحسین امام فرض الله طاعته، وان محمد بن علی امام فرض الله طاعته - (اصول کافی جـ/١. باب فرض طاعة الائمة . صفحـ/٢٦٣)

---

১. আল্লামা কাযভীনী লিখেন ঃ ইমাম রেযা "মু'মিনগণের" তাফসীরে কেবল হযরত আলীর কথা বলেছেন। কেননা, তার দ্বারাই ইমামতের সিলসিলা চলে। নতুবা এর অর্থ তিনি এবং তার বংশে জন্মগ্রহণকারী সকল ইমাম। (ছাফী ১৪০ পৃঃ) ॥

২. باب فی الائمة شهداء الله عز وجل علی خلقه ॥

ইমাম জা'ফর ছাদেকের পিতা ইমাম বাকের থেকেও বর্ণিত আছে। ইমাম বাকের ইমামগণের আনুগত্য ফরয হওয়ার কথা বর্ণনা করার পর বলেনঃ

هذا دين الله ودين ملائكته - (اصول كافى جـ/١. صفحـ/٢٦٧)

অর্থাৎ, এটাই আল্লাহ ও ফেরেশতাগণের ধর্ম।

ইমামগণের আনুগত্য রাসূলগণের আনুগত্যের মতই ফরয - এ মর্মে উছূলে কাফীতে বলা হয়েছে ঃ

عن ابى الحسن العطار قال سمعت ابا عبد الله يقول اشرك بين الاوصياء والرسل فى الطاعة - (اصول كافى جـ/١. صفحـ/٢٦٤)

অর্থাৎ, রাসূল ও ওসীগণের আনুগত্যকে সমপর্যায়ের করে নাও।

ইমামের আনুগত্য করা সকলের উপর ফরয- শী'আগণ এ ধারণায় এতখানি বাড়াবাড়ি করেছেন যে, তারা বলেছেন স্বয়ং রাসূল (সাঃ) ইমাম মেহ্দীর (অন্তর্হিত ইমামের) বাইআত করবেন।

আল্লামা বাকের মজলিসী তার حق اليقين গ্রন্থে[১] ইমাম বাকের থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ

چون قائم ال محمد صلى الله عليه واله وسلم بيرون ايد خدا او را يارى كند بملائكه واول كسے كه با او بيعت كند محمد باشد و بعد ازاں على -

অর্থাৎ, যখন মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর পরিবারের "কায়েম" (অর্থাৎ, মেহ্দী) আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন খোদা ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাকে সাহায্য করবেন। সর্বপ্রথম তার হাতে বাই'আতকারী হবেন মুহাম্মাদ এবং তার পরে দ্বিতীয় নম্বরে আলী তার হাতে বাই'আত করবেন।

(আঠার) ইমামগণের ইমামত, নবুওয়াত ও রেসালত স্বীকার করা এবং তাঁদের প্রতি ঈমান-বিশ্বাস স্থাপন করা নাজাতের জন্য শর্ত ।

উছূলে কাফীতে বর্ণিত আছে ঃ[২]

عن احد هما انه قال لا يكون العبد مومنا حتى يعرف الله ورسوله والائمة كلهم وامام زمانه - (اصول كافى جـ/١. صفحـ/٢٥٥)

অর্থাৎ, ইমাম বাকের অথবা ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ কোন বান্দা মু'মিন হতে পারে না যে পর্যন্ত সে আল্লাহ্, তাঁর রাসুল এবং সকল ইমাম বিশেষতঃ সমসাময়িক ইমামের মা'রেফত অর্জন না করে।

উক্ত গ্রন্থে সনদ সহকারে আরও বর্ণিত আছে, যার সারকথা হল আলী, হাসান, হুসাইন, বাকের প্রমুখ ইমামকে না জানা আল্লাহ ও রাসূলকে না জানার মত এবং তাদেরকে না মানা আল্লাহ ও রাসূলকে না মানার মত। বর্ণনাটি নিম্নরূপ ঃ

১. ইরানী মুদ্রণ ১৩৯ পৃঃ ॥ ২. শিরোনাম হচ্ছে- باب معرفة الامام والرد اليه ॥

عن ذريح قال سالت ابا عبد الله عن الائمة بعد النبى صلى الله عليه وسلم فقال كان امير المؤمنين عليه السلام اماما ثم كان الحسنؑ اماما ثم كان الحسينؑ اماما ثم كان علىّ بن الحسين اماما ثم كان محمد بن على اماما ، من انكر ذلك كان كمن انكر معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة رسول الله .....الخ - (اصول كافى جـ/١. صفحـ/٢٥٦)

(উনিশ) ইমামত, ইমামগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তা প্রচারের আদেশ সকল পয়গম্বর ও সকল ঐশী গ্রন্থের মাধ্যমে এসেছে ।

উছূলে কাফী গ্রন্থে ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে-

قال ولايتنا ولاية الله التى لم يبعث نبيا قط الا بها - (اصول كافى جـ/٢. صفحـ/٣١٩)

অর্থাৎ, তিনি বলেনঃ আমাদের বেলায়াত (অর্থাৎ, মানুষের উপর আমাদের শাসন কর্তৃত্ব) হুবহু আল্লাহ্ তা'আলার বেলায়াত ও শাসন কর্তৃত্ব। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে নবীই প্রেরিত হয়েছেন, তিনি এ আদেশ নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন।

ইমাম জা'ফর ছাদেকের পুত্র ইমাম আবুল হাসান মূসা কাযেম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ

ولاية على عليه السلام مكتوبة فى جميع صحف الانبياء ولن يبعث الله رسولا الا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم و وصية علىّ عليه السلام م (اصول كافى جـ/٢. صفحـ/٣٢٠)

অর্থাৎ, আলী (আঃ)-এর বেলায়াত (অর্থাৎ, ইমামত ও শাসন কর্তৃত্ব) পয়গম্বরগণের সকল সহীফায় লিখিত আছে। আল্লাহ্ তা'আলা এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি, যে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নবী হওয়া এবং আলী (রাঃ)-এর ভারপ্রাপ্ত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আদেশ আনেননি এবং তা প্রচার করেননি।

উছূলে কাফীতে আবূ খালেদ কাবূলী থেকে বর্ণিত আছে-[১]

سألت ابا جعفر عن قول الله عز وجل امنوا بالله ورسوله والنور الذى انزلنا - فقال : يا ابا خالد النور والله الائمة - (اصول كافى جـ/١. صفحـ/٢٧٦)

১. ان الائمة عليه السلام نورالله عزوجل অধ্যায়ের প্রথম রেওয়ায়েত ॥

অর্থাৎ, আমি ইমাম বাকেরকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম- "তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি এবং আমার অবতীর্ণ নূরের প্রতি"। ইমাম বাকের বললেন ঃ হে আবূ খালেদ, আল্লাহর কছম, এখানে নূর অর্থ ইমামগণ।

তাদের বক্তব্য হল- এখানে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ ও রাসূলগণের সাথে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ যে নূরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আদেশ কুরআনে দেয়া হয়েছে, তার অর্থ ইমামগণ। এটা সমগ্র উম্মতের সর্বসম্মত মতের বিরোধীই নয় বরং আরবী ভাষায় সামান্যও ব্যুৎপত্তি রাখে- এমন প্রত্যেক ব্যক্তির মতেও নূর অর্থ কুরআন পাক, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হেদায়েতের নূর।

(বিশ) ইমামগণ দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক এবং তাঁরা যাকে ইচ্ছা দেন ও ক্ষমা করেন।

উছূলে কাফীতে[১] আছে- আবূ বছীর বলেনঃ আমার এক প্রশ্নের জওয়াবে ইমাম জা'ফর ছাদেক বললেন ঃ

اما علمت ان الدنيا والاخرة للامام يضعها حيث شاء و يدفعها الى من يشاء -

(اصول كافى جـ/٢. صفحـ/٢٦٩)

অর্থাৎ, তুমি কি জান না যে, দুনিয়া ও আখেরাত সকলই ইমামের মালিকানাধীন ? তিনি যাকে ইচ্ছা দেন এবং দান করেন।

(একুশ) ইমামগণ মানুষকে জান্নাত ও দোযখে প্রেরণকারী ঃ

উছূলে কাফীতে আছে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী বলেছেন ঃ

وكان امير المؤمنين صلوت الله عليه كثيرا ما يقول: انا قسيم الله بين الجنة والنار وانا الفاروق الاكبر وانا صاحب العصا والميسم ولقد اقرت لى جميع الملائكة والروح والرسل مثل ما اقروا به لمحمد ..... - (اصول كافى جـ/١. صفحـ/٢٨٠)

অর্থাৎ, আমীরুল মু'মিনীন প্রায়ই বলতেন-আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জান্নাত ও দোযখের মধ্যে বন্টনকারী (অর্থাৎ, আমি মানুষকে জান্নাত ও দোযখে প্রেরণ করব)। আমার কছে মূসার লাঠি ও সোলাইমানের আংটি আছে। আমার জন্য সকল ফেরেশতা, রূহ[২] এবং সকল পয়গম্বর তেমনি স্বীকৃতি দিয়েছিল, যেমন তারা মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জন্যে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

১. অধ্যায় باب ان الارض كلها للامام عليه السلام (অর্থাৎ, সমগ্র পৃথিবী ইমামের মালিকানাধীন।)॥

২. শী'আদের বর্ণনা মতে "রূহ" জিবরাঈল ও সকল ফেরেশতার উর্ধ্বে এক মহান মাখলূক ॥

(বাইশ) যে ইমামকে না মানে সে কাফের।

উছূলে কাফী গ্রন্থে ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন ঃ

نحن الذين فرض الله طاعتنا لا يسع الناس الا معرفتنا ولا يعذر الناس بجهالتنا من عرفنا كان مومنا ومن انكرنا كان كافرا ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا حتى يرجع الى الهدى الذى افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة - (اصول كافى جـ/١. باب فرض طاعة الائمة صفحـ/٢٦٦)

অর্থাৎ, আল্লাহ আমাদের আনুগত্য ফরয করেছেন। আমাদেরকে চেনা ও মানা সকল মানুষের জন্যে জরূরী। আমাদের সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে মানুষকে ক্ষমাযোগ্য মনে করা হবে না। যে আমাদেরকে চিনে ও মানে, সে মু'মিন। যে আমাদেরকে অস্বীকার করে, সে কাফের। আর যে আমাদেরকে চিনে না এবং অস্বীকারও করে না, সে পথভ্রষ্ট যে পর্যন্ত সে হেদায়েতের পথে অর্থাৎ, আমাদের ফরয আনুগত্য করার দিকে ফিরে না আসে।

(তেইশ) জান্নাতে যাওয়া না যাওয়া ইমামদের মান্য করা না করার উপর নির্ভরশীল।

শী'আগণের বিশ্বাস হল ইমামগণকে ইমাম মান্যকারী শী'আ ব্যক্তি যালেম ও পাপিষ্ট হলেও জান্নাতী। পক্ষান্তরে ইমামগণকে ইমাম হিসেবে অমান্যকারী মুসলমান ব্যক্তি মুত্তাকী পরহেযগার হলেও দোযখী। উছূলে কাফীতে ইমাম বাকের থেকে এ মর্মেই স্পষ্টতঃ বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ

ان الله لا يستحيى ان يعذب امة دانت بامام ليس من الله وان كانت فى اعمالها برة تقية وان الله ليستحيى ان يعذب امة دانت بامام من الله وان كانت فى اعمالها ظالمة سيئة - (اصول كافى جـ/٢. صفحـ/٢٠٦)

উক্ত মর্মে আরও একটি রেওয়ায়েত নিম্নরূপঃ[১]

ইমাম জা'ফর ছাদেকের এক অকৃত্রিম শী'আ মুরীদ আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়া'কূব একবার ইমাম জা'ফর ছাদেকের খেদমতে আরয করলেন ঃ আমি সাধারণভাবে মানুষের সাথে মেলামেশা করি। তখন এটা দেখে খুবই আশ্চর্যবোধ করি যে, যারা আপনাদের ইমামতে বিশ্বাস করে না (অর্থাৎ, শী'আ নয়) এবং অমুককে অমুককে (আবূ বকর ও ওমরকে) খলীফা বলে বিশ্বাস করে, তাদের মধ্যে বিশ্বস্ততা, সত্যতা ও অঙ্গীকার পালনের গুণাবলী রয়েছে। পক্ষান্তরে যারা আপনাদের ইমামতে বিশ্বাস করে (অর্থাৎ, শী'আ), তাদের মধ্যে বিশ্বস্ততা, অঙ্গীকার পালন ও সত্য পরায়ণতার গুণাবলী নেই (বরং তারা বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাধী ও প্রতারক)। আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ ইয়া'কূব বর্ণনা করেন যে, তার একথা শুনে ইমাম

১. اصول كافى جـ/٢. صفحـ/٢٠٥ - ॥

জা'ফর ছাদেক সোজা হয়ে বসে গেলেন এবং ক্রুদ্ধ অবস্থায় তাকে বললেন ঃ সেই ব্যক্তির ধর্ম এবং ধর্মীয় আমল গ্রহণযোগ্য নয়, যে কোন অন্যায় ইমামের ইমামতে বিশ্বাসী হয়-এমন ইমাম, যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মনোনীত নয়। পক্ষান্তরে এমন ব্যক্তির উপর আল্লাহ্‌র কোন ক্রোধ ও আযাব হবে না, যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মনোনীত ইমাম আদেলের ইমামতে বিশ্বাসী হয়। (উদ্দেশ্য মানুষ যতবড় পাপিষ্টই হোক, যদি সে ইছনা আশারী ইমামগণের ইমামতে বিশ্বাস করে, তবে সে ক্ষমা পাবে।)

২. সাহাবা বিদ্বেষ সংক্রান্ত আকীদা ঃ

শী'আদের দ্বিতীয় প্রধান আকীদা হল সাহাবা বিদ্বেষ সংক্রান্ত আকীদা (عقيدة تبرا / عقيدة بغض صحابه) এ আকীদা অনুযায়ী হযরত আলীর ইমামত না মানার কারণে খলীফাত্রয় ও সাধারণ সাহাবায়ে কেরাম নিশ্চিতই কাফের ও ধর্মত্যাগী। (নাউযুবিল্লাহ!) শী'আদের সাহাবা বিদ্বেষ সংক্রান্ত আকীদার পর্যায়ে তারা সাহাবীদের সম্পর্কে যা যা ধারণা রাখে তার কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হল।

১. তারা প্রথম তিন খলীফাত্রয় (আবূ বকর, ওমর ও উছমান [রাঃ]) কে কাফের ও ধর্মত্যাগী মনে করে - এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বর্ণনা তুলে ধরা হল ঃ

(এক) সূরা নিসার নিম্নোক্ত আয়াত[১]

ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم .....-

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উছূলে কাফীতে ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে রেওয়ায়েত[২] আছে যে, তিনি এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন-

১. এ আয়াতের অর্থ হল- যারা ঈমান এনেছে, তারপর কুফ্‌রী করেছে, অনন্তর ঈমান এনেছে, আবার কুফ্‌রী করেছে, তারপর কুফ্‌রীতে আরও অগ্রসর হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করার নন। (সূরাঃ ৪-নিসা ঃ ১৩৭) এতে বলা হয়েছেঃ যারা ইসলাম কবূল করে, কিন্তু এরপর মুখ ফিরিয়ে কুফ্‌রের পথ বেছে নেয়, এরপর পুনরায় ঈমান পকাশ করে এবং এরপর আবার কুফ্‌রের দিকে ফিরে যায় এবং কুফ্‌রের মধ্যেই সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে, আল্লাহ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। (সূরা নিসা-১৩৭) বলা বাহুল্য, এতে এমন মুনাফিকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, যারা তাদের পার্থিব স্বার্থের তাগিদে কখনও মুসলমানদের মধ্যে শামিল হয়ে যেত এবং কখনও কাফেরদের সাথে হাত মিলাত। ॥

২. রেওয়ায়েতটি পাঠ করার পূর্বে পাঠকবর্গ মনে রাখুন যে, শী'আ রেওয়ায়েতসমূহে যেখানে যেখানে (অমুক ও অমুক) শব্দ আসে, সেখানে অর্থ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও ওমর ফারুক (রাঃ) উদ্দশ্য হয়ে থাকে। আর যেখানে এ শব্দটি তিনবার আসে, সেখানে তৃতীয় "অমুক"-এর অর্থ হয় হযরত উছমান (রাঃ)।-মানযূর নো'মানী, ইরানী ইনকিলাব। ॥

نزلت فى فلان وفلان وفلان امنوا بالنبى صلى الله عليه وسلم فى اول الامر و كفروا حيث عرضت عليهم الولاية حين قال النبى صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا على مولاه ثم امنوا بالبيعة لامير المؤمنين عليه السلام ثم كفروا حيث مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقروا بالبيعة ثم ازدادوا كفرا باخذهم من بايعه لهم فهؤلاء لم يبق فيهم من الايمان شئ - (اصول كافى جـ/٢. صفحـ/٢٨٩)

অর্থাৎ, এ আয়াতটি অমুক, অমুক ও অমুক (অর্থাৎ, আবূ বকর, ওমর এবং উছমান) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তারা তিন জনই শুরুতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। তারপর যখন তাদের সামনে হযরত আলীর ইমামত পেশ করা হল এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন যে, من كنت مولاه فهذا على مولاه তখন তাঁরা তা অস্বীকার করে কাফের হয়ে গেল। এরপর তারা (রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কথায়) আমীরুল মু'মিনীনের বাই'আত করে নিল এবং পুনরায় ঈমান আনল। এরপর যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাত হয়ে গেল, তখন তারা আবার বাই'আত অস্বীকার করে কাফের হয়ে গেল এবং কুফ্‌রে আরও অগ্রসর হল। তারা যখন সেই সব লোকের কাছ থেকেও নিজেদের খেলাফতের বাই'আত নিয়ে নিল যারা হযরত আলীর হাতে বাই'আত করেছিল, তখন তাদের সকলের অবস্থা এই দাঁড়াল যে, তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্রও ঈমান বাকী রইল না। (অর্থাৎ, নিশ্চিতই কাফের হয়ে গেল।)

(দুই) সূরা মুহাম্মাদের নিম্নোক্ত আয়াত-[১]

ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا-

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে উছূলে কাফীতেই উপরোক্ত রেওয়ায়েতের পর ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ এ আয়াতে যাদের কাফের ও ধর্মত্যাগী হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তারা

فلان وفلان ارتدوا عن الايمان فى ترك ولاية امير المؤمنين عليه السلام - (اصول كافى جـ/٢. صفحـ/٢٨٩)

অর্থাৎ, অমুক, অমুক এবং অমুক (অর্থাৎ, খলীফাত্রয়)। তারা তিনজনই আমীরুল মু'মিনীন (আঃ)-এর বেলায়াত ও ইমামত বর্জন করার কারণে ঈমান ও ইসলাম ত্যাগী হয়ে গেছে।

১. এ আয়াতের সহীহ অর্থ হল - যারা নিজেদের কাছে হেদায়েত স্পষ্ট হওয়ার পর পূর্বের অবস্থায় (কুফ্‌রী অবস্থায়) ফিরে যায়, তারা আদৌ আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (সূরাঃ ৪৭-মুহাম্মাদঃ ২৫) ॥

(তিন) সূরা হুজুরাতের নিম্নোক্ত আয়াত[১]

ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه فى قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئک هم الراشدون - (সূরা ঃ ৪৯-হুজুরাত ঃ৭)

এর ব্যাখ্যায় উছূলে কাফীতে ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ

قوله حبب اليكم الايمان وزينه فى قلوبكم يعنى امير المؤمنين عليه السلام وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان الاول والثانى والثالث - (اصول كافى جـ/٢. صفحـ/٢٩٩)

অর্থাৎ, এ আয়াতে উল্লেখিত حبب اليكم الايمان এর মধ্যে "ঈমান" অর্থ আমিরুল মু'মিনীন (আঃ)-এর পবিত্র সত্তা। كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان এর মধ্যে "কুফ্‌র" অর্থ প্রথম খলীফা (আবূ বকর), "ফুসূক"(পাপাচার) অর্থ দ্বিতীয় খলীফা (ওমর) এবং "ইছয়ান"(অবাধ্যতা) অর্থ তৃতীয় খলীফা (উছমান)।[২]

২. শী'আগণের কথিত ব্যাখ্যা অনুসারে যারা আলী (রাঃ)-এর ইমামত মানে না, তাদেরকে তারা জাহান্নামী মনে করে। এভাবে তারা সব সাহাবীকে এবং সমস্ত মুসলমানকে কাফের সাব্যস্ত করেছে। তারা সূরা বাকারার নিম্নোক্ত আয়াত-[৩]

بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فاولئک اصحاب النار هم فيها خالدون - (সুরাঃ ২-বাকারা ঃ ৮১)

এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছে যে,

بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته قال اذا جحد امامه امير المؤمنين فاولئک اصحاب النار هم فيها خالدون - (اصول كافى جـ/٢. صفحـ/٣٠٤)

অর্থাৎ, আয়াতে বোঝানো হয়েছে, যারা আমীরুল মু'মিনীনের ইমামত[৪] অস্বীকার করবে, তারা জাহান্নামী হবে এবং অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে।

১.এ আয়াতের পরিস্কার ও সোজা অর্থ এই যে, হে মুহাম্মাদের সাহাবীগণ, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত এই যে, তিনি ঈমানের মহব্বত তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তোমাদের অন্তরকে ঈমানের সৌন্দর্য দ্বারা শোভিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের মধ্যে কুফ্‌র, পাপাচার ও আবাধ্যতার প্রতি ঘৃণা জাগ্রত করে দিয়েছেন। তাঁরাই হোদয়েতপ্রাপ্ত ॥

২. এসব রেওয়ায়েত ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর দুশমনদের চক্রান্তের অংশ। জ্ঞান ও বিবেক সম্পন্ন লোকদের এ থেকে ধোকা খাওয়া উচিত হবে না ॥

৩. এ আয়াতের সহীহ অর্থ হলঃ যারা মন্দ কর্ম উপার্জন করে, মন্দ কর্মকেই সম্বল করে নেয় এবং মন্দকর্ম তাদেরকে বেষ্টন করে নেয়, (এটা কাফের ও মুশরিকদের অবস্থা) তারা জাহান্নামী, তারা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে ॥

৪. উল্লেখ্য, এখানে ইমামত অর্থ শী'আদের পারিভাষিক ইমামত ॥

৩. শী'আদের সাহাবা বিদ্বেষের পর্যায়ে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, তাদের ধারণা হল প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী আত্মপ্রকাশ করার পর হযরত আয়েশা (রাঃ) কে জীবিত করে শাস্তি দিবেন। বাকের মজলিসী علل الشرائع গ্রন্থের বরাত দিয়ে ইমাম বাকের থেকে রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেন যে,

چون قائم ما ظاهر شود عائشه را زنده کند تا براو حد بزند وانتقام فاطمه ما ازو بکشد۔

অর্থাৎ, যখন আমাদের কায়েম (মেহ্‌দী) আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন আয়েশাকে জীবিত করে শাস্তি দিবেন এবং আমাদের ফাতেমার প্রতিশোধ নিবেন।[১]

৪. শী'আগণ শুধু সাহাবাদের প্রতিই বিদ্বেষ রাখেন না, বরং আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সকল লোকদের সাথে বিশেষতঃ আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের উলামায়ে কেরামের সাথে চরম বিদ্বেষ পোষণ করেন। কারণ আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা শী'আগণের কথিত ব্যাখ্যা অনুসারে হযরত আলী (রাঃ)-এর ইমামত মানে না এবং তারা সাহাবীদের প্রতি ভক্তি রাখে। শী'আদের ধারণা হল অন্তর্হিত ইমাম যখন আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন কাফেরদের আগে সুন্নীদেরকে কতল করবেন বিশেষত ঃ তাদের উলামায়ে কেরামকে কতল করবেন। এ বিষয়ে "হক্কুল ইয়াকীন" গ্রন্থের একটি রেওয়ায়েত নিম্নরূপ ঃ

وقتیکه قائم علیه السلام ظاهر می شود پیش از کفار ابتداء به سنیان خواهد کرد با علماء ایشان وایشان را خواهد کشت۔

অর্থাৎ, যে সময় কায়েম (আঃ) আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন তিনি কাফেরদের পূর্বে সুন্নী বিশেষতঃ তাদের আলেমদের থেকে কাজ শুরু করবেন এবং তাদের সকলকে হত্যা করে দিবেন।[২]

৪. শী'আদের সাহাবা বিদ্বেষের পর্যায়ে আরও একটি কথা উল্লেখ্য যে, তাদের ধারণায় (নাউযুবিল্লাহ) সাহাবায়ে কেরামের প্রায় সকলেই বিশেষতঃ খলীফাত্রয় কাফের, ধর্মত্যাগী আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসঘাতক, জাহান্নামী ও অভিশপ্ত ।

পূর্বেও আরয করা হয়েছে যদি স্বীকার করে নেয়া হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিদায় হজ্ব থেকে ফেরার পথে "গাদীরে খুম" নামক স্থানে সকল সফরসঙ্গী বিশিষ্ট ও সাধারণ সাহাবায়ে-কেরামকে বিশেষ ব্যবস্থার অধীনে একত্রিত করেন। অতঃপর নিজে মিম্বারে আরোহন করে হযরত আলী মুর্তযাকে উভয় হাতের উপরে তুলে ধরেন, যাতে উপস্থিত সকলেই তাঁকে দেখতে পায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার আদেশের বরাত দিয়ে পরবর্তী সময়ের জন্য তাঁর ইমামত অর্থাৎ, স্থলাভিষিক্তরূপে উম্মতের ধর্মীয় ও জাগতিক শাসন কর্তৃত্ব ঘোষণা করেন। সকলের কাছ থেকে এর অঙ্গীকার ও স্বীকৃতি আদায় করেন। বিশেষতঃ হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমরকে আদেশ দেন যে, তোমরা আলীকে "আসসালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মু'মিনীন" বলে সালাম দাও। তাঁরা এ আদেশ পালন

১. ইরানী ইনকিলাব, বরাত - হুক্কুল ইয়াকীন, ১৩৯ পৃঃ ॥ ২.ইরানী ইনকিলাব ॥

করে এমনিভাবে সালাম দেন। ইহতেজাজে তাবরিযীর উল্লেখিত রেওয়ায়েত অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং নিজের হাতে হযরত আলীর পক্ষে সকলের কাছ থেকে বাই'আত নেন। এবং সর্বপ্রথম খলীফাত্রয় তাঁর হাত ধরে এই বাই'আত করেন। মোট কথা, শী'আ গ্রন্থাবলীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই পূর্ণ বিবরণকে বাস্তব ঘটনা বলে স্বীকার করে নেওয়া হলে এর অবশ্যম্ভাবী ফলাফল স্বরূপ একথাও স্বীকার করতে হবে যে, যখন এ ঘটনার মাত্র আশি দিন পরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাত হয়ে যাওয়ায় সকলেই হযরত আলীকে পরিত্যাগ করে হযরত আবূ বকরকে খলীফা ও স্থলাভিষিক্তরূপে মুসলিম উম্মাহ্‌র ধর্মীয় ও জাগতিক রাষ্ট্রপ্রধান করে নিল, এবং সকলেই তাঁর হাতে বাই'আত করল, তখন (নাউযুবিল্লাহ) তাঁরা সকলেই আল্লাহ ও রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং সকলেই কাফের ও ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। বিশেষতঃ খলীফাত্রয়- হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর ও হযরত উছমান বিশ্বাসঘাতক হয়ে গেলেন, যাদের কাছ থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিশেষভাবে অঙ্গীকার ও স্বীকৃতি নিয়েছিলেন এবং নিজের হাতে সর্বপ্রথম বাই'আত গ্রহণ করিয়েছিলেন।

খলীফা হযরত আবূ বকর ও ওমর (রাঃ) সম্পর্কে শী'আদের বিশেষ বিদ্বেষ প্রমাণিত করার জন্য নিম্নোক্ত বর্ণনাটি লক্ষ্য করার মত ঃ

কুলাইনীর কিতাবুর-রওযায় রেওয়ায়েত আছে যে, ইমাম বাকেরের জনৈক অকৃত্রিম মুরীদ হযরত আবূ বকর ও ওমর সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ "এ দু'জনের সম্পর্কে কি জিজ্ঞেস কর ? আমাদের আহলে-বায়তের মধ্য থেকে যে-ই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, তাদের প্রতি ক্ষুদ্ধ অবস্থায় বিদায় নিয়েছে। আমাদের প্রত্যেক বড়জন ছোটজনকে এদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করার ওছিয়্যাত করেছে। তারা উভয়েই অন্যায়ভাবে আমাদের অধিকার ক্ষুণ্ন করেছে। তারা সর্ব প্রথম আমাদের আহলে-বায়তের ঘাড়ে সওয়ার হয়েছে। আমাদের উপর যে কোন বালা-মুসীবত এসেছে, তার ভিত্তি তারা রচনা করেছে। অতএব তাদের উভয়ের প্রতি আল্লাহ্‌র লানত, ফেরেশতাগণের লানত এবং সকল মানুষের লানত।" (১১৫-পৃঃ)

"রেজাল-কুশীতে বর্ণিত আছে যে, ইমাম বাকেরের একজন খাঁটি মুরীদ-কুমায়ত ইব্‌নে যায়েদ ইমামকে বলল যে, আমি এই দুই ব্যক্তি (আবূ বকর ও ওমর) সম্পর্কে আপনার কছে জানতে চাই। ইমাম বললেন ঃ

-হে কুমায়ত ইব্‌নে যায়েদ! ইসলামে যাকেই অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে, যে ধন-সম্পদই অবৈধভাবে উপার্জন করা হয়েছে এবং যত যিনা হয়ে থাকবে, আমাদের ইমাম মেহদীর আত্মপ্রকাশের দিন পর্যন্ত, সবগুলোর গোনাহ্ এই দুই ব্যক্তির ঘাড়ে চাপবে। (১৩৫ পৃঃ)

এ পর্যায়ে আরও উল্লেখ করা যায় কুলাইনীর কিতাবুর-রওযার আরও একটি রেওয়ায়েত। কুলাইনী তার সনদ সহকারে হযরত সালমান ফারসী থেকে একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। যার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর ছকীফা বনী-ছায়েদায় যখন আবূ বকরের বাই'আতের ফয়সালা হয় এবং সেখান থেকে মসজিদে নববীতে এসে আবূ বকর রাসূলুল্লাহ

(সাঃ)-এর মিম্বরে বসে বাই'আত নিতে শুরু করলেন, তখন সালমান ফারসী এ দৃশ্য দেখে হযরত আলীকে সংবাদ দিলেন। হযরত আলী সালমানকে বললেনঃ তুমি জান এখন আবূ বকরের হাতে সর্বপ্রথম কে বাই'আত করেছে। সালমান বললেন ঃ আমি সেই লোকটিকে চিনি না; কিন্তু আমি একজন বৃদ্ধকে দেখেছিলাম। সে তার লাঠির উপর ভর দিয়ে সামনে এগিয়ে আসে। তার চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে কপালে সেজদার চিহ্ন ছিল। সে-ই সর্বপ্রথম আবূ বকরের দিকে অগ্রসর হয়। সে ক্রন্দন করছিল আর বলছিল ঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যে, যিনি আমাকে এ স্থানে আপনাকে দেখার পূর্বে মৃত্যু দেননি। হাত বাড়ান। আবূ বকর হাত বাড়ালে বৃদ্ধ তাঁর হাত ধরে বাইআত করল। হযরত আলী একথা শুনে আমাকে বললেনঃ তুমি জান সে কে ? সালমান বললেনঃ আমি জানি না। হযরত আলী বললেনঃ সে ইবলীস। তার প্রতি আল্লাহ্ লানত করুন। হযরত আলী আরও বললেনঃ খেলাফতের ব্যাপারে যা কিছু হয়েছে, সবই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে পূর্বে বলে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ গাদীরে-খুমে আমার পরবর্তী সময়ের জন্যে খেলাফতের ব্যাপারে আমার মনোনয়ন ঘোষণা থেকে শয়তান ও তার বাহিনীর মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তারা এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে এবং এর ফলশ্রুতিতে আমার ওফাতের পর লোকজন প্রথমে ছকীফা বনী ছায়েদায় এবং পরে মসজিদে-নববীতে এসে আবূ বকরের বাই'আত করবে। রেওয়ায়েতের শেষাংশ এই ঃ

ثم ياتون المسجد فيكون اول من يبايعه على منبرى ابليس لعنه الله فى صورة شيخ يقول كذا وكذا .....

অর্থাৎ, এরপর (ছকীফা বনী ছায়েদা থেকে) তারা মসজিদে আসবে। এখানে আমার মিম্বরের উপর আবূ বকরের হাতে সর্বপ্রথম অভিশপ্ত ইবলীস বাই'আত করবে। সে বৃদ্ধের ছদ্মবেশে আসবে এবং এই এই কথা বলবে। (১৫৯,১৬০)

৫. শী'আদের সাহাবা বিদ্বেষের পর্যায়ে আরও উল্লেখ্য যে, তাদের ধারণায় অন্তর্হিত ইমাম যখন আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন শায়খাইন (আবূ বকর ও ওমর)কে কবর থেকে বের করবেন এবং হাজারো বার শূলীতে চড়াবেন ।

বাকের মজলিসী তার "হক্কুল ইয়াকীন" গ্রন্থে শায়খাইনকে কবর থেকে বের করে সারা বিশ্বের পাপীদের পাপের শাস্তিতে প্রত্যহ হাজারো বার শূলীতে চড়ানোর কথা উল্লেখ করেছেন।

৬. শী'আদের ধারণা (নাউযুবিল্লাহ)- হযরত আয়েশা ও হযরত হাফ্‌সা মুনাফিকা ছিলেন, তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বিষ দিয়ে খতম করেছেন। বাকের মজলিসী তার "হাক্কুল ইয়াকীন"গ্রন্থে একথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তার "হায়াতুল-কুলূব" গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের বর্ণনায় লিখেছেন ঃ

وعیاشی بسند معتبر از حضرت صادق روایت کرده است که عائشه وحفصه آنحضرت را بزهر شهید کردند ـ

অর্থাৎ, আইয়াশী নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা, হাফ্সা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বিষ দিয়ে শহীদ করেছিল। (৮৭০ পৃঃ)

বাকের মজলিসী আরও লিখেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) গোপনে হাফ্সাকে বলেছিলেনঃ আমি ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, আমার পরে আবূ বকর অন্যায়ভাবে খলীফা হয়ে যাবে। তার পরে তোমার পিতা ওমর খলীফা হবে। তিনি এ গোপন কথা কারও কাছে না বলার জন্যে হাফসাকে তাকিদ করেছিলেন। কিন্তু হাফসা কথাটি আয়েশার কাছে ফাঁস করে দেয় এবং আয়েশা তার পিতা আবূ বকরকে বলে দেয়। আবূ বকর ওমরকে বলল যে, হাফসা একথা বলেছে। ওমর তার কন্যা হাফসাকে জিজ্ঞেস করলে প্রথমে তিনি বলতে চাননি, কিন্তু পরে বলে দেন যে, হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একথা বলেছেন। এরপর মজলিসী লিখেন ঃ

پس آن دو منافق وآن دو منافق بایکدیگر اتفاق کردند که آنحضرت را به زهر شهید کنند۔

অর্থাৎ, অতঃপর এ দু' মুনাফিক এবং দু' মুনাফিকা (অর্থাৎ, আবু বকর, ওমর ও তাঁদের কন্যাদ্বয়) এ বিষয়ে একমত হয়ে যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বিষ দিয়ে শহীদ করতে হবে। (৭৪৫ পৃঃ)

৩. কুরআন বিকৃতি বিষয়ক আকীদা

শী'আদের তৃতীয় প্রধান আকীদা হল কুরআন বিকৃতি সম্পর্কিত আকীদা (عقیدۂ تحریف قرآن)। তারা বিশ্বাস রাখে যে, মুসলমানদের নিকট সংরক্ষিত কুরআন বিকৃত। মূলতঃ কুরআন বিকৃতির আকীদা ইমামত আকীদারই অবশ্যম্ভাবী ফলাফল। কেননা শী'আদের ধারণায় কুরআন সংকলনকারী হযরত আবূ বকর উছমান ও তাদের সহযোগী সাহাবাগণ ছিলেন আলী বিদ্বেষী। ফলে কুরআন থেকে হযরত আলী ও আহ্লে বাইতের ফযীলতমূলক বর্ণনা সমূহ পরিকল্পিত ভাবে তারা বাদ দিয়ে দিয়েছেন। তাই মুসলমানদের নিকট সংরক্ষিত কুরআন বিকৃত। এ পর্যায়ে তাদের ছয়টি বক্তব্য নিম্নে প্রদান করা হল।

১. কুরআনে "পাঞ্জতন পাক" ও সকল ইমামের নাম ছিল।

শী'আদের বক্তব্য হল কোরআনে "পাঞ্জতন পাক"[১] ও সকল ইমামের নাম ছিল। এগুলো বের করে দেয়া হয়েছে এবং পরিবর্তন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে কুরআনের কয়েকটি আয়াত সম্পর্কে তাদের বক্তব্য পেশ করা হল।

* সূরা তোয়াহার আয়াত ১১৫-

ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسى ولم نجد له عزما .....

অর্থাৎ, আমি আদমকে প্রথমেই এক আদেশ দিয়েছিলাম (যে, বৃক্ষের কাছে যেয়ো না।) অতঃপর আদম তা ভুলে গেল।

এ সম্বন্ধে উছূলে কাফীতে আছে যে, ইমাম জা'ফর ছাদেক কসম খেয়ে বলেন ঃ এই পূর্ণ আয়াত এভাবে নাযিল হয়েছিল-

১. শী'আগণ পাঞ্জতন পাক বলে বোঝান মুহাম্মাদ (সাঃ), আলী, ফাতেমা, হাছান ও হুছাইন- এই পাঁচ ব্যক্তিকে ॥

ولقد عهدنا الى ادم من قبل كلمات فى محمد وعلى وفاطمة والحسن والائمة من ذريتهم فنسى ..... هكذا والله انزلت على محمد صلى الله عليه واله وسلم ـ

(اصول كافى جـ/٢. صفحـ٢٨٣)

এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, এই আয়াত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি এভাবে নাযিল হয়েছিল যে, এতে এ সকল নাম ছিল। (অর্থাৎ, আমি আদমকে আলী, ফাতেমা, হাসান, হুসাইন এবং তাদের বংশে জন্মগ্রহণকারী ইমামগণ সম্পর্কে কিছু বিধান বলে দিয়েছিলাম।) কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পরে (শী'আ আকীদা অনুযায়ী) যারা জোর পূর্বক খলীফা হয়ে গিয়েছিল, তারা কুরআনে পরিবর্তন করেছে। তাদের অন্যতম পরিবর্তন এই যে, তারা সূরা তোয়াহার এই আয়াত থেকে পাক পাঞ্জতনের নাম ও তাদের বংশে জন্মগ্রহণকারী ইমামগণের আলোচনা অপসারণ করে দিয়েছে।

* সুরা বাকারার শুরুতে আয়াত নং ২৩-[১]

ان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ـ

এ আয়াত সম্বন্ধে উছূলে কাফীতে ইমাম বাকের থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

نزل جبرئيل بهذه الاية على محمد صلى الله عليه واله وسلم هكذا ان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فى على فأتوا بسورةمن مثله ـ (اصول كافى جـ/٢. صفحـ/٢٨٤)

অর্থাৎ, জিবরাঈল মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রতি এ আয়াতটি এভাবে নিয়ে নাযিল হয়েছিল যে, এতে على عبدنا -এর পরে এবং فأتوا এর পূর্বে فى على শব্দটি ছিল। অর্থাৎ, এ আয়াত-টি হযরত আলীর ইমামত প্রসঙ্গে ছিল।

সূরা রূমের নিম্নোক্ত আয়াত-[২]

فاقم وجهك للدين حنيفا ـ (সূরাঃ ৩০-রূম ঃ ৩০)

উছূলে কাফীতে ইমাম বাকের এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ هى الولاية অর্থাৎ, এর অর্থ বেলায়েত ও ইমামত। (اصول كافى جـ/٢. صفحـ/٢٨٦)

* সূরা আহযাবের নিম্নোক্ত আয়াত-[৩]

১. এ আয়াতে ইসলাম ও কুরআন অস্বীকারীদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে এবং চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে, আমার বান্দা মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ এই কুরআনের ঐশী গ্রন্থ হওয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের কিছু সন্দেহ ও সংশয় থাকে, তবে এর অনুরূপ একটি সূরাই রচনা করে অথবা রচনা করিয়ে নিয়ে এস। ॥

২. এ আয়াতের অর্থ হল তুমি একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের জন্য তোমাকে প্রতিষ্ঠিত কর। ॥

৩. আয়াতের অর্থ হল - "যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, সে বিরাট সাফল্য অর্জন করবে।" ॥

من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ (সুরাঃ ৩৩-আহযাব ঃ ৭১)

এ আয়াত সম্পর্কে উছূলে কাফীতে আবূ বছীরের বর্ণনায় ইমাম জা'ফর ছাদেক বলেন ঃ আয়াতটি এভাবে নাযিল হয়েছিল -

ومن يطع الله ورسوله فى ولاية على والائمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما ـ (اصول كافى جـ/٢. صفحـ/٢٧٩)

অর্থাৎ, এর অর্থ ছিল যে কেউ আলী ও তার পরবর্তী ইমামগণের ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, সে বিরাট সাফল্য অর্জন করবে। এ আয়াতে হযরত আলী ও তার পরবর্তী সকল ইমামের ইমামত বর্ণিত হয়েছিল। কিন্তু আয়াত থেকে "আলী ও তার পরবর্তী ইমামগণের ব্যাপারে" কথাগুলো বের করে দেওয়া হয়েছে, যা বর্তমান কুরআনে নেই।

ইমাম বাকের থেকে বর্ণিত আছে-

عن ابى جعفر عليه السلام قال نزل جبرئيل بهذه الاية على محمد صلى الله عليه واله بئسما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله فى علىّ بغيا ـ (اصول كافى جـ/٢. صفحـ/٢٨٤)

অর্থাৎ, সূরা বাকারার এই ৯০ আয়াতে فى علىّ (আলীর ব্যাপারে) শব্দ ছিল, যা বের করে দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমান কুরআনে নেই।

* সূরা মা'আরিজের প্রথম আয়াত সম্পর্কে ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে আবূ বছীরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, আয়াতটি এভাবে নাযিল হয়েছিল ঃ

سال سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية على ليس له دافع ثم قال هكذا والله نزل بها جبريل على محمد صلى الله عليه واله ـ (اصول كافى جـ/٢. صفحـ/٢٩١)

অর্থাৎ, এ আয়াত থেকে بولاية على শব্দটি বের করে দেওয়া হয়েছে।

সারকথা উছূলে কাফীতে এভাবে কুরআনে পাকের বিভিন্ন জায়গায় বহু আয়াতে এ ধরনের পরিবর্তন দাবী করা হয়েছে।

২. কুরআনের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ গায়েব করে দেয়া হয়েছে।

عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام قال ان القرآن الذى جاء به جبريل عليه السلام الى محمد صلى الله عليه واله سبعة عشر الف اية ـ

অর্থাৎ, হিশাম ইবনে সালেমের রেওয়ায়েতে ইমাম জা'ফর ছাদেক বলেন ঃ জিবরাঈল যে কুরআন নিয়ে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর কাছে নাযিল হয়েছিল, তাতে সতর হাজার আয়াত ছিল। (৬৭১ পৃঃ)

প্রসিদ্ধ শী'আ আলেম আল্লামা কাযভীনী লিখেন ঃ

مراد اینست کہ بسیاری ازان قران ساقط شدہ و در مصاحف مشہورہ نیست۔

অর্থাৎ, ইমাম জা'ফর ছাদেকের এ উক্তির অর্থ হল, জিবরাঈলের আনীত কুরআন থেকে অনেক অংশ বাদ দেয়া হয়েছে এবং তা কুরআনের বর্তমান প্রসিদ্ধ কপিসমূহে নেই।[১]

৩. কুরআন বিকৃতি সম্বন্ধে হযরত আলীও বলে গেছেন।

শী'আ মাযহাবের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থ ইহ্‌তিজাজে তবরিযীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জনৈক যিন্দীক তথা ধর্মদ্রোহী ব্যক্তি হযরত আলীর সাথে এক দীর্ঘ কথোপকথনে কুরআন মাজীদের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি উত্থাপন করেছে। হযরত আলী এগুলোর জওয়াব দিয়েছেন। তন্মধ্যে তার একটি আপত্তি ছিল এরূপ যে, সূরা নিসার প্রথম রুকূর নিম্নোক্ত আয়াত -

وان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ..... الاية

এর মধ্যে شرط ও جزاء এর মধ্যে যে সম্পর্ক হওয়া উচিত, তা নেই। (১২৪ পৃঃ) হযরত আলী তখন বলেছেন ঃ

هو قدمت ذكره من اسقاط المنافقين من القران وبين القول فى اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص اكثر من ثلث القوان۔

অর্থাৎ, পূর্বে আমি যে কথা উল্লেখ করেছি, এটা তারই একটি দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ, মুনাফিকরা কুরআন থেকে অনেক কিছু বাদ দিয়েছে। এ আয়াতে তারা এই করেছে যে, ان خفتم فى اليتامى এবং فانكحوا ماطاب لكم من النساء এর মধ্যে এক তৃতীয়াংশ কোরআনেরও বেশী ছিল, যা বাদ দেয়া হয়েছে। এতে সম্বোধন ও কিসসা-কাহিনী ছিল। (১২৮ পৃঃ)

শী'আদের বক্তব্য হল এ রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত আলী বলেছেন যে, এই এক আয়াতের মাঝখান থেকে মুনাফিকরা এক তৃতীয়াংশ কুরআনের চেয়েও বেশী বাদ দিয়েছে। এতে অনুমান করা যায় যে, সমগ্র কুরআন থেকে কতটুকু বাদ দেয়া হয়েছে।

এ কথোপকথনে যিন্দীকের অন্যান্য কয়েকটি আপত্তির জওয়াবেও হযরত আলী মুর্তযা কুরআনে পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন। তার এক আপত্তির জওয়াবে তিনি একথাও বলেছেন যে, এ ব্যাপারে এ স্থলে তুমি যে জওয়াব আমার কাছ থেকে শুনেছ, তাই তোমার জন্যে যথেষ্ট হওয়া উচিত। কেননা, আমাদের শরী'আতে তাকিয়্যার যে নির্দেশ আছে তা এর চেয়ে বেশী স্পষ্ট করে বলার পথে অন্তরায়।[২]

৪. আসল কুরআন ইমামে গায়েবের নিকট রয়েছে।

শী'আদের বক্তব্য হল আসল কুরআন তাই, যা হযরত আলী সংকলন করেছিলেন। হযরত আলী যে কুরআন সংকলন করেছিলেন সেটা সেই কুরআনের সম্পূর্ণ অনুরূপ

---

১. ইরানী ইনকিলাব ॥

২.মাওলানা মানযূর নো'মানী সাহেব বলেন ঃ আশ্চর্যের কথা, কুরআনে পরিবর্তনের কথা প্রকাশ করার পথে তাকিয়্যা অন্তরায় হল না; কিন্তু পরিবর্তনকারীদের নাম প্রকাশ করার পক্ষে তাকিয়্যা অন্তরায় হয়ে গেল!। (১২৫ পৃঃ) ॥

ছিল, যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি নাযিল হয়েছিল এবং বর্তমান কুরআন থেকে ভিন্নতর ছিল। সেটা হযরত আলীর কাছেই ছিল এবং তার পরে তার সন্তানদের মধ্য থেকে ইমামগণের কাছে ছিল। এখন সেটা ইমামে গায়েব তথা অন্তর্হিত ইমামের কাছে রয়েছে। তিনি যখন আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন সেই কুরআন প্রকাশ করবেন। এর আগে কেউ সেটা দেখতে পাবে না। এ প্রসঙ্গে উছূলে কাফীর নিম্নোক্ত দু'টি রেওয়ায়েত লক্ষ্যণীয় ঃ

(১) ইমাম বাকের বলেন[১] ঃ

ما ادعى احد من الناس ان جمع القران كله كما انزل الا كذاب وما جمعه وحفظه كما انزله الله الا على بن ابى طالب والائمة من بعده عليه السلام - (اصول كافى جـ/١. صفحه/٣٣٢)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দাবী করে যে, তার কাছে পূর্ণ কুরআন রয়েছে যেভাবে তা নাযিল হয়েছিল, সে মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলার নাযিল করা অনুযায়ী কুরআন কেবল আলী ইবনে আবী তালেবই এবং তার পরে ইমামগণ সংকলন করেছেন এবং সংরক্ষণ করেছেন।

(২) উক্ত গ্রন্থেই ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে আরও বর্ণিত আছে[২]ঃ

যখন ইমাম মেহ্দী আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন তিনি কুরআনকে আসল ও বিশুদ্ধরূপে পাঠ করবেন। তিনি কুরআনের সেই কপিটি বের করবেন, যা আলী (আঃ) সংকলন করেছিলেন।

সারকথা, শী'আ গ্রন্থাবলীর এসব রেওয়ায়েতে বর্তমান কুরআনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কথা বলা হয়েছে; বিশেষভাবে কতক রেওয়ায়েতে কুরআন থেকে হযরত আলী ও ইমামগণের নাম বাদ দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. পরিবর্তনের রেওয়ায়েত দু'হাজারেরও অধিক ।

স্বনামখ্যাত শী'আ মুহাদ্দিছ সাইয়েদ নেয়ামতুল্লাহ জাযায়েরী তার কোন কোন গ্রন্থে বলেছেন, যেমন তার কাছ থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরআনে পরিবর্তন ব্যক্তকারী রেওয়ায়েত সমুহের সংখ্যা দু'হাজারেরও অধিক। আমাদের একদল আলেম, যেমন শায়খ মুফিদ, মুহাক্কিক দামাদ ও আল্লামা মজলিসী এসব রেওয়ায়েত মশহুর বলে দাবী করেছেন। শায়খ তূসীও তিবইয়ান গ্রন্থে পরিষ্কার লিখেন যে, এসব রেওয়ায়েতের সংখ্যা অনেক বেশী। বরং আমাদের একদল আলেম, যাদের কথা পরে আসবে-দাবী করেছেন যে, এসব রেওয়ায়েত মুতাওয়াতির। (২২৭ পৃঃ)

৬. কুরআনে একটি সূরা ছিল যা বর্তমান কুরআনে নেই।

আল্লামা সাইয়েদ মাহমুদ শুকরী আলূসী (রহঃ) শাহ আব্দুল আযীয কৃত"তুহফায়ে ইছনা আশারিয়া" গ্রন্থের আরবীতে সারসংক্ষেপ লিখেছিলেন, যা تحتصر التحفة الاثنا عشريه নামে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে মিসরের খ্যাতনামা আলেম শায়খ

১. باب ان لم يجمع القران كله الا الائمة عليهم السلام ॥ ২. باب فضل القران ॥

মুহীউদ্দীন আল খতীব এর সম্পাদনা করেন এবং প্রান্তটীকা ও ভূমিকার সংযোজন সহকারে একে প্রকাশ করেন। এতে তিনি ইরানে লিখিত কুরআনের একটি পাণ্ডুলিপি থেকে নেয়া একটি সূরার (সূরা ওয়ালায়াতের) ফটোও প্রকাশ করেন, যা বর্তমান কুরআনে নেই। এ সম্পর্কে তিনি লিখেন ঃ "প্রফেসর নলডিকি (NOELDEKE) তার HISTORY OF THE COPIES OF THE QURAN গ্রন্থে এ সূরাটি শী'আ সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ دبستان مذهب (মুহসিন ফানী কাশ্মীরী কৃত ফারসী গ্রন্থ)-এর বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করেছেন। এর ফারসী গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ ইরানে প্রকাশিত হয়েছে। মিসরের একজন বড় আইন বিশেষজ্ঞ প্রফেসর মুহাম্মাদ আলী সউদী খ্যাতনামা প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ ব্রাউনের (BROWN) কাছে ইরানে লিখিত কুরআনের একটি পাণ্ডুলিপি কপি দেখিয়েছিলেন। তাতে এই সূরা ওয়ালায়াতও ছিল। তিনি এর ফটো নিয়ে নেন, যা মিসরের সাময়িকী "আল ফাতাহ" ৮৪২ সংখ্যার নবম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। নিম্নে তার ফটোকপি পেশ করা গেল ঃ কথিত সূরাতুল ওয়ালায়াত (سورة الولاية) -এর ফটোকপি

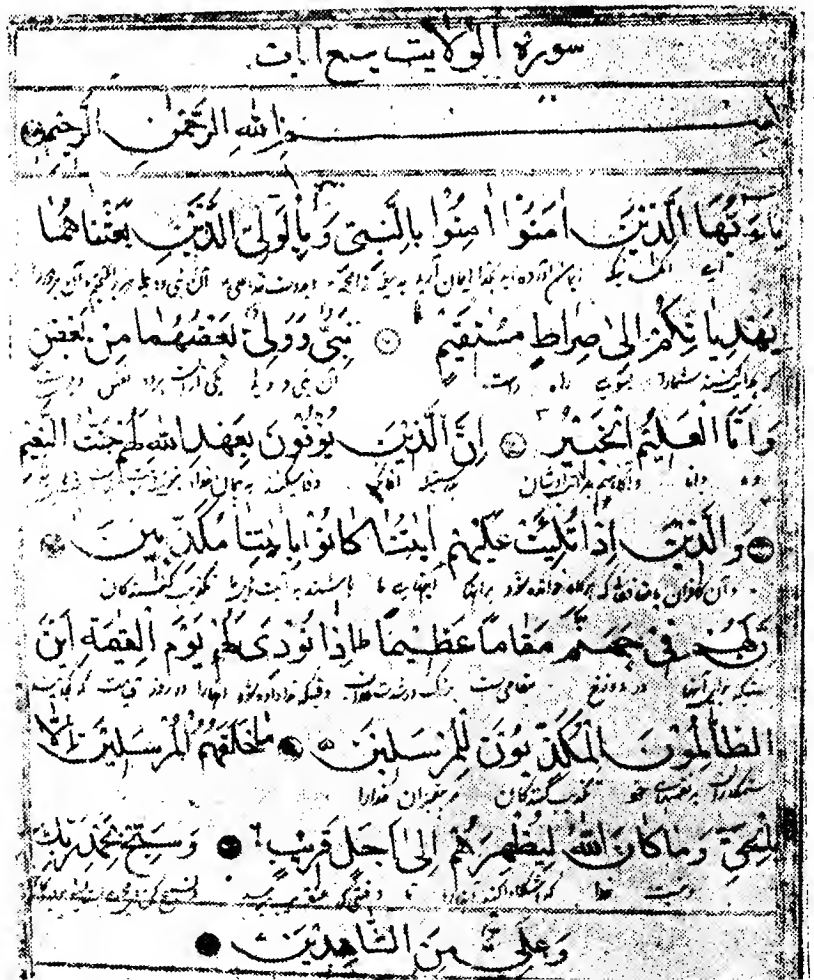
سورة الولايت سبع ايات

بسم الله الرحمن الرحيم

يا ايها الذين امنوا امنوا بالنبى وبالولى الذى بعثناهما
يهديانكم الى صراط مستقيم ۞ نبى وولى بعضهما من بعض
وانا العليم الخبير ۞ ان الذين يوفون بعهد الله لهم جنت النعيم
۞ والذين اذا تليت عليهم ايتنا كانوا بايتنا مكذبين ۞
اولئك فى جهنم مقاما عظيما اذا نودى لهم يوم القيمة اين
الظالمون المكذبون للمرسلين ۞ ما خلقهم الا للمرسلين الا
بالحق وما كان الله ليظهرهم الى اجل قريب ۞ وسبح بحمد ربك
وكفى به شهيدا ۞

শী'আদের আরও কিছু মৌলিক আকীদা

এখানে শী'আদের আরও তিনটি বিশেষ আকীদার কথা উল্লেখ করা হল।

১. তাকিয়্যা ঃ

তাকিয়্যা (تقيه) হল এক গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা, যাকে তাদের নিকট দ্বীনের এক গুরুত্বপূর্ণ রুক্ন মনে করা হত। এর অর্থ মানুষ তার মান ও মর্যাদা এবং জান ও মাল শত্রুর কবল হতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে যা কিছু অন্তরে আছে তার বিপরীত প্রকাশ করবে।

তাকিয়্যা সম্পর্কে ইমামগণের উক্তি ও কর্ম ঃ

উছূলে কাফীতে তাকিয়্যা সম্পর্কেও একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে। এ অধ্যায়ের একটি রেওয়ায়েত এই ঃ

عن ابى عمر الاعجمى قال قال لى ابو عبد الله عليه السلام يا ابا عمر تسعة اعشار الدين فى التقية ولا دين لمن لاتقية له - (اصول كافى جـ/٣. صفحـ/٣٠٧)

অর্থাৎ, আবূ ওমার আ'জামী রেওয়ায়েত করেন, ইমাম জা'ফর ছাদেক আমাকে বলেছেন- ধর্মের দশ ভাগের নয় ভাগ তাকিয়্যার মধ্যে নিহিত। যে তাকিয়্যা করে না, সে বেদ্বীন।

তাকিয়্যা সম্পর্কে আরও একটি রেওয়ায়েত নিম্নরূপ ঃ

হাবীব ইব্‌নে বিশরের রেওয়ায়েতে ইমাম জা'ফর ছাদেক বলেন ঃ আমি আমার পিতা ইমাম বাকেরের কাছে শুনেছি- তিনি বলতেন ঃ ভূপৃষ্ঠে কোন বস্তুই আমার কাছে তাকিয়্যা অপেক্ষা অধিক প্রিয় নয়। হে হাবীব, যে ব্যক্তি তাকিয়্যা করবে, আল্লাহ তাকে উচ্চতা দান করবেন, আর যে করবে না, আল্লাহ্ তার অধঃপতন ঘটাবেন। (উছূলে কাফী, ৪৮৩ পৃঃ)

উক্ত গ্রন্থের আরও একটি রেওয়ায়েত নিম্নরূপ ঃ

قال ابوجعفر عليه السلام التقية من دينى ودين آبائى ولا ايمان لمن لاتقية له - (اصول كافى جـ/٣. صفحـ/٣١١)

অর্থাৎ, ইমাম বাকের বলেন ঃ তাকিয়্যা আমার ধর্ম এবং আমার পিতৃপুরুষদের ধর্ম। যে তাকিয়্যা করে না, তার ধর্ম নেই।

তাকিয়্যার একটি ব্যাখ্যা ও তার স্বরূপ ঃ

জানা গেছে যে, শী'আরা অজ্ঞদের সামনে তাকিয়্যা সম্পর্কে বলে দেয় যে, তাদের মতে তাকিয়্যার অনুমতি কেবল তখন, যখন প্রাণের আশংকা বা এমনি ধরনের কোন গুরুতর বাধ্যবাধকতার সম্মুখীন হওয়া যায়। অথচ শী'আ রেওয়ায়েতে ইমামগণের এমন প্রচুর ঘটনা বিদ্যমান আছে, যাতে কোন বাধ্যবাধকতা এবং কোন সামান্য আশংকা ছাড়াই তারা তাকিয়্যা করেছেন, সুস্পষ্ট ভ্রান্ত বর্ণনা দিয়েছেন অথবা আপন কাজ দ্বারা মানুষকে ধোকা ও প্রতারণা দিয়েছেন। উছূলে কাফীতে ইমাম জা'ফর ছাদেকের এ ধরনের ঘটনা

বরাত সহকারে উল্লেখিত হয়েছে। তদুপরি উছূলে কাফীর তাকিয়্যা অধ্যায়ের নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটি দ্বারাও অনুরূপ প্রতীয়মান হয় ঃ

عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال التقية فى كل ضرورة وصاحبها اعلم بها حين تنزل به - (اصول كافى جـ/٣. صفحـ/٣١١)

অর্থাৎ, যুরারার রেওয়ায়েতে ইমাম বাকের (আঃ) বলেন ঃ তাকিয়্যা যে কোন প্রয়োজনে করা যায়। প্রয়োজন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই অধিক জ্ঞানী; অর্থাৎ, প্রয়োজন তা-ই; যাকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রয়োজন মনে করে।

তাকিয়্যা কেবল জায়েয নয়-ওয়াজিব ও জরূরী ঃ

বরং বাস্তব ঘটনা এই যে, শী'আ মাযহাবে তাকিয়্যা কেবল জায়েয নয়; বরং অত্যাবশ্যকীয় এবং ঈমানের অঙ্গ। শী'আদের মূলনীতি চতুষ্টয়ের অন্যতম من لايحضره الفقية গ্রন্থে রেওয়ায়েত আছে যে,

قال الصادق عليه السلام لو قلت ان تارك التقية كتارك الصلوة لكنت صادقا وقال عليه السلام لادين لمن لاتقية له -

অর্থাৎ, ইমাম জাফর ছাদেক (আঃ) বলেছেন- যদি আমি বলি যে, তাকিয়্যা বর্জনকারী নামায বর্জনকারীর অনুরূপ (গোনাহগার), তবে এ কথায় আমি সত্য হব। তিনি আরও বলেছেন ঃ যার তাকিয়্যা নেই, তার ধর্ম নেই।

সম্পূর্ণ বিনা প্রয়োজনে ইমামগণের তাকিয়্যা করার দৃষ্টান্ত ঃ

কিতাবুর রওযার একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এর রাবী ইমাম জা'ফর ছাদেকের খাটি মুরীদ মুহাম্মাদ ইব্‌নে মুসলিম। তিনি বর্ণনা করেন ঃ

دخلت على ابى عبد الله عليه السلام وعنده ابو حنيفة فقلت له جعلت فداك رأيت رؤية عجيبة فقال يا ابن مسلم هاتها فان العالم بها جالس واومى بيده الى ابى حنيفة -

অর্থাৎ, আমি একদিন ইমাম জা'ফর ছাদেকের খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন তার কাছে আবূ হানীফাও উপবিষ্ট ছিলেন। আমি (ইমাম জা'ফর ছাদেকের খেদমতে) আরয করলাম ঃ আমি আপনার জন্যে উৎসর্গ, আমি একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। তিনি বললেন ঃ ইব্‌নে মুসলিম, তোমার স্বপ বর্ণনা কর। স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জ্ঞানী একজন আলেম এক্ষণে এখানে উপস্থিত আছেন। তিনি হাত দ্বারা আবূ হানীফার দিকে ইশারা করলেন (যে, ইনি)।

এরপর ইব্‌নে মুসলিম বলেন ঃ আমি আমার স্বপ্ন বর্ণনা করলাম, যা শুনে আবূ হানীফা তার ব্যাখ্যা বললেন। তাঁর ব্যাখ্যা শুনে ইমাম জা'ফর ছাদেক বললেন ঃ আল্লাহর কসম! হে আবূ হানীফা, আপনি সম্পূর্ণ ঠিক বলেছেন। ইব্‌নে মুসলিম বলেনঃ এরপর আবূ

হানীফা তার কাছ থেকে চলে গেলেন। আমি আরয করলাম ঃ আমি আপনার প্রতি উৎসর্গ, এই নাছেবীর[১] ব্যাখ্যা আমার কাছে ভাল লাগেনি। ইমাম জা'ফর ছাদেক বললেন ঃ হে ইব্‌নে মুসলিম, এতে তোমার দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। আমাদের ব্যাখ্যা তাদের ব্যাখ্যা থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। আবূ হানীফা যে ব্যাখ্যা করেছে, তা ঠিক নয়। ইব্‌নে মুসলিম বলেনঃ আমি আরয করলাম, আমি আপনার প্রতি উৎসর্গ, তা হলে আপনি 'ঠিক বলেছেন' বলে এবং কসম খেয়ে তার ব্যাখ্যার সত্যায়ন করলেন কেন ? ইমাম বললেন ঃ আমি কসম খেয়ে তার ভ্রান্তির সত্যায়ন করেছিলাম। (১৩৭ পৃঃ)

২. কিত্‌মান ঃ

"কিত্‌মান" অর্থ আসল আকীদা, মাযহাব ও মত গোপন করা এবং অন্যের কাছে প্রকাশ না করা। তাকিয়্যার অর্থ কথায় ও কাজে বাস্তব ঘটনার বিপরীত অথবা আপন আকীদা, মাযহাব ও মতের বিপরীত প্রকাশ করা এবং এভাবে অপরকে ধোকা ও প্রতারণায় লিপ্ত করা। শী'আদের মতে তাদের ইমামগণ সারা জীবন এ শিক্ষা মেনে চলেছেন।

কিত্‌মান সম্পর্কে ইমামগণের উক্তি ও কর্ম ঃ

উছূলে কাফীতে কিত্‌মান অধ্যায়ে ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তার শাগরেদ সোলাইমানকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

قال ابو عبد الله عليه السلام يا سليمان انكم على دين من كتمه اعزه الله ومن اذاعه اذله الله - (اصول كافى جـ/٣. صفحـ/٣١٥)

অর্থাৎ, তোমরা এমন ধর্মের উপর রয়েছ যে, যে ব্যক্তি একে গোপন রাখবে, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা ইজ্জত দান করবেন। আর যে এ ধর্মকে প্রকাশ ও প্রচার করবে, আল্লাহ্ তাকে হেয় ও লাঞ্ছিত করবেন।

উক্ত গ্রন্থে ইমাম জা'ফর ছাদেকের পিতা ইমাম বাকের থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বিশেষ শী'আদেরকে বলেন ঃ

والله ان احب اصحابى الى اورعهم وافقههم واكتمهم لحديثنا - (اصول كافى جـ/٣. صفحـ/٣١٧)

অর্থাৎ, খোদার কসম! আমার সহচরদের (শাগরেদ ও মুরীদদের) মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় সেই, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরহেযগার এবং আমাদের কথা বেশী গোপন রাখে।

১. "নাছেবী" শী'আদের পরিভাষায় একটি ধর্মীয় গালী। তাদের মতে যে ব্যক্তি আবূ বকর ও ওমরকে খলীফা বলে মানে এবং শী'আগণ হযরত আলী (রাঃ)-এর জন্য যে ধরনের ইমামতে বিশ্বাস রাখে অনুরূপ বিশ্বাস না রাখে সে হল নাছেবী; যদিও হযরত আলী (রাঃ)-কে সত্য খলীফা বলে জানে। আল্লামা মজলিসী 'হাক্কুল এয়াকীন' গ্রন্থে লিখেছেন যে, তাদের মতে আখেরাতে নাছেবীদের পরিণতি তা-ই হবে, যা কাফেরদের হবে। অর্থাৎ, তারাও জাহান্নামে অনন্তকাল আযাব ভোগ করবে। (২১১ পৃষ্ঠা)কুলাইনীর 'আর রওযা' গ্রন্থে আছে, নাছেবীদের জন্যে কারও শাফা'আতও কবূল হবে না। (৪৯ পৃঃ)॥

কিতমান ও তাকিয়্যা কোন্ প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে ?

কারও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই এবং এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, হযরত আলী মুর্তযা (রাঃ) থেকে শুরু করে শী'আদের একাদশতম ইমাম হাসান আসকারী পর্যন্ত কোন ইমাম মুসলমানদের কোন বড় সমাবেশে ইমামতের বিষয়টি উত্থাপন করেননি। হজ্জ উপলক্ষে মুসলমানদের বিশ্বজনীন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে মুসলিম-বিশ্বের প্রতিটি কোন্ থেকে মুসলমানগণ আগমন করেন। এতে কোন ইমাম কর্তৃক ইমামতের বিষয় বর্ণনা করার কথাও কার জানা নেই। এমনিভাবে দুই ঈদের সমাবেশ ও জুমুআর সমাবেশে বিভিন্ন অঞ্চল ও শহরের মুসলমানগণ সমবেত হয়। মুসলমানদের এমনি ধরনের কোন সম্মেলনে কোন ইমাম ইমামতের মসআলাটি বর্ণনা করেননি, যা শী'আ মাযহাবে তাওহীদ ও রেসালাতের আকীদার মতই ধর্মের ভিত্তি এবং নাজাতের শর্ত। শী'আদের কোন ইমাম এ ধরনের কোন সমাবেশে ও ইমামত দাবী করেননি। এবং সাধারণ মুসলমানকে তা কবূল করার এবং তার ভিত্তিতে বাই'আত করার দাওয়াতও দেননি। বরং এর বিপরীতে স্বয়ং হযরত আলী মুর্তযার কর্মপন্থা খলীফাত্রয়ের চব্বিশ বছর কালীন খেলাফত আমলে এই দেখা গেছে যে, অন্য সকল মুসলমানের ন্যায় তিনিও তাঁদের সাথে সহযোগিতা করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁর পরে হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রাঃ) হযরত মু'আবিয়ার খেলাফত আমলে কখনও কোন সমাবেশে নিজেদের ইমামত দাবী ও ঘোষণা করেননি এবং তাঁর পিছনে ও তাঁর নিযুক্ত ইমামের পিছনে সকলের সামনে নামায পড়েছেন। ইছনা-আশারী অবশিষ্ট সকল ইমামের (চতুর্থ ইমাম জয়নুল আবেদীন থেকে শুরু করে একাদশতম ইমাম হাসান আসকারী পর্যন্ত সকলের) এহেন আচরণ সকলের জানা আছে। ইমামগণের এই উপর্যুপরি কর্মপন্থা শী'আ মাযহাবের ভিত্তি ও বুনিয়াদ- ইমামত বাতিল ও অমূলক হওয়ার এমন উজ্জ্বল প্রমাণ যে, এর চেয়ে উজ্জ্বল প্রমাণ ও সাক্ষ্য কল্পনাও করা যায় না। তাই ইমামত আকীদা ও শী'আ মাযহাবকে রক্ষা করার জন্যে তাকিয়্যা ও কিত্‌মান আকীদা রচনা করেছে। তারা এই বলতে বাধ্য হয়েছে যে, আমাদের ইমামগণের প্রতি স্বয়ং আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ ছিল যে ইমামত আকীদা প্রকাশ করবে না- একে গোপন রাখবে, অর্থাৎ, কিত্‌মান করবে। তাই তাঁরা ইমামত আকীদা সাধারণ মুসলমানের সামনে এবং জনসমাবেশে বর্ণনা করেননি। একই কারণে তারা সারা জীবন নিজেদের বিবেক ও আকীদার বিপরীত আমল করতে থাকেন।[১]

৩. প্রায়শ্চিত্তের আকীদা ঃ

শী'আদের প্রায়শ্চিত্তের আকীদা (عقيدة كفاره) হুবহু খৃষ্টানদের প্রায়শ্চিত্ত আকীদার অনুরূপ। আল্লামা বাকের মজলিসী ইমাম জা'ফর ছাদেকের বিশেষ মুরীদ মুফাসসাল ইবনে ওমরের এক প্রশ্নের জওয়াবে বলেন ঃ

"হে মুফাসসাল, রাসূলে খোদা দু'আ করেছেন-"হে খোদা, আমার ভাই আলী ইব্‌নে আবী তালেবের শী'আ এবং আমার সেই সন্তানদের শী'আ যারা আমার ভারপ্রাপ্ত-তাদের

১. ইরানী ইনকিলাব। ॥

অগ্রপশ্চাৎ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সময়ের সকল গোনাহ্ আপনি আমার উপর চাপিয়ে দিন এবং শী'আদের গোনাহের কারণে পয়গম্বরগণের মধ্যে আমাকে অপমানিত করবেন না।" এ দু'আর ফলস্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা সকল শী'আর গোনাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (রাঃ)-এর উপর চাপিয়ে দিয়েছেন, অতঃপর সেই সকল গোনাহ্ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কারণে মার্জনা করেছেন। (হাক্কুল এয়াকীন, ১৪৮ পৃঃ)

এরপর এ রেওয়ায়েতেই আরও আছে- মুফাসসাল প্রশ্ন করলঃ যদি আপনাদের শী'আদের মধ্য থেকে কেউ এই অবস্থায় মারা যায় যে, তার যিম্মায় কোন মু'মিন ভাইএর কর্জ থাকে, তবে তার কি পরিণতি হবে ? ইমাম জা'ফর ছাদেক বললেন ঃ যখন ইমাম মেহ্দী আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন সর্বপ্রথম সারা বিশ্বে এই ঘোষণা করবেন যে, আমাদের শী'আদের মধ্যে যদি কারও যিম্মায় কারও কর্জ থাকে, তবে সে আসুক এবং আমার কাছ থেকে উসূল করুক। অতঃপর তিনি সকল কর্জদারদের কর্জ আদায় করবেন। (১৪৮ পৃঃ)

শী'আদের সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহ্র ফতওয়া ঃ

যদি কোন লোক হযরত আলী (রাঃ) কে অন্য সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, যেমন তাফযীলিয়া শী'আগণ বলে থাকেন, তাহলে এতটুকু বিশ্বাসের কারণে সে কাফের হয়ে যায় না। কিন্তু বর্তমান কালে শী'আ সম্প্রদায় সাহাবায়ে কেরামকে কাফের বলা, কুরআনকে বিকৃত বলা, ইমামতের আকীদার মাধ্যমে খতমে নবুওয়াতকে অস্বীকার করা, প্রভৃতি নানাবিধ কারণে কাফের আখ্যায়িত হবে। আহসানুল ফাতাওয়া গ্রন্থকার বলেন, "বর্তমান কালের শী'আ সম্প্রদায়ের আকীদা কুফ্রী এতে কোন সন্দেহ নেই।"

ইসমাঈলিয়া শী'আ

ইমামিয়া শী'আদের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হল ইসমাঈলিয়া শী'আ। বিভিন্ন মুসলিম দেশে এদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্য আফ্রিকা, সিরিয়া ও পাকিস্তানে এদের কিছু সংখ্যক লোক দেখা যায়। হিন্দুস্তানে এদের সংখ্যা প্রচুর। এই ফিরকা ইসমাঈল ইব্নে জা'ফর ছাদেক ইব্নে বাকের-এর দিকে সম্পৃক্ত। ইছনা আশারিয়াগণ জা'ফর ছাদেকের পর তার ছোট পুত্র মূসা কাযেমকে ইমাম মানেন। কিন্তু ইসমাঈলী সম্প্রদায় জা'ফর ছাদেকের পর তার বড় পুত্র ইসমাঈলের ইমামত এবং ইসমাঈলের পর তার পুত্র মুহাম্মাদ আল-মাক্তূমের ইমামতে বিশ্বাসী।

ইসমাঈলিয়া শী'আদেরকে "বাতিনিয়া"ও বলা হয়। কারণ তাদের মতে ইমাম অধিকাংশ সময় বাতিন বা গোপন থাকেন। একমাত্র ক্ষমতা অর্জন হওয়ার সময় তারা আত্মপ্রকাশ করে থাকেন। "বাতিনিয়া" নামকরণের আর একটা রহস্য এই যে, তাদের আকীদা হল শরী'আতের একটা জাহির এবং একটা বাতিন থাকে। সাধারণ লোকেরা জাহির সম্বন্ধে অবগত থাকেন আর ইমামগণ জাহির বাতিন সবটা সম্বন্ধে অবগত থাকেন। ইছনা আশারিয়া শী'আগণও এ আকীদায় একমত।[১]

---

১. ماخوذ از رد شیعیت. جناب مولانا محمد جمال صاحب استاد تفسیر دار العلوم دیوبند و تاریخ المذاهب الاسلامیة. ابو زهره ॥

যায়দিয়া শী'আ

ইমামিয়া শী'আদের তৃতীয় বৃহত্তম দল হল "যায়দিয়া"। এরা যায়েদ ইব্নে আলী ইব্নে হুসাইন ইব্নে আলী (রাঃ)-এর দিকে সম্পৃক্ত। হযরত আলী মুর্তযা থেকে নিয়ে চতুর্থ ইমাম আলী ইব্নে হুসাইন পর্যন্ত ব্যক্তিবর্গের ইমামত সম্পর্কে তারা এবং ইছনা আশারিয়া সম্প্রদায় একমত। এরপর ইছনা আশারিয়াগণ তার পুত্র ইমাম বাকেরকে ইমাম মানেন এবং তার পরে তার বংশধরের মধ্য থেকে আরও সাতজনকে ইমাম মানেন। কিন্তু যায়দিয়াগণ ইমাম আলী ইব্নে হুসাইন অর্থাৎ, ইমাম জয়নুল আবেদীনের দ্বিতীয় পুত্র যায়েদ শহীদকে ইমাম মানেন। অতঃপর তারই আওলাদ ও বংশের মধ্যে ইমামত অব্যাহত থাকার বিশ্বাস রাখেন। এ ছাড়া দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে ইমামের মান ও মর্তবা সম্পর্কেও কিছু মতভেদ আছে।

প্রথম দিকে "যায়দিয়া" সম্প্রদায় আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কাছাকাছি সম্প্রদায় হিসেবে গণ্য হত। তারা কোন সাহাবীর তাক্ফীর করত না। তবে পরবর্তীতে অধিকাংশ "যায়দিয়া"-র আকীদা-বিশ্বাস ইছনা আশারিয়াদের ন্যায় হয়ে যায়। বর্তমানে সহীহ আকীদা-বিশ্বাস সম্পন্ন "যায়দিয়া" ইয়ামান প্রভৃতি দেশে কিছু সংখ্যক পাওয়া যায়।

জাব্রিয়া

(الجبريه)

"জাব্রিয়া" মতবাদ (Fatalism বা অদৃষ্টবাদ) কাদ্রিয়া দলের মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। জাব্রিয়া দলের মতবাদ অনুসারে ঘটমান সবকিছুই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পূর্বেই নির্ধারিত এবং সে নির্ধারণ অনুযায়ী সবকিছু সংঘটিত হয়। এ ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছার কোন দখল নেই। আর যেহেতু সকল জিনিসই আল্লাহ্র হুকুমের অনুগত সেহেতু কোনও জিনিসই মানুষের ইচ্ছায় পরিবর্তিত হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা ভবিষ্যত সম্পর্কে অবগত। তাই ভবিষ্যত ঘটনাবলী শুরু থেকেই আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ীই নির্ধারিত হয়ে আছে। জাব্রিয়াদের মতে বান্দার ক্রিয়া-কলাপ তাদের নিজেদের ইচ্ছাধীন নয়, বরং ইচ্ছা-অনিচ্ছা সবই আল্লাহ্র ইচ্ছার সাথে যুক্ত। অর্থাৎ, বান্দার কৃত সব ক্রিয়াকলাপই প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্র কর্ম। জাব্রিয়া মতবাদটি কাদ্রিয়া মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। কাদ্রিয়া মতবাদে বান্দাকে তার নিজ কর্মের স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্তা ও সংঘটনকর্তা বলে স্বীকার করা হয়। পক্ষান্তরে জাবরিয়া মতবাদ অনুসারে বান্দাকে তার নিজ ক্রিয়া কলাপের ক্ষেত্রে পূর্ণ বাধ্যবাধকতার অধীন মনে করা হয়।

জাব্রিয়াদের মৌলিক শ্রেণী ঃ

জাব্রিয়াদের মৌলিক দুটি শ্রেণী। একটি পরিপূর্ণ জাব্র বা বাধ্যবাধকতার প্রবক্তা। তাদেরকে বলা হয় খালেস জাব্রিয়া (الجبرية الخالصة)। তাদের মতে মানুষ এবং জড় বস্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এরা জাব্রিয়াদের মধ্যে কট্টরপন্থী বলে পরিচিত। অপর একটি শ্রেণী রয়েছে যাদেরকে জাব্রিয়া মুতাওয়াস্সিতা (الجبرية المتوسطة) বা মধ্যপন্থী

জাব্‌রিয়া বলা হয়। এ দলটি একথা স্বীকার করে যে, বান্দার মধ্যে কাজ করার শক্তি সামর্থ আছে। কিন্তু একথা স্বীকার করে না যে, এই শক্তি কর্মের উপর কোনও প্রভাব ফেলতে পারে বা কর্মে ব্যয়িত হতে পারে। এ দলটি কাছ্‌ব (كسب/কাজ করার শক্তি)-এর কথা স্বীকার করলেও জাব্‌র -এর আওতা থেকে বের হতে পারেনি। কারণ এই কাছ্‌ব এর অর্থের মধ্যে জাব্‌র বিরুদ্ধ কোনও বিষয় নেই।

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত যদিও একথা স্বীকার করে যে, বান্দার ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত সকল ক্রিয়াকলাপই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত ও বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু সাথে সাথে তারা এ কথারও প্রবক্তা যে, তারা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত আংশিক ইচ্ছা শক্তিকে সকল কাজে ব্যবহার করতে পারে।

জাব্‌রিয়াদের উপদল ঃ

কোন কোন লেখকের মতে নিম্নোক্ত দলগুলি জাব্‌রিয়াদের উপদল ঃ[১]

১. নাজ্জারিয়া (النجارية) এরা হুসাইন ইব্‌নে মুহাম্মাদ আন-নাজ্জার (মৃত ২৩০ হিঃ)এর অনুসারী। হুসাইন এর অনুসারী হওয়ার কারণে কেউ কেউ এদের নাম হুসাইনিয়া বলে থাকেন।

২. দিরারিয়াহ্ (الضرارية) এরা দিরার ইব্‌নে আম্‌র ও হাফ্‌স আল-ফর্‌দ এর অনুসারী।

৩. কুল্লাবিয়া (الكلابية)

আল-মিলাল ওয়ান নিহাল গ্রন্থকার-এর বর্ণনা মতে জাহ্‌মিয়া দলটি জাবরিয়াদেরই অন্তর্ভুক্ত।

জাব্‌রিয়্যাদের মৌলিক আকীদাসমূহ ঃ

কারী মুহাম্মাদ তাইয়্যেব সাহেবের মতে জাব্‌রিয়্যাদের মৌলিক আকীদা সমূহ নিম্নরূপঃ

১. মানুষ পাথর ও জড়পদার্থের মত নিষ্ক্রীয় বা বাধ্যবাধকতার আওতাধীন। যাদের নিজ কর্মে কোন ইচ্ছা বা স্বাধীন ক্ষমতা নেই। ফলে তাদের ছওয়াব বা শাস্তি কোন কিছুই হবে না।

২. সম্পদ আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয় বস্তু।

৩. আল্লাহ কর্তৃক তাওফীক বান্দার ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার পর হয়ে থাকে।

---

১. কারী মুহাম্মদ তাইয়্যেব সাহেবের মতে জাবরিয়্যাহ একটি স্বতন্ত্র দল এবং জাব্‌রিয়াদের উপদল সমূহ নিম্নরূপঃ

১. মুজতার্‌রিয়্যাহ (مضطرية)	২. আফআলিয়্যাহ (افعالية)
৩. মাইয়্যাহ (معية)	৪. মা'যুবিয়্যাহ (معزوية)
৫. মাজাযিয়্যাহ (مجازية)	৬. মুতমাইন্নাহ (مطمئنة)
৭. কাছলিয়্যাহ (كسلية)	৮. সাবিকিয়্যাহ (سابقية)
৯. হাবীবিয়্যাহ (حبيبية)	১০. খাওফিয়্যাহ (خوفية)
১১. ফিক্‌রিয়্যাহ (فكرية)	১২. হাস্‌সাসিয়্যাহ (حساسية) ॥

৪. তারা শারীরিক মে'রাজকে অস্বীকার করে।

৫. তারা রূহানী জগতে আল্লাহ কর্তৃক অঙ্গীকার গ্রহণের বিষয়কে অস্বীকার করে।

৬. তারা জানাযা নামায ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করে।

কাদরিয়া সম্প্রদায়

(القدرية)

নামঃ

এই সম্প্রদায়টির নাম কাদরিয়া। আবার কেউ কেউ বলেছেনঃ কাদরিয়া এবং মু'তাযিলা একই সম্প্রদায়ের নাম। 'আল-মিলাল ওয়ান নিহাল' গ্রন্থের রচয়িতা শাহ্‌রাস্‌তানী (রহঃ) এবং 'আল-ফার্‌কু বাইনাল ফিরাক' গ্রন্থের রচয়িতা আবদুল কাহের আল-বাগদাদী (রহঃ)-ও অনুরূপ মত পোষণ করেন।

শাহ্‌রাস্‌তানী (রহঃ) বলেছেনঃ[১] এরা নিজেদেরকে "আসহাবুল আদ্‌ল ওয়াত তাওহীদ" নামে পরিচয় দেয়। আবার কাদরিয়া ও আদ্‌লিয়্যা উপাধিতেও স্মরণ করে। বিপুল সংখ্যক আলিম মু'তাযিলা সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র মাযহাব হিসেবে গণ্য করেন, তারা তাদেরকে কাদরিয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না। তাছাড়া এই উভয় সম্প্রদায়ের উদ্ভবগত প্রেক্ষাপট এবং প্রতিষ্ঠাতাও এক নয়। যেমন মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিল ইব্‌নে আতা (واصل بن عطا) আর কাদরিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হল সীস্‌ওয়াহ্ (سيسوية)। তবে এখানে এমন কিছু আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারাও আছে যেগুলো উভয় সম্প্রদায়ই সমানভাবে পোষণ করে, তাই কেউ যদি এসব আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারার প্রেক্ষিতে এই দুই সম্প্রদায়কে একই সম্প্রদায় মনে করেন তাহলে তার অবকাশ আছে।

নামকরণ রহস্য ঃ

ইমাম আবূ যোহ্‌রা (রহঃ) বলেছেন[২] এই সম্প্রদায়টিকে 'কাদরিয়া' শব্দে নামকরণ করায় অনেক ঐতিহাসিকও বিস্ময়াভিভূত হয়েছেন। কারণ, তারা 'কদর'কে অস্বীকার করে। তাহলে তারাই আবার কাদরিয়া হল কি করে ? কেউ কেউ বলেছেনঃ কোন সম্প্রদায়কে তাদের দাবীর বিপরীত শব্দে নাম রাখতেও কোন বাঁধা নেই। অনেক বস্তুরই তো বিপরীতার্থক শব্দ দিয়ে নাম রাখা হয়। ইব্‌নে কুতায়বা (রহঃ) ও ইমামুল হারামাইন (রহঃ) বলেছেনঃ[৩] হকপন্থী মুসলমানগণ তাদের কাজ-কর্মসহ সকল বিষয়াদির উৎস আল্লাহ তা'আলাকেই মনে করে থাকে। মনে করে থাকে, সব কিছু তাঁরই পক্ষ থেকে। অথচ ওই মূর্খরা (কাদরিয়াগণ) নিজেদের সকল কর্ম-কাণ্ডের উৎস মনে করে থাকে নিজেদেরকেই। অতএব যারা কোন কিছুকে নিজেদের দিকে সম্পৃক্ত না করে বরং নিজেদেরকে তা থেকে আলাদা করে নেয় এবং অন্যের দিকে সেটাকে সম্পৃক্ত করে, তাদের

---

১. الملل والنحل. مصر . ١٣٩٦هـ ١٩٧٦م جـ١/ صفحه/٤٠ ॥

২. تاريخ المذاهب الاسلامية . دار الفكر العربى . جـ١/ صفحه/١١٢ ॥

৩. فتح الملهم . جـ١/ بجنور . الهند. صفحه/١٦٠ ॥

তুলনায় যারা কোন কিছুকে নিজেদের দিকে সম্পৃক্ত করে এবং নিজেদেরকে সেটার স্রষ্টা বলে তাদেরকেই সেই নামে অভিহিত করা উত্তম। আর এই দুই মনীষী একথা তখন-ই বলেছেন যখন কোন কোন কাদরিয়া দাবী করে বসে, আমরা কাদরিয়া নই বরং তোমরাই কাদরিয়া; কেননা, তোমরাই 'কদর' এ বিশ্বাসী। আবার কোন কোন লেখক এও বলেছেনঃ মূলতঃ এদেরকে এই নামটি তাদের বিরোধীরাই দিয়েছে, যাতে তাদের সম্পর্কে القدرية مجوس هذه الامة হাদীছটি যথাযথভাবে প্রযোজ্য হতে পারে।

উৎপত্তি ও প্রেক্ষাপট ঃ

এই সম্প্রদায়টির উদ্ভব ঘটে সাহাবায়ে কেরামের শেষ যুগে খোলাফায়ে রাশেদার শেষ আমলে এবং উমাইয়া শাসনামলের প্রথম দিকে। 'ফাত্হুল মুল্হিম' গ্রন্থকার বলেছেনঃ কথিত আছে, কা'বা শরীফে আগুন লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সর্ব প্রথম এই ফিৎনার সূচনা হয়। তখন জনৈক ব্যক্তি মন্তব্য করে - احترقت بقدر الله - অর্থাৎ, এটা আল্লাহর ইচ্ছায় (قدر অনুসারে) ঘটেছে। অন্যরা বললঃ لم يقدر الله هذا - অর্থাৎ, আল্লাহ্ এরূপ পরিকল্পনা নিতে পারেন না। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই কাদরিয়া মতবাদটি ছড়িয়ে পড়ে। অথচ খোলাফায়ে রাশেদার যুগে কোন ব্যক্তিই তাকদীরকে (قدر) অস্বীকার করতো না।

প্রতিষ্ঠাতা ঃ

শাইখুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়া (রহঃ) তদীয় গ্রন্থ 'শরহুল ঈমান'-এ বলেছেনঃ[১] বসরার অধিবাসী এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম ইরাকে এই মতবাদের সূচনা করে। অগ্নিপূজক বংশোদ্ভূত এই লোকটির নাম হল সীস্ওয়াহ (سيسوية)! আল্লামা আত-তূফী (الطوفى) (রহঃ) شرح تائية شيخ الاسلام ابن تيمية গ্রন্থে লিখেছেনঃ কাদরিয়া সম্প্রদায়ের এই উদ্ভাবকের নাম সুসান (سوسن)। সিররুল উয়ূন গ্রন্থে (পৃঃ ২২) আছে,[২] কাদ্রিয়া মতবাদ বিষয়ে সর্ব প্রথম যে ব্যক্তি কথা তোলে সে হল ইরাকের এক খৃষ্টান। তারপর সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং পুনরায় খৃষ্টান হয়ে যায়।

'আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল' গ্রন্থের টীকায় আছে[৩] যে, মা'বাদ আল-জুহানী (معبد الجهنى) এই মতবাদ গ্রহণ করে বসরা অধিবাসী আসাভিরা নামক একটি প্রাচীন সম্প্রদায়ের জনৈক খৃষ্টানের কাছ থেকে। তার নাম আবূ ইউনূস সান্সওয়াহ্ বা সুসান (سنسوية/سوسن) মা'বাদ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী থেকে গ্রহণ করে গায়লান আদ-দিমাশ্কী। তার দ্বারা এই চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়ে। বসরায় প্রচার লাভ করে মা'বাদের মাধ্যমে। আর এ কারণেই মুসলিম শরীফের কিতাবুল ঈমানের প্রারম্ভে বর্ণনা এসেছে যে, বসরায় 'কদর' সম্পর্কে সর্ব প্রথম কথা তুলেছে মা'বাদ আল-জুহানী। সে-ই সমগ্র ইরাকে এর প্রচার কার্য পরিচালনা করে। আর গায়লান আদ-দিমাশকী এই চিন্তাধারার প্রচার চালায় দামেশকে।

---

১. ॥ فتح الملهم . جـ/١ . بجنور . الهند . صفحه/١٦٠

২. ॥ تاريخ المذاهب الاسلامية . دار الفكر العربى . جـ/١ . صفحه/٢٢

৩. ॥ الملل والنحل . مصر . ١٣٩٦هـ ١٩٧٦م جـ/١ . صفحه/٣٣

কাদরিয়া সম্প্রদায়ের দল উপদল সমূহ ঃ

আল্লামা আব্দুল কাহের আল-বাগদাদী (রহঃ) 'আল-ফার্কু বাইনাল ফিরাক' গ্রন্থে কাদরিয়া সম্প্রদায়ের ২২টি দল উপদলের কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে দুটি হল জঘন্য কাফের সম্প্রদার্য়ের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে শাহরাস্তানী বলেছেন, কাদরিয়া সম্প্রদায় মোট ১২ দলে বিভক্ত। তিনি কিছু কিছু ফিরকার কথা উল্লেখ করেননি আবার এক প্রকারকে অন্য প্রকারের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। বর্ণিত ফিরকা বা প্রকারগুলো হল নিম্নরূপ-

১. ওয়াসিলিয়্যাহ্ (الواصلية)[১]
২. আল-'আম্রাবিয়্যাহ্ (العمروية)[২]
৩. আছ-ছুমামিয়্যাহ্ (الثمامية)[৩]
৪. আল-মারিসিয়্যাহ্ (المريسية)[৪]
৫. আল-মা'মারিয়্যা (المعمرية)[৫]
৬. আন-নাজ্জামিয়্যা (النظامية)[৬]

---

১. এই ফিরকার অনুসারীরা মূলতঃ ওয়াসিল ইব্ন আতার অনুসারী। আর ওয়াসিল হল মু'তাযিলা ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা এবং মা'বাদ আল-জুহানী ও গায়লান আদ-দিমাশকীর পর সেই হল এই ফিরকার দা'ঈ বা প্রচারক। মৃত্যু সন - ১৩১ হিঃ ॥

২. এই ফিরকার অনুসারীরা হল বনূ তামীমের আযাদকৃত গোলাম (مولى) আম্র ইব্ন উবায়দ ইব্ন বাবের অনুসারী। শাহ্রাস্তানী অবশ্য এদেরকে প্রথম ফিরকা (الواصلية) -এর মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করেছেন ॥

৩. এরা হল ছুমামা ইব্নে আশরাস আন-নুমাইরী-র শিষ্য। ছুমামা বাদশা মামূন, মু'তাসিম ও ওয়াসিক বিল্লাহ'র শাসনামলে একজন গোত্রপতি ছিলেন। কথিত আছে, এই ছুমামা-ই বাদশাহ মামূনুর রশীদকে আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন এবং মু'তাযিলা হওয়ার প্রতি আহবান করেছিলেন। তার মৃত্যু সনঃ ২১৩ হিঃ ॥

৪. 'মুরজিয়ায়ে বাগদাদ' নামে পরিচিত এই দলটি হল বিশ্র আল-মারিসির অনুসারী। ইসলামী ফিক্হ এর ক্ষেত্রে বিশ্র অনুসরণ করতেন হযরত ইমাম কাযী আবূ ইউসুফ (রহঃ)কে। তারপর তিনি যখন কুরআন মাখলূক (القران مخلوق) এই মর্মে রায় প্রকাশ করলেন তখন ইমাম আবূ ইউসুফ তাকে বর্জন করেন। শাহ্রাস্তানী অবশ্য কাদরিয়াদের সাথে এদের কথা আলোচনা করেননি। তবে আব্দুল কাহের আল-বাগদাদী এদেরকে কাদ্রিয়া নয়-এমন মুর্জিয়াদের সাথে উল্লেখ করেছেন ॥

৫. এটি হল মা'মার ইব্ন আব্বাদ আস-সালামীর অনুসারী দল। তিনি ছিলেন 'মুল্হিদ' শ্রেণীর মাথা এবং কাদ্রিয়াদের লেজুড় স্বরূপ। এ অভিমত আবদুল কাহের বাগদাদীর। তিনি মৃত্যু বরণ করেন হিজরী ২২০ সালে ॥

৬. নাজ্জাম নামে পরিচিত আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন সাওয়ার এর অনুগত দল এটা। আবূ ইসহাকও দার্শনিক (فلاسفة) দের মতো (جزء لايتجزى বা অবিভাজ্য অণু) অস্বীকার করতো। তিনি দার্শনিকদের প্রচুর গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন। তারপর দার্শনিকদের বিভিন্ন মত ও দর্শনকে মু'তাযিলাদের মত ও দর্শনের সাথে মিশ্রিত করে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বসরায় তসবীর দানা গাথার কাজ করতেন বিধায় 'নাজ্জাম' (অর্থাৎ, যে দানা শৃঙ্খলিত করে) নামে পরিচিত হয়ে পড়েন। হিজরী ২২১ এবং ২২৩ এর মধ্যবর্তী কালে মৃত্যু বরণ করেন। আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল এর টীকার বর্ণনা মতে তার মৃত্যুকাল ২৩১ হিঃ॥

৭. আল-হিশামিয়্যা (الهشامية)[১]
৮. আল-মিরদারিয়্যা (المردارية)[২]
৯. আল-জা'ফারিয়্যা (الجعفرية)[৩]
১০. আল-ইসকাফিয়্যা (الاسكافية)[৪]
১১. আল- হুযালিয়্যা (الهذلية)[৫]
১২. আল-আসওয়ারিয়্যা (الاسوارية)[৬]
১৩. আশ-শাহ্হামিয়্যা (الشهامية)[৭]

---

১. এরা মূলতঃ হিশাম ইব্ন উমার আল-ফুয়াতী আশ-শাইবানী (هشام بن عمر الفوطى الشيبانى)-এর অনুসারী। তাকদীর বিষয়ে অন্যান্য সঙ্গীদের তুলনায় তার বাড়াবাড়িটা ছিল পরিমাণে বেশী এবং মাত্রায় তীব্র। তার মৃত্যু সালঃ ২২৬ হিঃ ॥

২. এই দলের নেতা হল ঈসা ইব্ন সাবীহ্। উপনাম আবূ মূসা। উপাধি মিরদার। তাকে মু'তাযিলা ফিরকার রাহেব বা বৈরাগী বলা হত। নাজ্জাম মু'তাযিলী-র ন্যায় তিনিও মনে করতেন মানুষ চাইলে কুরআনের অনুরূপ গ্রন্থ রচনা করতে পারে। বরং তার চাইতে উচ্চ সাহিত্যমান সম্পন্ন গ্রন্থ রচনা করতে পারে। তিনি ২২৬ হিজরী সালের শেষ দিকে মৃত্যুবরণ করেন ॥

৩. এরা হল জা'ফর ইব্ন হার্ব আছ-ছাকাফী ও জা'ফর ইব্ন মুবাশশির আল-হামদানীর অনুসারী। আর এরা উভয়-ই উপরোল্লিখিত মির্দার এর শিষ্য। এদের মধ্যে জা'ফর ইব্ন হারব তো ভ্রান্তি ও গোমরাহীর ক্ষেত্রে স্বীয় উসতাদ মিরদারের পথকেই অবলম্বন করেছেন। তবে সেই সাথে আরও নতুন কিছু যুক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে জা'ফর ইব্ন মুবাশশির মনে করতেন এই উম্মতের য...া ফাসেক তারা ইয়াহুদী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক ও যিনদীক বা ধর্মত্যাগীদের চাইতেও মন্দতর। অথচ তিনি বলতেনঃ ফাসেক মুওয়াহ্হিদ তবে মু'মিন নয় এবং কাফেরও নয়। তার ধারণা মতে মদ্যপায়ীকে দোর্‌রা মারার বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) ইজমা' ছিল ভুল। কারণ, তাঁরা নিজেদের রায়ের ভিত্তিতেই এ বিষয়ে ঐক্যমত্য করেছিলেন। জা'ফর ইব্ন হার্ব মৃত্যুবরণ করেন ২৩৪ হিঃ সালে আর জা'ফর ইব্ন মুবাশশির মৃত্যুবরণ করেন ২৩৬ হিঃ সালে। শাহ্রাসতানী এই দলটির কথা আলোচনা করেননি ॥

৪. এরা হল আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ আল-ইসকাফীর অনুসারী। তিনি কদর সংক্রান্ত গোমরাহীটা পেয়েছেন জা'ফর ইব্ন হার্ব থেকে। তারপর প্রাসঙ্গিক কিছু কিছু বিষয়ে তার বিরোধিতাও করেছেন। ইসকাফীর ধারণাপ্রসূত আকীদাবলীর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তা'আলা যাদের আকল-বুদ্ধি নেই যেমন শিশু, পাগল প্রভৃতিকে যুলুম করতে সক্ষম কিন্তু আকল ও বিবেক সম্পন্নদেরকে যুলুম করতে সক্ষম নন। তার মৃত্যু হয় ২৪০ হিজরীতে। শাহ্রাসতানী এই দলটির কথা উল্লেখ করেননি ॥

৫. আবুল হুযায়ল মুহাম্মাদ ইবনুল হুযায়ল এর অনুসারী এরা। তারা "আল্লাফ" নামেই সমাধিক পরিচিত ছিল। আবদুল কায়সের আযাদকৃত গোলাম এবং বসরা-র মু'তাযিলাদের শায়খ আবুল হুযায়ল 'আল্লাফ'-এর নামেই তাদের এই পরিচিতি গড়ে ওঠে। তার মৃত্যুকাল হিঃ ২২৬ ॥

৬. এই দলটি আলী আল-আসওয়ারীর অনুসারী। আল আসওয়ারী ছিলেন আবুল হুযায়লের অনুগত একজন। পরে তিনি নাজ্জাম-এর দলে চলে যান। শাহ্রাস্তানী এই দলটির নামও উল্লেখ করেননি ॥

৭. এরা হল আবূ ইয়া'কূব ইউসুফ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইসহাক আশ-শাহ্হাম এর অনুসারী। আবুল হুযায়লের শিষ্য এই আবূ ইয়া'কূবই ছিলেন বসরার মু'তাযিলাদের সমকালীন নেতা। শাহ্রাসতানী এই দলটির কথাও উল্লেখ করেননি ॥

১৪. আল-জুববাইয়্যা (الجبائية)[১]
১৫. আল-বাহ্শামিয়্যা (البهشمية)[২]
১৬. আল-খাবিতিয়্যা (الخابطية)[৩]
১৭. আল-খায়্যাতিয়্যা (الخياطية)[৪]
১৮. আল-কা'বিয়্যা (الكعبية)[৫]

---

১. আবূ আলী মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল ওয়াহাব ইব্ন সালাম আল-জুব্বাঈ'র অনুসারী এরা। খূযিস্তানের অধিবাসীকে তিনিই গোমরাহ করেছিলেন। বসরা ও আহ্ওয়াযের দিকে খূযিস্তানের একটি শহরের নাম হল জুব্বী। সেই অঞ্চলের বাসিন্দা বলেই তাকে আল-জুব্বাঈ বলা হতো এবং তিনি ছিলেন 'আল-বাহ্শামিয়্যা' দল প্রধানের পিতা ॥

২. এটি হল আবূ আলী মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহাব আল-জুব্বাঈ'র পুত্র আবু হাশিম আবদুস সালাম আল-জুব্বাঈ'র অনুসারী দল। শাহ্রাসতানী এটিকে পূর্বোক্ত (الجبائية) দলের সাথে সংমিশ্রিত করে ফেলেছেন। তবে আবূ হাশিম বেশ কিছু বিষয়ে তার পিতার বিরোধিতা করেছেন- যেমনটি তার পিতা তদীয় উসতাদ আবুল হুযায়লের সাথে করেছেন। (দ্র. টীকা, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক) আবূ হাশিম ৩২১ হিঃ সালে মৃত্যুবরণ করেন। এই দলটি যেহেতু (استحقاق الذم لاعلى فعل) কাজ না করার কারণে তিরস্কৃত হওয়ার আকীদা পোষণ করে, তাই তাদেরকে "আয্ যাম্মিয়া" (الذمية) ও বলা হয় ॥

৩. নাজ্জাম মু'তাযিলীর শিষ্য আহমদ ইব্ন খাবিত এর অনুসারী এরা। আহমদ দার্শনিকদের গ্রন্থাবলী পড়াশোনা করেন। তার নতুন মতবাদের মধ্যে ছিল তানাসুখ (تناسخ) বা পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করা। "পুনর্জন্মবাদ" বলা হয় মানুষ মারা যাওয়ার পর তার প্রাণ (روح) পূর্ব আমল অনুপাতে বিভিন্ন আকৃতিতে পূনর্বার এই পৃথিবীতে আগমন করাকে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ الملل والنحل جـ/১ - । তিনি হযরত ঈসা (আঃ)কে রব বলতেন। খৃষ্টানদের মত তিনিও মনে করতেন যে, কিয়ামতের দিন হযরত ঈসা (আঃ) সকলের হিসাব নিবেন। বাগদাদী এবং শাহ্রাস্তানী এই দলটির সাথে "হাদীছিয়্যা" দলকে যুক্ত করে ফেলেছেন। হাদীছিয়্যা হল ফজল আল-হাদাছীর অনুসারী দল। 'হাদীছা' ফুরাত নদীর তীরবর্তী একটি শহর। সেখানকার বাসিন্দা বলে 'ফজল' কে হাদাছী বলা হয়। তার চিন্তাধারা ছিল আহ্মদ ইব্নে খাবিতের চিন্তা ধারার মত। আহমদ মৃত্যুবরণ করেন হিঃ ২৩২ সালে আর হাদাছী মৃত্যুবরণ করেন ২৫৭ সালে ॥

৪. এটি হল আবুল হুসাইন আম্র আল-খায়্যাত এর দল। এদেরকে মা'দূমিয়্যা (معدومية) ও বলা হয়। কারণ তারা বাস্তব জগতের অনেক কিছুর কার্য ক্ষমতা ও গুণাবলীকেই স্বীকার করেন না। তাছাড়া এই খায়্যাত খব্‌রে ওয়াহেদ (اخبار احاد) কেও শরীআতের দলীল হিসেবে স্বীকার করতেন না। তার মৃত্যু সন ৩৩০ হিঃ ॥

৫. আল-কা'বী নামে প্রসিদ্ধ আবুল কাসিম আবদুল্লাহ ইব্ন আহমদ ইব্ন মাহ্মূদ আল-বালাখী'র অনুসারী দল এটি। কা'বী ছিলেন উপরোল্লিখিত আবুল হুসাইন আল-খায়্যাত এর ছাত্র। শাহ্রাসতানী এটিকে আল-খায়্যাতিয়্যার সাথেই উল্লেখ করেছেন। অথচ কা'বী বেশ কিছু বিষয়ে তার উস্তাদের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। এমন কি তিনি اخبار احاد যে শরী'আতের দলীল এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং যারা সেটাকে (خبر واحد কে) শরী'আতের দলীল হিসেবে স্বীকার করেন না তাদেরকে পথভ্রষ্ট বলে প্রমাণ করেছেন। কা'বীর মৃত্যুকালঃ ৩১৯ হিঃ ॥

১৯. আল-বিশরিয়্যা (البشرية)[১]
২০. আল-জাহিযিয়্যা (الجاحظية)[২]
২১. আল-হিমারিয়্যা (الحمارية)[৩]
২২. আসহাবু সালেহ্ কুব্বা (اصحاب صالح قبة)[৪]

---

১. বিশ্‌র ইবনুল মু'তামির এর দল এটি। বিশ্‌র ছিলেন মু'তাযিলাদের সেরা আলেমদের একজন। তারা নানাবিধ ভয়ংকর চিন্তাধারার মধ্যে ছিলেন- কেউ যদি কবীরা গোনাহ করার পর তওবা করে পুনরায় কবীরা গোনায় লিপ্ত হয় তাহলে সে পূর্বে তওবাকৃত কবীরা গোনাহ'রও শাস্তি পাবে। তখন তাকে প্রশ্ন করা হলো- আচ্ছা, যদি কোন কাফের তওবা করে মুসলমান হয়ে যাবার পর পুনরায় মদ পান করে এবং এ থেকে তওবা করার পূর্বেই মারা যায় তাহলে কি আল্লাহ তা'আলা তাকে পূর্বের কুফ্‌রীর আযাব দিবেন ? বললেনঃ হ্যাঁ! তখন তাকে বলা হল তাহলে তো কাফেরদের শাস্তির মতোই মুসলমানদের শাস্তি হয়ে গেল! কিন্তু তিনি তার মতে অবিচল থাকেন। তার মৃত্যু সন হিঃ ৩২৬ ॥

২. এটা হল আম্‌র ইব্‌ন বাহ্‌র আবূ উছমান আল-জাহেযের দল। অন্যতম মু'তাযিলা আলেম ও লেখক। আব্বাসী সাহিত্যের ইমাম ও পথিকৃত। তার ভাষা-বর্ণনা নিয়ে তার অনুসারীরা গর্ববোধ করত। দর্শন শাস্ত্রের প্রচুর গ্রন্থ তিনি অধ্যায়ন করেন। তার প্রাঞ্জল, ও শিল্প-সৌকর্যপূর্ণ ভাষায় দর্শন শাস্ত্রের প্রচুর বিষয় মিশ্রিত করে দিয়েছেনঃ প্রচার করেছেন। তার মুখাবয়ব ছিল কুশ্রি। এক্ষেত্রে বরং ছিলেন উপমা-পুরুষ। এ গেল তার কুৎসিৎ আকৃতির বিবরণ। আর তার কুৎসিৎ চিন্তাধারার বিবরণ হল তিনি মনে করতেন কোন বস্তু একবার সৃষ্টি হবার পর তা ধ্বংস হওয়া অসম্ভব। (যা মূলত এ কথাকেই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করতে পারেন তবে ধ্বংস করতে অক্ষম।) আবদুল কাহের বাগদাদী বলেছেনঃ তার সম্পর্কে আহ্‌লুস-সান্নাত ওয়াল জামা'আতের অভিমত কবির নিম্নোক্ত কবিতারই অনুরূপ। কবিতা-

لويمسخ الخنزير مسخا ثانيا ÷ ماكان الا دون قبح الجاحظ
رجل يدل على الجحيم لوجهه ÷ وهو القذى فى عين كل ملاحظ

শূকরকে যদি পুনর্বার বিকৃত করা হয়
তবুও তার কদর্যতা জাহেযের চেয়ে হবে নিম্নতর।
সে এমন এক ব্যক্তি, চেহারাই তার জাহান্নামের পথ দেখায়,
আর সে হল সকল দর্শকের চোখের ময়লা।

তার জন্মও বসরায়, মৃত্যুও বসরায়। খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ ও মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ'র শাসনামলই তার আমল। মৃত্যু সালঃ ৮৬৮ খৃষ্টাব্দ ॥

৩. এরা মু'তাযিলাদের-ই একটি গোষ্ঠী। তারা কাদরিয়্যাদের থেকে বিশেষ কিছু গোমরাহী গ্রহণ করেছে। যেমন ইব্‌ন খাবিত থেকে পুনর্জন্মবাদ (تناسخ) দর্শনকে গ্রহণ করেছে। তাদের ধারণা, মানুষ কখনও কখনও বিভিন্ন রকম প্রাণীকে সৃষ্টি করে। যেমন- মাংসকে যখন মানুষ মাটির নীচে পুতে রাখে কিংবা সূর্যের তাপে রেখে দেয় তখন তা থেকে নানা রকমের কীট সৃষ্টি হয়। তাদের ধারণা, মানুষই এসব কীটের সৃষ্টিকর্তা ॥

৪. 'আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক' গ্রন্থের রচয়িতা এদেরকে কাদরিয়্যার সাথে উল্লেখ করেছেন। তবে এদের কোন ব্যাখ্যা দেননি। তারপর মুরজিয়াদের আলোচনায় আবার এদেরকে উল্লেখ করেছেন এবং মুরজিয়াদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন- কাদরিয়্যা কিংবা জাবরিয়্যাদের অন্তর্ভুক্ত নয় ॥

কাদরিয়্যা সম্প্রদায়ের মৌলিক চিন্তা ও আকীদা-বিশ্বাস ঃ

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ দলটির অনেক শাখা ও উপদল রয়েছে এবং প্রতিটি ফিরকা বা উপদলের-ই কিছু ভিন্নতর চিন্তা ও বিশ্বাস রয়েছে-যার আলোকে সে অন্যদল থেকে স্বতন্ত্র বলে বিবেচিত হয়। তবে এখানে এমন কিছু মৌলিক বিশ্বাস এবং চিন্তাও রয়েছে যা সমন্বিত ভাবে প্রতিটি দলই ধারণ ও পোষণ করে থাকে, সবগুলো দলের মধ্যেই যা পাওয়া যায়। এমন চিন্তা ও আকীদা- বিশ্বাসগুলো নিম্নরূপঃ

১. আল্লাহ তা'আলার অনাদি গুণাবলী (صفات ازلية) যথা- ইল্‌ম, কুদরত, হায়াত, শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদিকে অস্বীকার করেন। তারা বলেন 'অনাদিগুণ' তথা সিফাতে আযালী বলে কিছু নেই। অধিকন্তু তারা এও বলেনঃ অনাদি কালে আল্লাহ তা'আলার কোন নাম বা গুণই ছিল না।

(আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল, আল্লাহ তা'আলা তার গুণাবলীর সাথে অনাদি কাল থেকেই বিদ্যমান আছেন এবং অনন্ত কাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবেন।)

২. তারা বলেন, মানুষের চোখে আল্লাহ তা'আলাকে দেখা অসম্ভব। তাঁদের ধারণা হল- আল্লাহ তা'আলা নিজেও দেখেন না এবং অন্য কেউও তাঁকে দেখেন না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা অন্যকে দেখেন কি-না! এ বিষয়ে তাদের মধ্যেও মতবিরোধ আছে। তাদের একদল বলেনঃ দেখেন, আবার অন্য দল তা অস্বীকার করেন।

(আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল, এই দুনিয়াতেই মানুষের চোখে আল্লাহ তা'আলাকে দেখা সম্ভব। আর তা বাস্তবে ঘটবে পরকালে বেহেশ্‌তবাসীদের জন্য। আর আল্লাহ তা'আলার একটি অন্যতম গুণ হল তিনি বাছীর (بصير) বা সর্বদ্রষ্টা। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন "আল্লাহ্‌র দীদার সম্বন্ধে আকীদা" শিরোনাম পৃষ্ঠা ১৩৬।)

৩. তারা এ বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ্ তা'আলার 'কালাম' সৃষ্ট বা অনিত্ব (حادث)। তাঁর আদেশ, নিষেধ, সংবাদ সবই সৃষ্ট। তাদের সকলেরই ধারণা, আল্লাহর কালাম অনিত্ব (حادث) এবং সৃষ্ট (مخلوق)। বাগদাদী (মৃঃ ৪২৯) বলেন আজকাল তাদের অধিকাংশই বলেনঃ আল্লাহর কালাম মাখলূক বা সৃষ্ট!

(আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল, আল্লাহর কালাম মাখলূক নয়। দ্রঃ عقيدة الطحاوى)

৪. তাদের আকীদা হল মানুষ যেসব কাজ কর্ম করে আল্লাহ তা'আলা সেগুলোর সৃষ্টিকর্তা নন। প্রাণী জগতের কারও কোন কাজেরও আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকর্তা নন। বরং মানুষের এসব অর্জন ও সমগ্র প্রাণী জগতের কর্মের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার কোন হাত ও পরিকল্পনাই নেই। তারা মনে করেনঃ মানুষ নিজে নিজেই তাদের কাজ-কর্ম করতে সক্ষম। আর এ কারণেই মুসলমানগণ তাদের নাম দিয়েছেন "কাদ্‌রিয়া"।

(পক্ষান্তরে আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিশ্বাস হলঃ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলাই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। সকল সৃষ্টি ও অস্তিত্বের তিনিই উৎস। আর বান্দা কেবল তা অর্জন কারী [كاسب] সৃষ্টিকর্তা নয়।)

৫. তাঁরা দাবী করেন, এই উম্মতের মধ্যে যারা ফাসেক তাদের অবস্থান হল (منزلة بين منزلتين) দুই স্তরের মধ্যবর্তী স্তর। অর্থাৎ, সে ফাসেক; মুমিনও নয় কাফেরও নয়। জমহুর উম্মাহ'র মত ছেড়ে এই ভিন্নতর অভিনব মত গ্রহণ করায় মুসলমানগণ তাদের নাম দিয়েছেন "মু'তাযিলা" বা দলছুট লোক। তাঁরা কোন মুসলমান কবীরা গোনাহ করলে তাকে ঈমানের গণ্ডি থেকেই বের করে দেন। আবার খারিজীদের মত কাফের বলেও ঘোষণা দেন না। তারা বরং ঈমান ও কুফ্র এর মাঝখানে একটা স্তর মানেন।

(আর আহ্লসু সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল- ফিস্ক এবং কবীরা গোনাহ্র কারণে কোন মুসলমান ঈমানের সীমানা থেকে বেরিয়ে যায় না। আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এই মধ্যবর্তী 'স্তর' (منزلة بين منزلتين) কে স্বীকার করেন না।

৬. তাঁদের বিশ্বাস হল, বান্দার যেসব কর্ম-চিন্তা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কোন আদেশ-নিষেধ করেননি সেসব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার কোন ইচ্ছা এবং ইরাদার সংশ্লিষ্টতাও নেই।

(আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও ইরাদা ব্যতীত কোন কিছুই ঘটে না, হয় না। সব কিছুর সাথেই আল্লাহ্র ইরাদা সংশ্লিষ্ট।)

৭. তাঁরা মে'রাজকে অস্বীকার করেন।[১]

(আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল, মে'রাজ হক। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ [সাঃ]কে রাত্রিকালে ভ্রমন করিয়েছেন এবং স্বশরীরে তাঁকে উর্ধ্বলোকে তুলে নিয়ে গেছেন।[২] অর্থাৎ, স্বশরীরে রাসূল [সাঃ]-এর মে'রাজ ঘটেছে)

৮. তাঁরা আহ্দ ও মীছাক (عهد وميثاق) তথা রূহের জগতে আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকারকে অস্বীকার করেন।[৩]

(পক্ষান্তরে আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল, আল্লাহ তা'আলা রূহানী জগতে হযরত আদম [আঃ] ও তাঁর সন্তান-সন্ততিদের থেকে যে অঙ্গীকার (ميثاق) গ্রহণ করেছেন তা সত্য।)

৯. তাঁরা জানাযার নামাযের আবশ্যকতা (وجوب) কে অস্বীকার করেন।[৪]

কাদরিয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে শরীআতের হুকুম ঃ

কাদরিয়াদের শাখা-উপশাখার মধ্যে যারা পরবর্তীকালীন (متأخرين) কাদরিয়া, তারা কাফের কি-না এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে, কিন্তু প্রথম যুগের (متقدمين) কাদরিয়াদের বিষয়ে কোন মত পার্থক্য নেই। কাযী ইয়ায (রহঃ) বলেছেনঃ প্রথম যুগের কাদরিয়াগণ -যারা এই কথাকে অস্বীকার করেন যে, আল্লাহ তা'আলা এই নিখিল জগত সৃষ্টির পূর্বে সে সম্পর্কে সব কিছু জানতেন। এই জাতীয় কথা যারা বলেন তারা- কাফের এতে কোন দ্বিমত নেই।[৫] তবে পরবর্তীকালের কাদরিয়াগণ কাফের কি-না এ বিষয়ে আলিমগণের মধ্যে

১. مقدمه. عقيدة الطحاوى ॥

২. এতে মে'রাজে জিসমানী (শারীরিক মে'রাজ)-এর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এবং তা সংঘটিত হয়েছে জাগ্রত অবস্থায় আকাশ অভিমুখে। অতঃপর উর্ধ্ব লোকের যেথায় আল্লাহ চেয়েছেন। عقيدة الطحاوى ॥ ৩. ايضا ॥ ৪. ايضا ॥ ৫. فتح الملهم . جـ١ . بجنور . الهند. ॥

মতবিরোধ রয়েছে। 'আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক' গ্রন্থের রচয়িতা মুহাম্মদ ইব্ন তাহির আল-বাগদাদীর মতে কেউ কেউ এদের কোন কোন দলকে কাফের বলেছেন। যেমন বাগদাদী বলেনঃ আর খাতিবিয়্যা এবং হিমারিয়্যা এই দুটি ফিরকা ইসলামী দলের নামে সম্পৃক্ত হলেও প্রকৃত পক্ষে এ দুটি ইসলামী দল নয়।

আল্লামা আন্ওয়ার শাহ্ কাশমীরী (রহঃ) বলেছেন[১] আলিমগণের অনেকেই কোনরূপ ভাগাভাগি ছাড়া দ্ব্যর্থহীনভাবে (مطلقا) কাদরিয়াদেরকে কাফের বলেছেন। আল্লামা ইবনুল মুন্যির ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর সূত্রে বলেছেনঃ কাদরিয়াদেরকে তওবা করারও সুযোগ দেয়া হবে না। সালাফে সালেহীনের অধিকাংশই তাদেরকে কাফের বলেছেন। যেমন- লাইছ, ইব্ন উয়ায়নাহ্, ইব্ন লাহী'আ প্রমুখ। তাঁদের এ মত হল কাদরিয়াদের মধ্যে যারা কুরআনে কারীমকে মাখ্লূক বলে তাদের সম্পর্কে।

আব্দুল্লাহ ইব্নে মুবারক বলেনঃ আল-আউদী, ওরাকী, হাফস ইব্ন গিয়াছ, আবূ ইসহাক আল-ফাযারী, হুশায়ম ও আলী ইব্ন আসিম শেষোক্ত মত পোষণকারীদের অন্তর্ভূক্ত এবং এটাই অধিকাংশ মুহাদ্দিছ, ফকীহ ও মুতাকাল্লিমের মত। তাদের এই মত খারিজী এবং কাদরিয়া উভয় দল সম্পর্কে। ভ্রান্ত নফস পূজারী (اهل الاهواء المضلة) এবং অগ্রহণযোগ্য তাবীলপন্থী বিদআতীদের সম্পর্কেও তাদের মত অনুরূপ। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের মতও অনুরূপ।[২]

কিতাবুল ওয়াসিয়্যাহ্ (كتاب الوصية) গ্রন্থে আছেঃ যে ব্যক্তি বলবে, আল্লাহ্র কালাম মাখলূক (সৃষ্ট/অনিত্ব) সে মূলত আল্লাহ তা'আলাকেই অস্বীকারকারী। আর এটা সুবিদিত যে, কাদরিয়াদের সকল ফিরকার লোকেরাই 'কুরআন মাখ্লূক' এ আকীদায় বিশ্বাসী। ফখরুল ইসলাম (রহঃ) বলেছেনঃ[৩] ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ আমি কুরআন মাখলূক 'কি-না' এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর সাথে মুখোমুখি কথা বলেছি। তখন আমি আর তিনি এই অভিন্ন মতেই উপনীত হয়েছি- যে ব্যক্তি 'কুরআন মাখলূক' বলে বিশ্বাস করে সে কাফের। ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) থেকেও বিশুদ্ধ সূত্রে অনুরূপ বক্তব্য বর্ণিত আছে।[৪]

আবার দুটি দিককে যথাযথ অক্ষুন্ন রেখে কেউ কেউ এদের সম্পর্কে স্পষ্ট মন্তব্য করা থেকে বিরত রয়েছেন। দিক দু'টি হল- ১. আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে বিদআত একটি অকাট্য অন্যায়, এটি একটি নিন্দিত বিষয় এবং নিন্দিত এর অনুসারী বিদআতীরাও। ২. যারা তাদের সকলকে বা কতককে কাফের বলেছেন তাদের মতকেও উপেক্ষা না করা। এই দু'টি বিষয়কেই অক্ষুন্ন মর্যাদায় রাখার প্রয়াসে তারা নীরবতা অবলম্বন করেছেন এবং বলেছেনঃ এদের সম্পর্কে আল্লাহ-ই ভাল জানেন।

১. اكفار الملحدين . المجلس العلمى . ١٩٦٨م ١٣٨٨ هـ . صفحه/٤١ ॥

২. (الشفاء) ॥

৩. اكفار الملحدين . المجلس العلمى . ١٩٦٨م ١٣٨٨ هـ . صفحه/٥٤ ॥

৪. شرح الفقه الاكبر ॥

বর্তমান যুগে কি এদের অস্তিত্ব আছে ?

সম্প্রতি কাদরিয়া নামে কোন দল বা ফিরকার সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে বর্তমানে প্রগতিবাদী এবং বুদ্ধিজীবী বলে একটা শ্রেণী আছেন, যারা কুরআন-সুন্নাহ'র বক্তব্য তাদের আকল-বুদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে। কুরআন-হাদীছের উপর নিজেদের বিবেক-বুদ্ধিকে প্রাধান্য দেন এবং কুরআন-সুন্নাহ-র ভাষ্যাবলীকে পশ্চাতে ফেলে তাদের বিবেক-চিন্তাকেই চূড়ান্ত বিচারক বলে মনে করেন মু'তাযিলা এবং কাদরিয়া সম্প্রদায়ও এটাই করতো। তাই এই অর্থে যদি এদেরকে আধুনিক কালের মু'তাযিলা বা আধুনিক কাদরিয়া বলা হয় তাহলে তা অযৌক্তিক হবে না।

মু'তাযিলা
(المعتزلة)

"মু'তাযিলা" মতবাদ অনুসারীদেরকে বলা হয় মু'তাযিলী। এদের এ নাম অন্যদের প্রদত্ব। তারা নিজেদেরকে "আস্হাবুল আদ্লি ওয়াত্তাওহীদ" (اصحاب العدل والتوحيد) বলে পরিচয় দিত। কারণ আল্লাহ্র আদ্ল বা ইনসাফ ও তাওহীদ সম্পর্কে তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে তারা শুধু নিজেদেরকেই আদ্ল ও তাওহীদ পন্থী বলে মনে করত।

"মু'তাযিলা" নামকরণের রহস্য ঃ

* সাধারণত ঃ বলা হয়ে থাকে যে, এ মতের উদ্ভাবক ওয়াসিল ইব্নে আতা (واصل بن عطاء)-এর সাথে হযরত হাসান বসরী (৬৪২-৭২৮)-এর একটা বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তাদের এ নাম রটে যায়। ঘটনাটি হল ওয়াসিল ইব্নে আতা (মৃ. ১৩১ হি.) হযরত হাসান বসরী (রহঃ, মৃতঃ ১১০ হিঃ)-এর নিকট একদিন কথা প্রসঙ্গে বললেনঃ কবীরা গুনাহ্কারী ব্যক্তি মু'মিনও নয়, কাফিরও নয়, বরং তার স্থান হল ঈমান এবং কুফ্র-এর মধ্যবর্তী। এ কথা বলে তিনি হাসান বসরীর মাহফিল হতে উঠে যান এবং নতুন এক পৃথক শিক্ষা শিবির প্রতিষ্ঠা করেন। এতে হাসান বসরী বলেনঃ اعتزل عنا واصل (ওয়াসিল আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেছে)। তখন হতে তার অনুসারীদের নাম মু'তাযিলা হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।[১]

---

১. এ ছাড়াও "মু'তাযিলা" নামকরণের আরও অনেক রহস্য বলা হয়ে থাকে। যেমন ঃ

(১) কোন কোন প্রাচ্যবিদের মত হল- এদেরকে মু'তাযিলা বলা হত কারণ, তারা খুবই মুক্ত থাকতেন।

(২) মুহাম্মাদ আবূ যুহ্রা মনে করেন যে, ইসলামের মু'তাযিলা মতবাদ এবং ইয়াহুদীবাদের মধ্যে যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। ইয়াহুদীদের মু'তাযিলাগণ যুক্তি এবং দর্শন (منطق وفلسفه) -এর আলোকে তাওরাত-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিত। মুসলিম মু'তাযিলাগণও কুরআন এবং আল্লাহ্র সিফাতের তাফসীর ও ব্যাখ্যা দর্শন (فلسفه)-এর আলোকে দিয়েছেন (المذاهب الاسلامية)।

(৩) আহমাদ আমীন লিখেছেন- ইয়াহুদীদের মধ্যে ফরাশীম নামে এক গোত্র ছিল যার অর্থ হল মু'তাযিলা। তাদের আকাইদ মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের আকাইদের সাথে মিল রাখে। সম্ভবত ইয়াহুদীদের মধ্য হতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তারা আকাইদের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যের দরুন মু'তাযিলাগণকে এ নাম দিয়ে থাকবেন। (فجر الاسلام-خطط المقريزى) ॥

মু'তাযিলাদের আবির্ভাব ও তার প্রেক্ষাপটঃ

* পূর্বে বর্ণিত হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর সাথে তাঁর শিষ্য ওয়াসিল ইব্নে আতা-র ঘটনা থেকে মু'তাযিলাদের আবির্ভাব সম্বন্ধে জানা গিয়েছে। এটাই এ দলের আবির্ভাবের প্রসিদ্ধ বিবরণ। এছাড়াও এ ব্যাপারে আরও কিছু উক্তি পাওয়া যায়। যেমন ঃ

১. অনেকে বলেন এ দলের উদ্ভব ওয়াসিল ইব্নে আতার অনেক পূর্বেই ঘটেছিল, কিছু আহ্লে বায়ত (যেমন যায়েদ ইব্ন আলী)-ও মু'তাযিলাপন্থী ছিলেন।

২. কিছু লোকের ধারণা হল এ মতবাদের সূচনা হয় এভাবে ঃ হযরত হাসান ইব্নে আলী (রাঃ) যখন হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষে খিলাফত পরিত্যাগ করেন, তখন খিলাফত পরিত্যাগ করার সময় হতে শী'আনে আলীর (শী'আ দলের) মধ্য হতে কিছু লোক হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) এবং হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) উভয় হতে পৃথক হয়ে যান। এভাবে তারা রাজনীতি থেকে পৃথক হয়ে কেবল ইল্ম এবং ইবাদত নিয়েই লিপ্ত থাকে। এবং আকাইদ সংক্রান্ত বিষয়ে চিন্তা ও গবেষণা করতে থাকেন। এখান থেকেই ই'তিযাল (اعتزال) বা পৃথক থাকার নীতির সূচনা হয়।

মু'তাযিলাদের উত্থানকাল ঃ

বনূ উমাইয়্যাদের শাসনামলেই মু'তাযিলী মতবাদের সূচনা হয়। তবে আব্বাসী যুগেই তাদের উত্থান সূচিত হয়। আব্বাসী খলীফা মামূনের যুগেই মু'তাযিলীদের বিশেষ উত্থান সূচিত হয়। খলীফা মামূন সরকারীভাবে তাদের পৃষ্টপোষকতা করেন এবং মু'তাযিলী আলেমগণই সাধারণভাবে মামূনের প্রিয় ও ঘনিষ্ট ছিলেন। খলীফা মামূন ২১২ হিজরী সনে খাল্কে কুরআনের আকীদার প্রকাশ্য ঘোষণা দেন এবং মু'তাযিলী আলেমগণ কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সর্বসাধারণকে এই আকীদা গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। তিনি প্রশাসকগণকে এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, তাঁরা যেন উলামা, মুহাদ্দিছ, ফুকাহা এবং বিচারকদেরকে ডেকে আমীরুল-মু'মিনীনের নির্দেশ জানিয়ে দেন কোন ব্যক্তি খাল্কে কুরআনকে স্বীকার না করলে আগামীতে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

খলীফা মামূন খাল্কে কুরআনের মাসআলায় প্রচুর বাড়াবাড়ি করেন। এমনকি ইমাম আহমাদ ইব্নে হাম্বলসহ কয়েকজন প্রখ্যাত আলেমকে বন্দী করে জেলখানায় নিক্ষেপ করেন। ইমাম আহমাদ ইব্নে হাম্বলকে বেত্রাঘাত করা হয়। মামূনের পর মু'তাসিম এবং ওয়াছিক বিল্লাহও এই পদ্ধতি অব্যাহত রাখেন। ওয়াছিক-এর যুগে ইমাম শাফিঈ'র শাগরিদ ইউসুফ ইব্নে ইয়াহ্য়া বুওয়ায়তীকেও অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হতে হয় এবং আহ্মাদ ইব্নে নাস্র খুযাঈকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়। মোটকথা, এভাবে আব্বাসী খলীফাগণ মু'তাযিলাদের পৃষ্ঠপোষকতা করায় এ যুগে মু'তাযিলাদের উত্থান ঘটে।

মু'তাযিলাদের দল/উপদল সমূহঃ

১. আল-ওয়াসিলিয়্যা (الواصلية)
২. আল-হুযায়লিয়্যা (الهذلية)
৩. আন্-নায্যামিয়্যা (النظامية)
৪. আল-জাহিযিয়্যা (الجاحظية)
৪. আল-খাতামিয়্যা (الخاتمية)
৫. আল-কাবিয়্যা (القوية)
৬. আল-জুব্বাইয়্যা (الجبائية)
ইত্যাদি

মু'তাযিলাদের মৌলিক মতবাদ ও চিন্তাধারা ঃ

মু'তাযিলাদের উপদলগুলির মাঝে কিছু ভিন্ন মতামত ও চিন্তাধারা থাকলেও যে বিষয়গুলো তাদের সকল দলের মধ্যে সম্মিলিত মূলনীতি হিসেবে মর্যাদা রাখত এবং যা স্বীকার করা ব্যতীত কেউ মু'তাযিলী হিসেবে স্বীকৃতি পেতনা তা হল পাঁচটি। এ গুলোকে ই'তিযাল-এর পঞ্চনীতি বলা হয়। এই মতবাদের উদ্ভাবক ওয়াসিল ইব্‌নে আতা উক্ত পঞ্চনীতির নাম দিয়েছিলেন আল-কাওয়াইদ (القواعد বা নীতিমালা) নীতিগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. আত্-তাওহীদ (التوحيد)।
২. আল-আদ্‌ল (العدل)।
৩. আল-ওয়াদ ওয়াল-ওয়াঈদ (الوعد والوعيد)।
৪. আল-মানযিলাহ বাইনাল-মানযিলাতাইন (المنزلة بين المنزلتين)।
৫. আল-আম্‌র বিল মা'রূফ ওয়ান্নাহী আনিল্-মুন্‌কার (الامر بالمعروف والنهى عن المنكر)।

পঞ্চনীতির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ঃ

(১) তাওহীদ (التوحيد)ঃ

মু'তাযিলাগণ নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ আকীদার বিশেষ দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাদের সেই ব্যাখ্যা অনুসারে আল্লাহ তা'আলার সত্তার বাইরে কোন সিফাত বা গুণ নেই। কারণ আল্লাহ্‌র গুণ স্বীকার করলে আল্লাহ্‌র গুণকেও আল্লাহ্‌র ন্যায় চিরন্তন ও নিত্ব (قديم) সাব্যস্ত করতে হয়। এভাবে চিরন্তন সত্তার একাধিকত্ব (تعدد قدماء) অবধারিত হয়ে দাঁড়ায়, আর এটা তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্বের পরিপন্থী। তাছাড়া আল্লাহ্‌র বহু গুণাবলীর অর্থ হল তাঁর সত্তায় বহুত্ব পাওয়া যাওয়া, অথচ আল্লাহ্‌র সত্তায় কোন প্রকারেই বহুত্ব পাওয়া যেতে পারে না। অতএব আল্লাহ্‌র সত্তা গুণাবলী (صفات) হতে পবিত্র।

এভাবে তাওহীদের নিজস্ব ব্যাখ্যার ফলে তারা আল্লাহ্‌র সিফাতকে অস্বীকার করে বসেছে। একই কারণে তারা কুরআনের চিরন্তনতা ও অসৃষ্ট হওয়াকে অস্বীকার করেছে। তাদের মতে কুরআন অনিত্ব ও সৃষ্ট (حادث ومخلوق)। এব্যাপারে হক্কপন্থীদের বক্তব্য আল্লাহ্‌র গুণাবলী তার সত্তার সথে সংশ্লিষ্ট বিষয় তার সত্তা থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র কোন সত্তা নয় যে, তা মেনে নিলে আল্লাহ্‌র চিরন্তন সত্তার একাধিকত্ব অবধারিত হয়ে দাঁড়াবে। প্রথম খণ্ডে অসংখ্য আয়াতও হাদীছ দ্বারা আল্লাহর গুনাবলী প্রমাণিত করে দেখানো হয়েছে।

(২) আদ্‌ল (العدل)ঃ

মু'তাযিলাগণ নিজেদেরকে "আসহাবুল আদ্‌লে ওয়াত্-তাওহীদ" (اصحاب العدل والتوحيد) বা "আল্লাহ্‌র ইনসাফ ও তাওহীদ পন্থী" বলে পরিচয় দিত। যদিও মুসলমান মাত্রই আল্লাহ তা'আলাকে আদিল বা ইনসাফগার বলে জানেন, কিন্তু মু'তাযিলারা এ ব্যাপারেও নিজেদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিষ্ঠা করে। তাদের বক্তব্য ছিল- যেহেতু আল্লাহ আদিল, তাই পাপীকে শাস্তি দেয়া আল্লাহ্‌র উপর ওয়াজিব এবং নেককারকে ছওয়াব দেয়াও তার উপর ওয়াজিব; নতুবা ইনফাস পরিপন্থী কাজ হয়ে যাবে। তাদের আরও বক্তব্য ছিল যেহেতু আল্লাহ আদিল বা ইনসাফগার, তাই তিনি কোন অন্যায়ের ইচ্ছাও করেন না

আদেশও দেন না। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রতি কেবল সে নির্দেশ প্রদান করে থাকেন যা তার জন্য কল্যাণকর। এটাই ইনসাফ বা আদ্‌ল। তার পক্ষে জায়েয নয় যে, কোন অন্যায়ের নির্দেশ দিবেন অতঃপর বান্দাগণকে উক্ত অন্যায়ের দরুন শাস্তি দিবেন। কেননা এরূপ করা ইনসাফ পরিপন্থী কাজ তথা জুলুম। মু'তাযিলাদের এ বক্তব্যের দলীল ভিত্তিক খন্ডনের জন্য দেখুন ৫৩-৫৪ পৃঃ।

(৩) আল-ওয়াদ ওয়াল-ওয়াঈদ (انفاذ الوعد والوعيد) ঃ

মু'তাযিলাদের আকীদা হল, আল্লাহ তা'আলা ভাল কাজের জন্য ছওয়াবের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং খারাপ কাজের জন্য যে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন তা অবশ্যই কার্যকর হবে। নেককার লোক অবশ্যই প্রতিদান পাবেন এবং বদকার লোক অবশ্যই শাস্তি পাবে। এ ব্যাপারে কোন কোন মু'তাযিলী এতটা বাড়াবাড়ি করেছে যে, তারা বলেছে নেককার লোককে ছাওয়াব দেয়া এবং কবীরা গুনাহকারীদেরকে শাস্তি দেয়া আল্লাহ্‌র উপর ওয়াজিব। ভাল কাজের ছওয়াব প্রদান এবং পাপ কাজের শাস্তি প্রদান এক প্রকার আইনগত বিষয় যা পালন করা আল্লাহ্‌র জন্য ওয়াজিব বা অপরিহার্য। অতএব আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করতে পারবেন না। এ ব্যাপারে আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বক্তব্য এবং দলীল ও মু'তাযিলাদের খন্ডনের জন্য দেখুন ৫৩ ও ৬৭ নং পৃঃ।

(৪) আল-মান্‌যিলাহ বাইনাল-মান্‌যিলাতাইন (المنزلة بين المنزلتين) ঃ

"আল-মান্‌যিলাহ বাইনাল-মান্‌যিলাতাইন" -এর অর্থ দুই স্তরের মধ্যবর্তী স্তর। এর দ্বারা তারা বুঝিয়ে থাকে কুফ্‌র এবং ইসলামের মধ্যবর্তী একটি স্তর। তারা কুফ্‌র এবং ইসলামের মাঝখানে একটি স্বতন্ত্র স্তর আবিষ্কার করেছে। প্রকৃত পক্ষে তাদের এই দর্শন 'ফাসিকদের' সম্পর্কে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মুখে ঈমান এনে থাকে কিন্তু সেই সঙ্গে গুনাহও করে থাকে তার অবস্থা কি হবে ? মুতাযিলাদের নিকট সে ব্যক্তি না সঠিক মু'মিন না প্রকৃত অর্থে কাফের। মু'মিন না এ কারণে যে, তার কার্যে ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। আবার কাফেরও না এ কারণে যে, মুখে সে ঈমানকে স্বীকার করে।

তবে উল্লেখ্য যে, মু'তাযিলাদের নিকট কিছু কবীরা গুনাহ এমন আছে যা মানুষকে কুফ্‌র-এর সীমা পর্যন্ত নিয়ে যায়, আবার এর থেকে কিছু নিম্নমানের কবীরা গুনাহও রয়েছে। এই শেষোক্ত পর্যায়ের কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি সম্বন্ধেই তারা বলে থাকে যে, সে না মু'মিন না কাফের, বরং তার স্থান উল্লেখিত স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী।

'মধ্যবর্তী স্থান'-এর দাবী করা সত্ত্বেও মু'তাযিলাদের বক্তব্য হল কবীরা গুনাহকারীর জন্য "মুসলিম" শব্দ ব্যবহার করতে হবে, কিন্তু তার জন্য এই "মুসলিম" শব্দ ব্যবহার তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নয়, বরং কাফের এবং যিম্মীদের থেকে তার ভিন্নতা বোঝানোর জন্য।

(৫) আল-আম্‌র বিল মারূফ ওয়ান্নাহী আনিল মুন্‌কার (الامر بالمعروف والنهى عن المنكر)ঃ

"আল-আম্‌র বিল মারূফ ওয়ান্নাহী আনিল মুন্‌কার" তথা "ভাল কাজের নির্দেশ প্রদান এবং অন্যায় কাজ হতে বারণ করা" সকল মুসলমানেরই মৌলিক দায়িত্ব। মু'তাযিলাগণ এ বিষয়েও এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে মু'তাযিলাগণ

সরাসরি হস্তক্ষেপকে ওয়াজিব বরং প্রয়োজনে তরবারীর ব্যবহারকেও জায়েয বলে থাকেন। তাঁদের বক্তব্য হল ভূল পথ প্রদর্শকারীদেরকে বাধা প্রদানের জন্য এবং হক বিরোধীদের হক গ্রহণে বাধ্য করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক। তারা আব্বাসী খলীফা মামূন, মু'তাসিম এবং ওয়াছিক বিল্লাহ-এর শাসনামলে খাল্‌কে কুরআন (خلق قرآن) বিষয়ে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় মুহাদ্দিছ এবং ফকীহদেরকে জোরপূর্বক তাদের মতানুসারী বানাতে চেয়ে "আম্‌র বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুন্‌কার" প্রসঙ্গে তাদের এই বিশেষ দৃষ্টিভংগীর বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল।

মু'তাযিলাদের আরও কতিপয় আকীদা

১. আল্লাহ্‌র সিফাত বা গুণাবলীর অস্বীকৃতি ঃ

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মু'তাযিলাগণ আল্লাহ্‌র সিফাত বা গুণাবলীকে অস্বীকার করেন। কুরআনে যেসব সিফাতের উল্লেখ এসেছে তারা সেগুলোর অপব্যাখ্যা করে বলেন যে, এগুলো আল্লাহ্‌র সিফাত নয় বরং তাঁর যাতের নাম। তারা এই সিফাতকে অস্বীকার করার বিষয়ে এতদূর অগ্রসর হন যে, এ বিষয়টা ইল্‌মে কালামের বিষয়সমূহের মধ্যে প্রথম সারির বিষয়ের রূপ নেয়।

আল্লাহ্‌র সিফাত বিষয়ে মু'তাযিলাগণ আরও একটি সূক্ষ্ম দর্শনগত জটিলতার সূচনা করেছিলেন, যার ফলে আল্লাহ্‌র সিফাতসমূহ হুবহু তাঁর যাত/সত্তা (عين ذات) না যাত/সত্তা বহির্ভূত (غير ذات) -এরূপ জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়। মু'তাযিলাগণ এই দর্শন স্থাপন করেন যে, আল্লাহ্‌র যাত এবং আল্লাহ্‌র সিফাত একই বস্তু। উদাহরণতঃ ইল্‌মে কালামে সাধারণতঃ আল্লাহ্‌র যেসব সিফাত নিয়ে বেশির ভাগ আলোচনা করা হয়ে থাকে অর্থাৎ ঃ

১. ইল্‌ম বা জ্ঞান (علم)
২. হায়াত বা জীবন (حيات)
৩. ইরাদা বা ইচ্ছা (ارادة)
৪. সামা' বা শ্রবণ (سمع)
৫. বাছার বা দর্শন (بصر)
৬. কালাম বা বলা (كلام)

এর ব্যাখ্যায় তারা বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর যাত বা সত্তাগতভাবে حى বা জীবিত, তিনি তাঁর সত্তাগতভাবে আলিম (عالم) বা জ্ঞানী এবং তিনি তাঁর সত্তাগতভাবে কাদির (قادر) বা ক্ষমতাবান, এমন কোন সিফাতের ভিত্তিতে নয় যাকে ইল্‌ম, অথবা হায়াত, অথবা কুদরত বলা যায় এবং যা আল্লাহ্‌র যাত বা সত্তা বহির্ভূত অতিরিক্ত কিছু।

আল্লাহ্‌র সিফাত বা গুণাবলীর ক্ষেত্রে মু'তাযিলাদের এরূপ বক্তব্যের পশ্চাতে যুক্তি ছিল নিম্নরূপ ঃ

(এক) কেননা, এসব গুণকে তাঁর যাত বা সত্তা বহির্ভূত কোন কিছু বললে বিশেষ্য (موصوف) ও বিশেষণ (صفت) অর্থাৎ ধারক ও যা ধারণ করা হয়েছে এরকম আলাদা আলাদা দুটি বস্তু মেনে নেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এভাবে আল্লাহ্‌র সত্তায় একাধিকত্ব আরোপ করার মতবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। (পূর্বে এর খণ্ডন পেশ করা হয়েছে।)

(দুই) তাছাড়া এরূপ গুণাবলীর ধারণা কেবল দেহসমূহের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে এবং আল্লাহ দেহগত কোন ব্যাপার হতেও মুক্ত ও পবিত্র। যদি আমরা বলি যে, প্রত্যেক সিফাত বা গুণ আপনা আপনি বিদ্যমান অর্থাৎ, বিশেষণ বিশেষ্যের সত্তা হতে পৃথকীকৃত একটি স্বতন্ত্র সত্তা, তাহলে অনেক অনন্ত (قديم) বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে এবং এভাবেও আল্লাহ্‌র সত্তায় একাধিকত্ব আরোপ করার মতবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

(তিন) মু'তাযিলাগণ আল্লাহ্‌র সিফাত বা গুণাবলী অস্বীকার করার পশ্চাতে এরূপ ব্যাখ্যাও প্রদান করেন যে, আল্লাহ্‌র সিফাত বা গুণাবলী মেনে নিলে বলতে হয় তাঁর পবিত্র সত্তা অসংখ্য বিষয় বা বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত, অথচ তাঁর পবিত্র সত্তা অসংখ্য বিষয় বা বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত নয়। কেননা যদি বলা হয় যে, তাঁর সত্তা অসংখ্য বিষয় বা বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত, তাহলে সেসব বস্তুর প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন, ফলে প্রত্যেকটি হবে আলাদা বা ভিন্ন বস্তু। এমতাবস্থায় সেগুলিকে যুক্ত করার প্রয়োজন। আর প্রয়োজনের অর্থই হল অপরের মুখাপেক্ষী হওয়া। এমতাবস্থায় বলতে হবে আল্লাহ্‌র সত্তা তার গুণাবলীর মুখাপেক্ষী। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অপরের মুখাপেক্ষী হওয়া হতে পবিত্র ও উর্ধ্বে। তাছাড়া আল্লাহ্‌র বহু গুণাবলীর অর্থ হল তাঁর সত্তায় বহুত্ব পাওয়া যাওয়া, অথচ আল্লাহ্‌র সত্তায় কোন প্রকারেই বহুত্ব পাওয়া যেতে পারে না। অতএব আল্লাহ্‌র সত্তা গুণাবলী (صفات) হতে পবিত্র। (এ ব্যাপারে আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বক্তব্য ও মু'তাযিলাদের খণ্ডনের জন্য দেখুন পৃঃ নং ৭০।)

২. খাল্‌কে কুরআনের মাসআলা ঃ

মু'তাযিলাগণ কর্তৃক আল্লাহ্‌র সিফাত বা গুণাবলীকে অস্বীকার করার পরিণতিতে খাল্‌কে কুরআন (خلق قرآن) মতবাদের জন্ম নেয় এবং তাদের এই মতবাদ এতদূর প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, আকীদা সংক্রান্ত মতবাদসমূহের ইতিহাসে মু'তাযিলাগণ এই মাসআলার ভিত্তিতেই সর্বাধিক পরিচিত। যখন তারা সিফাত অস্বীকার করল এবং কালামও আল্লাহ্‌র সিফাতের অন্তর্ভুক্ত, তখন আল্লাহ্‌র এই কালাম-সিফাতের অস্বীকৃতির কারণে আল্লাহ্‌র মুতাকাল্লিম (বক্তা) হওয়ার অস্বীকৃতি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাই তাদের দর্শন এই দাঁড় হল যে, কালাম আল্লাহর সিফাত বা গুণ নয় বরং তাঁর সৃষ্টিকৃত বিষয় এবং আল্লাহ্‌র কালাম অর্থাৎ, কুরআন মাজীদ হল مخلوق বা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে একটি। অতএব কুর-আন অনন্ত (قديم) নয়, বরং حادث বা অনিত্ব ও ধ্বংসশীল। তারা কুরআনকে কাদীম (قديم/নিত্ব) বলা কুফ্‌র মনে করতেন। (এ ব্যাপারে হকপন্থীদের আকীদার জন্য দেখুন পৃঃ নং ১১১।)

৩. মু'যিজায় অবিশ্বাস ঃ

তারা সাধারণতঃ মু'জিযা বিশ্বাস করতেন না। যুক্তিকে মাপকাঠি নির্ধারণ করার ফলে মু'যিজার পক্ষে কোন বস্তুতান্ত্রিক যুক্তি খুঁজে না পাওয়ার ফলেই তারা মু'জিযা অবিশ্বাস করতেন। (মু'জিযা সম্পর্কে দলীল ভিত্তিক আলোচনার জন্য দেখুন ৮১-৮২ পৃঃ।)

৪. কারামতে অবিশ্বাস ঃ

মু'তাযিলীগণ ওয়ালীগণের কারামতকে অস্বীকার করতেন। যে কারণে তারা মু'জিযাকে অস্বীকার করতেন, একই কারণে কারামতকেও অস্বীকার করতেন। (কারামত সম্পর্কে দলীল ভিত্তিক ও বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন ১৫৩-১৫৫ নং পৃঃ।)

৫. তাহ্সীন এবং তাক্বীহে আক্লী-এর দর্শন ঃ

তাহসীন এবং তাকবীহ আকলী অর্থ ভাল ও মন্দের ধারণা কেবল বিবেকবুদ্ধি দ্বারাই সম্ভব। মু'তাযিলাদের "আদ্ল" নীতি থেকেই এই দর্শনের উদ্ভব'আলা যখন আদিল ও হাকীম এবং তাঁর সকল কাজের কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে তখন মৌলিকভাবে আমলসমূহের মধ্যে ভাল (حسن) ও মন্দ (قبح) বিদ্যমান, যেমন সত্যবাদিতার মধ্যে মৌলিকভাবে ভাল (حسن) বিদ্যমান, মিথ্যা এর মধ্যে মৌলিকভাবে মন্দ (قبح) বিদ্যমান। এভাবে প্রত্যেক আমলে ভাল (حسن) ও মন্দ (قبح) বিদ্যমান। সুতরাং শারী'আত যে সকল কাজের নির্দেশ প্রদান করেছে তা মূলতঃ ভাল (حسن) বলেই সেগুলোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তদ্রূপ যে সকল কাজ নিষেধ করা হয়েছে তা মৌলিকভাবে মন্দ (قبح) বলেই শারী'আতে তা নিষেধ করা হয়েছে। সারকথা এই দাঁড়াল যে, শরী'আতের হুকুম জানা না থাকলেও বা শারী'আত তার নিকট না পৌঁছালেও মানুষ মুকাল্লাফ (مكلف) অর্থাৎ ভাল-মন্দ বিবেচনা করে কর্তব্য পালনে বাধ্য। কেননা ভাল-মন্দ যাচাই করার মত বিবেক-বুদ্ধি তার আছে। নবী (সাঃ)-এর হাদীছের ক্ষেত্রেও মু'তাযিলগণ আক্লকে বিচারক মানতেন।

৬. সালাহ ও ইস্লাহ (صلاح واصلاح) নামক দর্শন ঃ

মু'তাযিলাদের "আদল" নীতি থেকে কল্যাণের দর্শন (صلاح واصلاح) নামক দর্শনেরও উদ্ভব হয়। এর অর্থ হল - আল্লাহ তা'আলার সকল কার্যে বান্দার কল্যাণই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে কোন কোন মু'তাযিলী এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, আল্লাহর উপর কল্যাণ (اصلاح)-এর বিবেচনা করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য। (এ সম্পর্কে খণ্ডন ও আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বক্তব্যের জন্য দেখুন ৬৪-৬৫ নং পৃঃ।)

কয়েকজন প্রসিদ্ধ মু'তাযিলী ঃ

১.আবুল-হুযায়ল আল-আল্লামা বসরী (মৃ. ২২৭ হি.)
২. মুআম্মার ইব্ন আব্বাদ বসরী
৩. ইব্রাহীম ইব্ন সায়্যার আন-নাজ্জাম (মৃ. ২৩১ হি)
৪. আল-জাহিজ (মৃ. ২৫৫ হি.)
৫. শ্রির ইব্নুল-আশরাস বসরী
৬. আবুল হুসায়ন আল-খায়্যাত বসরী
৭. আল-কাবী (মৃ. ৩১৯ হি.)
৮. আহমাদ ইব্ন আবী দাউদ (মৃ. ২৪০ হি.)

মুর্জিয়া

এ ফিরকাটির নাম "মুরজিয়া"। মুরজিয়া শব্দটি ارجاء ক্রিয়ামূল থেকে উৎপন্ন, যার দুটি অর্থঃ (১) অবকাশ দেয়া, বিলম্বিত করা, পশ্চাৎবর্তি করা, যেমনঃ কুরআনের আয়াত- ارجه واخاه وابعث فى المدائن حشرين (২) আশা প্রদান করা। প্রথম অর্থের ভিত্তিতে তাদের "মুরজিয়া" নামকরণের হেতু হল তারা আমলকে ঈমান থেকে পশ্চাৎবর্তি করে ফেলেছিল[১] কেউ কেউ বলেনঃ এর কারণ হল তারা কবীরা গোনাহ কারী (مرتكب الكبيرة) জান্নাতী না জাহান্নামী-এ বিষয়ের সিদ্ধান্তকে কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত করে দিয়েছে। দুনিয়াতে এ বিষয়ে তারা কোন চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেনি। কেউ কেউ বলেনঃ এই নামকরণের হেতু হল-তারা হযরত আলী (রাঃ)-কে প্রথম স্তর থেকে নামিয়ে চতুর্থ স্তরে নিয়ে তাঁর মর্যাদাকে পশ্চাৎবর্তি করে দিয়েছে।[২] দ্বিতীয় অর্থ হিসেবে তাদের "মুরজিয়া" নামকরণ হয়েছে এ কারণে যে, তারা বলেঃ ঈমান থাকলে যেমন কোন গোনাহ দ্বারা ঈমানের কোন ক্ষতি হয় না, তদ্রূপ কুফ্র থাকলে কোন ইবাদত দ্বারাই কোন লাভ হয় না। এভাবে পাপীদেরকে তারা আশা প্রদান করে থাকে। আল্লামা শাহরাস্তানী বলেনঃ প্রথম অর্থের ভিত্তিতে মুর্জিয়া নামকরণই অধিক বিশুদ্ধ।

মুরজিয়া ফিরকার আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট ঃ

কোন অবস্থার প্রেক্ষাপটে এ ফিরকাটির আবির্ভাব ঘটেছিল- এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জুহ্রা মিসরী বলেছেনঃ[৩] কবীরা গোনাহকারী (مرتكب الكبيرة) মু'মিন কি মু'মিন না - এ প্রসঙ্গে যখন বিতর্ক চলছিল - খাওয়ারিজ দল বলেছিল এরূপ ব্যক্তি কাফের। মু'তাযিলারা বলেছিল এরূপ ব্যক্তি মু'মিন নয়। তারা এরূপ ব্যক্তিকে মু'মিন নয় মুসলিম বলত। হাছান বসরী এবং একদল তাবেঈ বলেছিলেন এরূপ ব্যক্তি মুনাফিক। কেননা আমল হচ্ছে অন্তরের বিশ্বাসের দলীল, যবান অন্তরের দলীল নয়। জমহুরে উম্মত বলেছিল এরূপ ব্যক্তি পাপী মু'মিন। আল্লাহ চাইলে পাপ পরিমাণ তাকে শাস্তি দিবেন কিংবা চাইলে নিজ অনুগ্রহে তাকে ক্ষমা করে দিবেন। এই বিতর্কের মধ্যে মুরজিয়া নামক দলটির আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং তারা বলে যে, ঈমান বলা হয় মুখের স্বীকৃতি এবং মনের বিশ্বাস ও পরিচিতি (معرفت)-কে। অতএব পাপ দ্বারা ঈমানের কোন ক্ষতি হয় না। কেননা পাপ দ্বারা স্বীকৃতি, বিশ্বাস ও পরিচিতি ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। আমল থেকে ঈমান পৃথক বিষয়।

আল-মিলাল ওয়ান্নিহাল গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী মুরজিয়া আকীদা-বিশ্বাসের প্রথম প্রবক্তা হল হাসান ইব্নে মুহাম্মাদ ইব্নে আলী ইব্নে আবী তালিব। সে বিভিন্ন অঞ্চলে চিঠি-পত্রের মাধ্যমে এই মতবাদ প্রচার করত। সে আমলকে ঈমান থেকে পৃথক বলত না যেমনটি পরবর্তী মুরজিয়াগণ বলেছেন। আবার খাওয়ারিজদের মত কবীরা গোনাহ কারীকে কাফেরও বলত না। তার বক্তব্য ছিল ইবাদত করা ও পাপ বর্জন করা ঈমানের মূল কোন বিষয় নয় যে, তা না থাকলে মূল ঈমান থাকবে না।

---

১. الفرق بين الفرق ، صـ/٢٠٢، طبع بيروت ، دار المعارف ـ ॥
২. الملل والنحل ، جـ/١، صـ/١٣٩، طبع مصر ، ١٣٩٦هـ/١٩٧٦م ـ ॥
৩. تاريخ المذاهب الاسلامية ، جـ/١، صـ/١١٩، طبع دار الفكر العربى ١٩٨٧م ـ ॥

"মুরজিয়া"-দের দল/উপদল ঃ

মৌলিক ভাবে এই ফিরকাটি চার দলে বিভক্ত। যথা ঃ

১. খাওয়ারিজ মনোভাবাপন্ন মুরজিয়া (مرجئة الخوارج)

২. কাদরিয়া মনোভাবাপন্ন মুরজিয়া (المرجئة القدرية)যেমনঃ গায়নান দামেশ্কী, মুহাম্মাদ ইবনে শাবীব বসরী প্রমুখ এই শ্রেণীভুক্ত ছিল।

৩. জাবরিয়া মনোভাবাপন্ন মুরজিয়া (المرجئة الجبرية)

৪. খালেস মুরজিয়া (المرجئة الخالصة)

খালেস মুরজিয়াদের মধ্যে ৫টি ফিরকা রয়েছে। যথাঃ

১. ইউনুসিয়্যা (اليونسية) এরা ইউনুস ইব্নে আওন আন-নামীরী-র অনুসারী।

২. গাছ-ছানিয়া (الغسانية) এরা গাছছান কুফী-র অনুসারী।

৩. ছাওবানিয়া (الثوبانية) এরা আবূ ছাওবান-এর অনুসারী।

৪. তূমানিয়্যা (التومنية) এরা আবূ মুআয আত-তূমানী-এর অনুসারী।

৫. উবায়দিয়্যা (العبيدية) এরা উবাদ আল-মুক্তাইব-এর অনুসারী।

এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কতিপয় উলামায়ে কেরাম ফিরকায়ে মুরজিয়াকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যথাঃ

১. হকপন্থী মুরজিয়া (مرجئة السنة)

২. বিদআতী মুরজিয়া (مرجئة البدعة)

"হকপন্থী মুরজিয়া" বলে বোঝানো হয়েছে ঐসব লোকেদেরকে, যারা বলেনঃ কেউ কবীরা গোনাহ করলে তার পাপ পরিমাণ তাকে শাস্তি দেয়া হবে। সে অনন্তকাল জাহান্নাম বাসী হবে না। বরং এরূপ কারও কারও ক্ষেত্রে আল্লাহ শাস্তি প্রদান ব্যতীতও ক্ষমা করে দিবেন। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী অধিকাংশ ফোকাহা ও মুহাদ্দিছীন এই শ্রেণী ভুক্ত হয়ে যান। আর "বিদআতী মুরজিয়া" বলে ঐসব মুরজিয়া মতাদর্শের অনুসারীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা জমহুরের নিকট মুরজিয়া নামে পরিচিত, যাদেরকে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বহির্ভূত ভ্রান্ত ফিরকা হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

ফিরকায়ে মুরজিয়া-র মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস ও মতাদর্শ ঃ

১. নাজাতের জন্য- ঈমানই যথেষ্ট। ইবাদতের কোন উপকারিতা নেই, পাপেও কোন ক্ষতি নেই।

(আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলেনঃ কোন ঈমানদার ব্যক্তি পাপ করলে তাতে কোন ক্ষতি নেই-একথা আমরা বলি না। তার ব্যাপারে আমরা নিরাপত্তা বোধ করি না তবে নেককার লোকদের ক্ষমা প্রাপ্তির আশা রাখি। -আকীদাতুত্তাহাবী।)

২. আরশ আল্লাহ্র থাকার স্থান।[১]

১. كما في مقدمة عقيدة الطحاوى ॥

৩. নারীগণ বাগানের ফুলের ন্যায়। যে ইচ্ছা সে ভোগ করতে পারে- বিবাহ ইত্যাদির প্রয়োজন নেই।[১] (এটা এত জঘন্ন আকীদা যে, এতে করে যেনা-র মত হারামকে হালাল আখ্যায়িত করা হয়ে যায়।)

৪. আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-কে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। মুরজিয়াদের উবায়দিয়া ফিরকা এর প্রবক্তা।[২]

জাহ্মিয়্যাহ

(الجهمية)

ফিরকায়ে "জাহ্মিয়্যাহ"-এর নামকরণ হয়েছে এই ফিরকা-র প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা জাহ্ম ইব্নে সাফওয়ান-এর নামের প্রতি সম্পৃক্ত করে। এই ফিরকা-কে "মুআত্তিলাহ"-ও বলা হয়। "মু'আত্তিলাহ" শব্দটি تعطيل ক্রিয়ামূল থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ বেকার বা নিষ্ক্রীয় করা। এ দলটি আল্লাহ্র صفات বা গুণাবলীকে অস্বীকার করার দ্বারা আল্লাহ্কে যেন বেকার ও নিষ্ক্রীয় করে ফেলেছে- এ প্রেক্ষিতেই তাদের এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। কতক উলামায়ে কেরামের মতে "মুয়াত্তিলাহ" ও "জাহ্মিয়্যাহ" এক নয় বরং মুয়াত্তিলাহ হল মূল দলের নাম আর জাহ্মিয়্যাহ হল তার একটি শাখা দল।

বনূ উমাইয়া শাসনামল[৩] -এর শেষ দিকে তৎকালীন খোরাসানের অন্তর্গত সমরকন্দ (মতান্তরে তির্মীয)-এর অধিবাসী জাহ্ম ইব্নে সাফওয়ান[৪] কর্তৃক এ দলটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। খোরাসান ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকা ছিল তার মতাদর্শ প্রচারের ক্ষেত্র। আল্লামা শাহ্রাস্তানী বলেনঃ তার নতুন মতাদর্শের প্রথম প্রকাশ ঘটে তিরমীযে। তার মৃত্যুর পর তার অনুসারীরা নেহাওয়ান্দ অঞ্চলে এই মতাদর্শ প্রচারের কেন্দ্র বানিয়ে সেখানেই তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখে।

ইমাম আবূ জুহ্রা বলেনঃ[৫] উমাইয়া শাসনামলের প্রথম দিকেই এই ফিরকাটির جبر (মানুষ মাজবূর বা অক্ষম) সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ ও প্রধান দর্শনটির প্রচার ঘটতে শুরু হয়। অবশেষে উমাইয়া শাসনামলের শেষ দিকে এটি একটি স্বতন্ত্র মতাদর্শে রূপ নেয়।

জাহ্ম ইব্নে সাফ্ওয়ান প্রসিদ্ধ যিন্দীক জা'দ ইব্নে দির্হাম (جعد بن درهم)-এর শীষ্য ছিল। এই জা'দ ইব্নে দির্হামই প্রথম "কুরআন মাখ্লূক" خلق قرآن (অর্থাৎ, কুরআন নশ্বর সৃষ্টি) সংক্রান্ত দর্শন-এর প্রবর্তন ঘটায়। এ-ই প্রথম আল্লাহ্র গুণাবলীকে অস্বীকার করে। এভাবে যিন্দীক হয়ে যাওয়ার ফলে ১২৪ হিজরীতে তাকে হত্যাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। জাহ্ম ইব্নে সাফওয়ান তার গুরু জা'দ ইব্নে দিরহাম থেকেই জাহ্মিয়্যাহ দর্শন গ্রহণ করে। এ কারণেই জা'দ ইব্নে দিরহামকে জাহ্মিয়্যাহ মতাদর্শের প্রথম দাঈ বলা হয়ে থাকে। এক মতে[৬] জা'দ ইব্নে দিরহাম আবান ইব্নে সুম্'আন থেকে এবং সে তালূত ইব্নে আ'সাম (طالوت ابن اعصم) নামক ইয়াহুদী থেকে এই মতাদর্শ গ্রহণ করে। ১২৮/৭৪৫ খৃঃ উমাইয়্যা

১. مقدمة عقيدة الطحاوى ॥ ২. المصدر السابق ॥ ৩. (৪০-১৩২ হিঃ/৬৬১-৭৫০ খৃঃ) ॥ ৪. جهم بن صفوان মৃত ১২৮ হিঃ/৭৪৫ খৃঃ ॥ ৫. تاريخ المذاهب الاسلامية، ج/১، صـ/১০৪، طبع ॥ ايضا. نقلا عن شرح العيون فى رسالة ابن زيدون - ৬. ॥ مصر، دار الفكر العربى ১৯৮৭م

শাসকদের বিরুদ্ধে ফিতনা বিস্তারে অংশ গ্রহণ ও নাস্‌র ইব্‌নে সাইয়্যার-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার দায়ে মুসলিম ইব্‌নে আহ্‌ওয়াজ মাঝিনী জাহ্‌ম ইব্‌নে সাফওয়ানকে মার্ব শাহরে হত্যা দন্ড প্রদান করে।[১]

আল্লামা শাহরাস্তানী[২]-এর মতে জাহমিয়্যাহ ফিরকাটি "জাবরিয়্যাহ" (الجبرية الخالصة) ফিরকা-র অন্তর্ভুক্ত। তিনি এটিকে এমন কোন মৌলিক ফিরকা হিসেবে গণ্য করেননি যার আরও অনেক শাখা-ফিরকা রয়েছে। ঐতিহাসিক ইমাম আবূ জুহ্‌রা মিসরীও এই মতের সমর্থক। কোন কোন আলেমের মতে জাহ্‌মিয়্যাহ "মুআত্‌তিলাহ্‌" ফিরকার একটি শাখা বিশেষ। কারী মুহাঃ তাইয়্যেব (রহঃ) আকীদাতুত্তাহাবী গ্রন্থের ভূমিকায় জাহ্‌মিয়্যাহ-কে একটি মৌলিক ফিরকা হিসেবে গণ্য করেছেন, যার ১২টি শাখা ফিরকা রয়েছে। যথাঃ

১. মাখ্‌লূকিয়্যাহ (مخلوقية) ২. গাইরিয়্যাহ (غيرية)
৩. ওয়াকিইয়্যাহ্‌ (واقعية) ৪. খায়রিয়্যাহ্‌ (خيرية)
৫. যানাদিকাহ্‌ (زنادقة) ৬. লফ্‌যিয়্যাহ্‌ (لفظية)
৭. রাবিইয়্যাহ্‌ (رابعية) ৮. মুতারাকিবিয়্যাহ্‌ (متراقبية)
৯. ওয়ারিদিয়্যাহ্‌ (واردية) ১০. ফানিয়্যাহ্‌ (فانية)
১১. হুরাকিয়্যাহ্‌ (حرقية) ১২. মু'আত্‌তিলিয়্যাহ্‌ (معطلية)

ফিরকায়ে জাহ্‌মিয়্যাহ-র মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস ঃ

১. আল্লাহ তা'আলাকে এমন কোন গুণে গুণান্বিত করা জায়েয নয় যে গুণ কোন মাখ্‌লূকের উপর প্রযোজ্য হতে পারে। কেননা এতে আল্লাহকে মাখ্‌লুকের সাথে সাদৃশ্য বিধান করা হয়, অথচ আল্লাহ কোন মাখ্‌লূকের মত নন। এ কারণেই তারা আল্লাহ্‌র জীবিত (حي) হওয়া, জ্ঞানী (عالم) হওয়া, ইচ্ছা পোষণকারী (مريد) হওয়া প্রভৃতি গুণাবলীকে রদ করে থাকে। তবে আল্লাহ্‌র শক্তিশালী (قادر) হওয়া, স্রষ্টা (خالق) হওয়া, অস্তিত্ব দানকারী (موجد) হওয়া, জীবন দানকারী (محيي) হওয়া এবং মৃত্যু দানকারী (مميت) হওয়াকে তারা স্বীকার করে। যেহেতু এসব গুণাবলী কোন মাখ্‌লূকের উপর প্রযোজ্য হয় না।

২. মু'তাযিলা ও কাদ্‌রিয়্যা-এর ন্যায় তারা আল্লাহর কালামকে নশ্বর সৃষ্টি (مخلوق) মনে করে।

(আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল-আল্লাহ্‌র কালাম-কুরআন নশ্বর সৃষ্টি নয় বরং তা অবিনশ্বর غير مخلوق)

৩. জাব্‌রিয়্যাহ্‌ ফিরকার ন্যায় তারা মনে করে যে, মানুষ নিতান্তই মাজবূর। অর্থাৎ, কোন শক্তি, কোন ইরাদা, কোন এখতিয়ার তার নেই। মানুষ অমুক কাজ করে, অমুক কাজ করে-এভাবে মানুষের প্রতি যে সব ক্রিয়াকে সম্পৃক্ত করা হয় তা রূপক অর্থেই করা হয়ে থাকে। যেমনঃ গাছের ফল দেয়া, পানির প্রবাহিত হওয়া, সূর্যের উদিত অস্তমিত হওয়া, পাথরের নড়া প্রভৃতি ক্রিয়াগুলিকে রূপক অর্থেই সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে।

(এক্ষেত্রে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল মানুষ সম্পূর্ণ মাজবূর (مجبور محض) নয়, আবার পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতার অধিকারী (قادر مطلق)-ও নয়। এতদুভয়ের মাঝেই

১. المنجد في اللغة والاعلام ॥
২. الملل والنحل، جـ١، صـ٦٨، طبع مصر، ١٣٩٦هـ/١٩٧٦ ॥

হল ইসলামের অবস্থান। সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে মানুষ মাজবূর, তবে কর্ম (كسب)-এর ক্ষেত্রে তার এখ্‌তিয়ারের দখল রয়েছে। বান্দার কোন ইরাদা হতে পারেনা যদি আল্লাহ্‌র ইরাদা না হয়।)

৪. জান্নাতে জান্নাতীদের উপভোগ সম্পন্ন হওয়ার পর এবং জাহান্নামে জাহান্নামীদের দূর্ভোগ পোহানো সম্পন্ন হওয়ার পর জান্নাত জাহান্নাম ধ্বংস হয়ে যাবে। জান্নাত জাহান্নাম চিরস্থায়ী নয়। কুরআনে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের চিরস্থায়ী হওয়ার যে বর্ণনা রয়েছে সে গুলিকে তারা তাকিদ ও মুবালাগা অর্থে গ্রহণ করেছে।

(এ বিষয়ে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল- জান্নাত জাহান্নাম এমন দুটো সৃষ্টি যা অনন্তকাল থাকবে, কখনও ধ্বংস হবে না।)

৫. ঈমান হল অন্তরের বিষয়, মুখের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। অতএব কারও অন্তরে যদি ঈমান (অর্থাৎ, পরিচিতি معرفت) থাকে আর মুখে সে অস্বীকার করে, তাহলে সে মু'মিনই থাকবে, কাফের হয়ে যাবে না। কারণ ঈমান বলা হয় পরিচয় (معرفت)-কে আর কুফ্‌র বলা হয় পরিচয় না থাকাকে।

৬. ঈমানের মধ্যে কোন বিভক্তি নেই। অর্থাৎ, অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি ও আমল-এই তিন ভাগে ঈমান বিভক্ত নয়। অতএব ঈমানদারদের ঈমানের মধ্যে কোন মানগত উঁচু নীচুর পার্থক্য নেই। নবীদের ঈমান এবং উম্মতের ঈমানের মধ্যে কোন মানগত পার্থক্য নেই-সকলের ঈমানই একই মানের। কারণ ঈমান বলা হয় পরিচয়কে আর পরিচয়ের মধ্যে এমন কোন মানগত পার্থক্য ঘটে না।

৭. মু'তাযিলাদের ন্যায় তারাও মনে করে পরকালে আল্লাহর দীদার (رويت باري) হবে না।

(আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল জান্নাতীদের আল্লাহর দীদার নসীব হবে।)

৮. তারা মালাকুল মাউত-কে অস্বীকার করে। তাদের মতে রূহ সরাসরি আল্লাহ কবজ করেন। মালাকুল মউত-এর সাথে এর সম্পর্ক নেই। এমনিভাবে তারা আলমে বারযাখ্‌, কবরে মুনকার নাকীরের সওয়াল ও হাউযে কাউছার-এর বিষয়গুলিকেও অস্বীকার করে। তাদের মতে এগুলো কল্পিত বিষয়।

(আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে জগৎ সমূহের রূহ কব্‌জ করার দায়িত্বে রয়েছেন মালাকুল মউত। তারা কবরে আযাব/আরাম, রব, নবী ও দ্বীন সম্পর্কে মুন্‌কার নাকীরের সওয়াল, হাউযে কাউছার -এসব বিষয়ে বিশ্বাস রাখে। এ সব বিষয় সম্পর্কে ১ম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।)

কাররামিয়্যাহ (الكرامية)

এ দলটি (কাররামিয়্যাহ)-এর প্রতিষ্ঠাতা আবূ আব্‌দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌নে কার্‌রাম[১]

১. কেউ কেউ শব্দটাকে "কিরাম" উচ্চারণ করেছেন। অধিকাংশের মতে শব্দটির উচ্চারণ কার্‌রাম। সামআনী-র মতে আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ-এর পিতা আঙ্গুর গাছের রক্ষণাবেক্ষণকারী ছিল বিধায় তাকে কাররামী (كرامي) বলা হত। উল্লেখ্য كرم-শব্দের এক অর্থ হল আঙ্গুর গাছ ॥

সিজিস্তানী (ابو عبدالله محمد بن كرام السجستاني)-এর দিকে সম্পৃক্ত করে এ দলটিকে কার্‌রামিয়্যাহ বলা হয়। কথিত আছে তিনি ১৯০ হিঃ মোতাবেক ৮০৬ খৃষ্টাব্দে সীস্তান/সিজিস্তান-এর অন্তর্গত যারান্‌জ (زرنج)-এর নিকটবর্তী একটি স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এজন্য তার পদবী হয় সিজিস্তানী।

কেউ কেউ এ দলটির মতবাদে আল্লাহ্‌র প্রতি মানবত্ব আরোপ (التجسيم) ও আল্লাহ্‌কে মানবগুণ সম্পন্ন বলা তথা নরাত্বারোপবাদী (التشبيه)-এর চিন্তা ভাবনা থাকায় এ দলটিকে মুজাস্‌সিমা (مجسمة) ও মুশাব্‌বিহা বা সাদৃশ্যবাদী (مشبهة) দলভুক্ত হিসেবে গণ্য করেছেন।

শুরুতে ইব্‌নে কার্‌রাম সিজিস্তানে তার স্বরচিত গ্রন্থ عذاب القبر-এর মতবাদ প্রচার শুরু করেন। যার মধ্যে মুন্‌কার নাকীর নামক ফেরেশ্‌তাদ্বয় ও কিরামান কাতিবীন-কে অভিন্ন বলে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এ কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়ায় স্থানীয় গভর্নর তাকে সিজিস্তান থেকে বহিস্কার করেন। পরে তিনি গুরজিস্তান ও খুরাসানের সাধারণ মানুষের মধ্যে তার মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। এই প্রচার কালে তিনি সুন্নী ও শী'আ উভয় দলকে আক্রমণ করতে থাকেন। এখান থেকে তিনি তাঁতী ও নিম্ন শ্রেণীর অনুসারীদেরকে নিয়ে নিশাপূরে উপস্থিত হলে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদের আশংকায় সেখানকার গভর্নর তাকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। সুদীর্ঘ ৮ বৎসর কারাভোগের পর ২৫১ হিজরী মোতাবেক ৮৬৫ সালে কারাগার থেকে মুক্তি পান। তারপর নিশাপূর ত্যাগ পূর্বক জেরুজালেমে গমন করেন। এখানেই বাকী জীবন অতিবাহিত করেন। ২৫৫ হিজরীর সফর মাস মোতাবেক ৮৬৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী/ফেব্রুয়ারীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

কাররামিয়াদের উপদল ঃ

শাহ্‌রাস্তানীর বর্ণনা মতে কাররামিয়্যাদের ১২টি উপদল ছিল। তন্মধ্যে নিম্মোক্ত ৬টি উপদলের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ

১. আল আবিদিয়্যাহ (العابدية) ২. আননূনিয়্যাহ (النونية)
৩. আয-যারীনিয়্যাহ (الزرينية) ৪. আল-ইসহাকিয়্যাহ (الاسحاقية)
৫. আল-ওয়াহিদিয়্যাহ (الواحدية) ৬. আল-হাইসামিয়্যাহ (الهيصمية)

আব্দুল কাহের বাগ্‌দাদী বলেছেন খুরাসানী কার্‌রামিয়্যাদের নিম্নোক্ত ৩ টি উপদল ছিল। তবে তারা একে অপরকে কাফের বা ধর্ম বিরোধী আখ্যায়িত করত না বিধায় তিনি তাদেরকে এক দল বলেই গণ্য করেছেন। দল তিনটি এই ঃ

১. হাকাইকিয়্যাহ (حقائقية)
২. তারাইকিয়্যাহ (طرائقية)
৩. ইসহাকিয়্যাহ (اسحاقية)

কাররামিয়্যাদের কয়েকটি মতবাদ ঃ

কার্‌রামিয়্যাদের অভিনব মতবাদের সংখ্যা অগণিত বলা যায়। তন্মধ্যে বিশেষ কয়েকটি হল ঃ

১. পূর্বে বর্ণিত হয়েছে ইব্‌নে কার্‌রামের স্বরচিত গ্রন্থ আযাবুল কবরে (عذاب القبر) এ মুন্‌কার নাকীর নামক ফেরেশতাদ্বয় ও কিরামান কাতিবীন-কে অভিন্ন বলে দেখানো হয়েছে।

২. আল্লাহ্‌র প্রতি মানবত্ব আরোপ (التجسيم) ও আল্লাহ্‌কে মানুষের সাথে সাদৃশ্য বিধান। (التشبيه)। ইব্‌নে কার্‌রাম মনে করতেন আল্লাহ এমন এক শরীরী সত্তা, যার সীমা ও প্রান্ত রয়েছে দুই দিক থেকে, নীচ দিক থেকে এবং তাঁর যে অংশ আরশের সাথে সংযুক্ত সেই দিক থেকে। ইব্‌নে কার্‌রাম তার "আযাবুল কবর" গ্রন্থের ভূমিকায় আল্লাহ্‌কে জওহার (جوهر) বা মূলসত্তা বলে আখ্যায়িত করেছেন। আব্দুল কাহের বাগ্‌দাদীর মতে এভাবে তিনি খৃষ্টীয় বিশ্বাসের দিকে অগ্রসর হন। কারণ খৃষ্টানগণ আল্লাহকে جوهر বা মূল সত্তা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৩. তারা আল্লাহ্‌র ভারত্ব আছে বলে মনে করত। আল্লাহর বাণী اذا السماء انفطرت (যখন আকাশ ফেটে যাবে)-এতে তারা বলত আসমান ফেটে যাবে আল্লাহর ভারে।

৪. ইব্‌নে কার্‌রাম الرحمن على العرش استوى (দয়াময় আরশে সমাসীন)-এর ব্যাখ্যায় বলত আরশের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার শারীরিক ছোয়ার সম্পর্ক বিদ্যমান, আরশ হল আল্লাহ্‌র অবস্থানের স্থান।

৫. তারা মনে করত আল্লাহ্‌র সত্তা অনিত্ব গুণাবলী (حوادث)-এর আধার। ইচ্ছা, অনুভূতি, দর্শন, বাকশক্তি এগুলি হল অনিত্ব বিষয় (حادث) আর আল্লাহ্ হলেন এসব অনিত্ব বিষয়ের আধার (محل حوادث)।

৬. তাদের ধারণা। আল্লাহ্‌র সর্ব প্রথম সৃষ্টি এমন প্রাণ বিশিষ্ট কোন শরীরী সত্তা হওয়া উচিত, যা উপদেশ গ্রহণ করতে সক্ষম। এর বিপরীত কোন জড়বস্তুকে প্রথমে সৃষ্টি করা হেকমত পরিপন্থী।

(এ বক্তব্যের ভিত্তিতে যে হাদীছে বলা হয়েছে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন, অতপর তাকে লওহে মাহফূজে কিয়ামত পর্যন্ত সবকিছু লিখে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন, তা প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়।)

৭. কার্‌রামিয়্যাগণ মনে করত-যে শিশুদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র জানা আছে যে, বড় (বালেগ) হলে তারা ঈমান আনত, তাদের মৃত্যু ঘটানো আল্লাহ্‌র হেকমত অনুসারে সম্ভব নয়।

(এতে করে নবী করীম (সাঃ)-এর পুত্র ইব্রাহীম এবং অন্য নবীগণের যেসব পুত্রের শিশুকালে মৃত্যু ঘটেছে তাদের ব্যাপারে এই কু-ধারণা পোষণ করা অবধারিত হয়ে যায় যে, তারা বড় হলে কাফের হত - আল্লাহ তাআলার এমনই জানা ছিল।)

৮. কাররামিয়্যাগণ বলত ! যে সব গোনাহের কারণে সততা (عدالت) রহিত হয়ে যায় বা হদ্দ (حد) জারী হয় এমন পাপ থেকে নবীগণ মা'সূম (معصوم) বা নিষ্পাপ ছিলেন। এর চেয়ে নীচু পর্যায়ের পাপ থেকে তারা মা'সূম ছিলেন না।

(আহ্‌লে হকের মতে নবীগণ সগীরা কাবীরা সব ধরনের পাপ থেকেই মা'সূম। এ প্রসঙ্গে পরবর্তিতে "ইস্‌মতে আম্বিয়া প্রসঙ্গ" শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন পৃঃ নং ৪০৪।)

৯. তারা বলত ঈমান হল শুধু মুখে স্বীকৃতি প্রদান (اقرار باللسان)-এর নাম। অন্তরের বিশ্বাস (تصديق بالقلب) না থাকলেও চলে, আমল না থাকলেও চলে। এ কারণে তাদের মতবাদ ছিল যে, একবার কেউ মুখে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমানের সাক্ষ্য প্রদান করলে তার ঈমান চিরস্থায়ী হয়ে যায়, এমনকি মনে প্রাণে রেসালাতকে অবিশ্বাস করলেও তার ঈমান বিনষ্ট হয় না। কেবল মুরতাদ হলেই তার ঈমান বিনষ্ট হয়।

(এমন হলে মুনাফিকদের সম্পর্কে জাহান্নামের তলদেশে থাকার হুশিয়ারী প্রদানের কোন হেতু ছিল না। কারণ তারা মুখে ঈমান আনয়নের কথা ব্যক্ত করত। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

ان المنافقين فى الدرک الاسفل من النار -

অর্থাৎ, মুনাফিকগণ জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। [সূরাঃ ৪-নিসা ঃ ১৪৫])

১০. খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগের ব্যাপারে তাদের মত ছিল - একমাত্র জাতির সর্বসম্মত মতের ভিত্তিতেই তা হতে হবে।

(এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত-এর মত হল পূববর্তী খলীফা কর্তৃক মনোনয়নের পদ্ধতিও বিশুদ্ধ। যেমন হযরত ওমর [রাঃ] হযরত আবূ বকর সিদ্দীক [রাঃ] কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলেন।)

কার্‌রামিয়্যাদের শেষ শক্তিশালী আশ্রয় ছিল মধ্য আফগানিস্তানের পর্বত বেষ্টিত অঞ্চল গূর। গূরী সুলতান গিয়াসুদ্দীন মুহাম্মাদ (মৃত ৫৯৯/১২০২-৩) এবং তার ভাই মুইযুদ্দীন মুহাম্মাদ (মৃত ৬০২/১২০৫-৬)-এর কার্‌রামিয়্যা মতবাদের সাথে একাত্মতার সুবাদে এমনটি হয়েছিল। পরবর্তীতে এতদাঞ্চলে মোঘল আক্রমণের পর কার্‌রামিয়্যাদের এতদাঞ্চলে তৎপরতার আর কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। হয়ত খোরাসানের ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের ফলে তারা ছত্রভঙ্গ ও বিলীন হয়ে গিয়ে থাকবে।[১]

* আধুনিক এ'তেকাদী ফিরকাসমূহ ঃ

বাহায়ী

এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মির্যা হোসেন আলী ইব্‌নে আব্বাস। পরে তিনি বাহাউল্লাহ (আল্লাহ্‌র ঐশী জ্যোতি) উপাধী গ্রহণ করেন। এই উপাধীতে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। তার নামের দিকে সম্পৃক্ত করেই তার মতবাদ সম্বলিত ধর্ম বাহায়ী ধর্ম নামে পরিচিতি লাভ করে।

মির্যা হোসেন আলী বাহায়ী ১৮১৭ সালের নভেম্বর মাস মোতাবিক ১২৩৩ হিজরীর মুহাররম মাসে তেহরান মহানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন ইরানের একজন মন্ত্রী এবং পরবর্তীতে শাহের প্রধান সচিব। তিনি ছিলেন একজন সম্পদশালী আমীর।

১. الفرق بين الفرق ، الملل والنحل ও ইসলামী বিশ্বকোষ, ৭ খণ্ড - প্রভৃতি থেকে গৃহীত ॥

১৮৯২ সালের মে মাস মোতাবিক ১৩০৯ হিজরীতে মির্যা হোসেন আলী বাহায়ী প্যালেস্টাইনের বাহুজীতে ইন্তেকাল করেন। ইসরাঈলের কার্মেল পর্বতের পাদদেশে তাকে কবর দেয়া হয়।[১]

বাহায়ী ধর্মের গোড়ার কথা ঃ

বাহায়ী ধর্মের মূল উদ্‌গাতা ছিলেন মির্যা আলী মুহাম্মাদ বাব। তার মূল নাম আলী মুহাম্মাদ।[২] পরে তিনি "বাব"[৩] উপাধী গ্রহণ করেন।[৪] মির্যা আলী মুহাম্মাদ বাব ১৮২০ সালের ৯ই অক্টোবর মতান্তরে ১৮১৯ সালের ২০ অক্টোবর পারস্যের শীরাজ নগরীর এক শী'আ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মুহাম্মাদ রিদা, মাতার নাম ফাতেমা।[৫] মির্যা আলী মুহাম্মাদ বাব শায়খ কাজেম রাশতীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই কাজেম রাশতী মনে করতেন যে, ইমামে গায়েব-এর আত্মপ্রকাশকাল নিকটে এসে গেছে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ইমামে গায়েব তথা মাহ্‌দী মুনতাজার (প্রত্যাশিত মাহ্‌দী)-কে তালাশ করার জন্য তাঁর মুরীদানকে ইরানের সর্বত্র পাঠিয়েছিলেন। রাশতীর মৃত্যুর চার মাস পর মোল্লা হুসাইন নামক তাঁর এক নিবেদিত প্রাণ মুরীদ আলী মুহাম্মাদকে সত্যের "বাব" বলে মন্তব্য করেন।[৬]

অপর দিকে আলী মুহাম্মাদ বাব নিজেও এ মর্মে ঘোষণা করেন যে, "বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থে বর্ণিত দিব্যি বার্তা বাহকের আগমন নিকটবর্তী। তিনি নিজেকে ইসলামে বর্ণিত "ইমাম মাহ্‌দী" বলে উল্লেখ করেন।[৭] ১৮৪৪ সালের ৩০শে মে তারিখে বাব নিজেকে ঈশ্বরের অবতার বলে ঘোষণা দেন।[৮]

আলী মুহাম্মাদ বাব ও তার অনুসারীরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অশালীন ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে বার বার অহেতুক চ্যালেঞ্জ ছুড়তে থাকে। যা মুসলিম উম্মাহকে চরমভাবে মর্মাহত করে তোলে। তদুপরি আলী মুহাম্মাদ বাব তার "আল বয়ান" নামক কিতাবে এ মর্মে ঘোষণা করেন যে, আল বয়ান ছাড়া অন্য কোন কিতাব পাঠ করা মানুষের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যারা বাবের মতবাদ গ্রহণ না করবে তাদেরকে হত্যা করতে হবে। যারা বাবী ধর্ম গ্রহণ না করবে তাদের সম্পত্তি কেড়ে নিতে হবে। রাজার জন্য

১. তথ্যসূত্র ঃ বাহাউল্লাহ, বাহাই একটি ভ্রান্ত ধর্ম ও بدائع الكلام ॥

২. তিনি প্রথমে শী'আ মতাবলম্বী ছিলেন। এ থেকে কেউ কেউ বাহাই ধর্মকে শী'আ ধর্মের শাখা হিসেবে গণ্য করে থাকেন। তবে পরবর্তীতে বাহাইগণ শী'আ মতাদর্শ থেকে ভিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র মতাদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় ॥

৩. 'বাব' অর্থ দ্বার। বাব ছিলেন পৃথিবীতে নতুন স্বর্গীয় সাম্রাজ্যের প্রবেশ-দ্বার। নব নিকুঞ্জ, পৃষ্ঠা ২৬, প্রকাশক-বাংলাদেশের জাতীয় বাহাই আধ্যাত্মিক পরিষদ, দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ২০০০ ইং ॥

৪. ১৮৪৪ সালের ২৩ শে মে তারিখে তিনি নিজেকে বা'ব (স্বর্গীয় সাম্রাজ্যের প্রবেশ-দ্বার/ঐশ্বরিক জ্ঞানের প্রবেশপথ) উপাধিতে ভূষিত করেন। বাহাই একটি ভ্রান্ত ধর্ম পৃ, ৫৬ ॥ ৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৫ তম খ, পৃ. ৫৩৬ ॥ ৬. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৫তম খ, পৃ. ৫৩৭ ॥ ৭. বাহাই একটি ভ্রান্ত ধর্ম, পৃঃ ৯ ॥

৮. নব নিকুঞ্জ, পৃষ্ঠা ২৭, প্রকাশক-বাংলাদেশের জাতীয় বাহাই আধ্যাত্মিক পরিষদ, দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ২০০০ ইং ॥

কর্তব্য হবে কোন অ-বাবীকে তার রাজ্যে জায়গা না দেয়া।[১] "অবশেষে একদিন যখন বাবের অনুসারীরা শীরাজ নগরীর একস্থানে আযান দেয়ার সময় ধৃষ্টতা পূর্বক এই বাক্য যোগ করে, আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে, আলী নাবীল (অর্থাৎ আলী মুহাম্মাদ বাব)-এর সম্মুখে ঐশ্বরিক আয়না সমূহের আয়না রয়েছে"।[২] এভাবে একটি ভ্রান্ত ধর্মের প্রবর্তন ও বাড়াবাড়ির কারণে মুসলিম জনগণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়, এখন উলামায়ে কেরাম এর বিরুদ্ধে প্রচন্ড প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

অবশেষে ধর্মত্যাগ, মুসলিম জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও রাষ্ট্রের শান্তি ভঙ্গের অপরাধে ১৮৫০ সালের ৯ই জুলাই ৩০ বৎসর বয়সকালে আলী মুহাম্মাদ বাবকে পারস্যের অন্তর্গত তাব্রিজের সেনা-নিবাসে মৃত্যুদন্ড প্রদান করে রাখা হয়।[৩]

আলী মুহাম্মাদ বাবকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করার পর ইয়াহ্ইয়া নামক এক ব্যক্তি "সুবহে আযল" ছদ্মনাম ধারণ করে বাবীদের নেতৃত্ব প্রদান করে। তার নেতৃত্বে বাবীগণ সংগঠিত হয়ে তাদের ধর্মগুরু হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ১৮৫২ সালে তৎকালীন পারস্য সম্রাটের উপর ব্যর্থ হামলা চালায়।

এই হামলায় হোসেন আলী ওরফে "বাহাউল্লাহ" অন্যতম আসামী ছিলেন। যিনি আলী মুহাম্মাদের একজন গোড়া সমর্থক ছিলেন। কৃত অপরাধের জন্য তাকে তথা হতে গ্রেফতার করে তেহরানের ভূ-গর্ভস্থ অন্ধকার এক কারাগারে বন্দী করা হয়।[৪]

কারাগারে থাকা অবস্থায় ১৮৬৩ সালের ২১ শে এপ্রিল তিনি নিজেকে এক স্বতন্ত্র শরী'আত দাতা হিসেবে দাবী করেন এবং নিজেকে ইশ্বরের অবতার বা রাসূল হওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এ সম্পর্কে তার বক্তব্য হল ঃ

"একদিন রাত্রিকালে অন্ধকার কূপে আমি স্বপ্নাবস্থায় শুনিতে পাইলাম, চতুর্দিক হইতে যেন নিম্ন লিখিত বাণী উচ্চারিত হইতেছে- " সত্যিই তোমার স্বকীয় শক্তি ও লেখনী দ্বারা তোমাকে জয়যুক্ত করিতে আমরা সাহায্য করিব। তুমি বর্তমান সময়ে যে দুরাবস্থার মধ্যে কাল অতিবাহিত করিতেছ তাহার জন্য দুঃখিত হইয়ো না। তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। যেহেতু তুমি নিরাপদেই আছ। অনতিবিলম্বে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর অমূল্যরত্ন সমূহ আহরণ করিয়া দিবেন এবং তাহারাই হইতেছে সেই সকল রত্ন- যাহারা তোমাকে আশ্রয় করিয়া তোমারই নাম অবলম্বন করিয়া তোমাকে সাহায্য করিবে। ঐ নামের দ্বারাই আল্লাহ তা'আলার আস্থাভাজন ব্যক্তিদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিবে নতুন প্রেরণার উৎস।"[৫]

তিনি আরো বলেনঃ "অতীতে শ্রীকৃষ্ণ, মহাত্মা বুদ্ধ, যীশু খ্রীষ্ট, হযরত মুহাম্মাদ এবং অন্যান্য অনেকের ভেতরেই সেই সত্য-সূর্য উদিত হয়েছিল। আজকের অন্ধকার যুগে ঈশ্বরের জ্যোতি-বাহাউল্লাহর ভেতর দিয়েই আবার সত্য-সূর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমাদের

১. বাহাই একটি ভ্রান্ত ধর্ম, পৃঃ ৯ ॥ ২.ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৫তম খন্ড ॥ ৩. বাহাই একটি ভ্রান্ত ধর্ম, পৃষ্ঠা ৯ ॥ ৪. বাহাই একটি ভ্রান্ত ধর্ম, পৃষ্ঠা ১০ ॥ ৫. বাহাউল্লাহ, বাংলাদেশের জাতীয় বাহাই আধ্যাত্মিক পরিষদ "জাতীয় বাহাই কেন্দ্র" কর্তৃক প্রকাশিত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃ, ৬-৭ ॥

সেই পুরাতন মাটির প্রদীপ বা গলে যাওয়া মোমবাতির আলো নিয়ে তৃপ্ত থাকার কোন প্রয়োজন নেই। সত্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। জাগো জাগো, উঠো সবাই।"[১]

বাহাউল্লাহ ছিলেন পারস্যের জনৈক প্রভাবশালী মুন্ত্রীর পুত্র। তাই বৃটিশ ও রাশিয়ান দূতাবাসের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত তিনি উক্ত অন্ধকার কারাগার হতে মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু মুসলিম জনতার রোদ্ররোষে তথায় বসবাস করা বাবীদের জন্য (যারা বাহাউল্লাহর যুগে বাহাই নাম ধারণ করেছিল) সম্ভব হয়ে উঠেনি। ফলে বাহাউল্লাহ্র নেতৃত্বে তারা বাগদাদে নির্বাসিত জীবন গ্রহণ করে। সেখানে থেকেই বাহাউল্লাহ তার মতবাদ মানুষের মাঝে প্রচার করতে থাকেন। তিনি আলী মুহাম্মাদ বাব কর্তৃক প্রবর্তিত বাবী মাযহাবের নীতি ও বাণী পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করে বাবী মাযহাবকে বাহাই মাযহাবে রূপদান করেন। আলী মুহাম্মাদ বাবকে তাই বাহাউল্লাহ্র পথিকৃত বলা হয়।[২]

অবশেষে ১৮৯২ সালের ২৯ শে মে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুবরণ করার পর ইসরাঈলের কার্মেল পর্বতে তার লাশ দাফন করা হয়। যেখানে বর্তমানে তাদের তীর্থ মন্দির অবস্থিত। এই তীর্থ মন্দিরকে "ইউনিভার্সেল হাউস অব জাষ্টিজ" বলা হয়। সেখান থেকেই সারা বিশ্বে বাহাই ধর্মের প্রচার কার্য পরিচালিত হয়ে থাকে।

বর্তমানে পৃথিবীর বহু দেশে বাহাইগণ বিস্তার লাভ করেছে। বাহাইদের একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯১৭ সালের মে মাস নাগাদ বাহাই ধর্ম ৩৪৩ দেশে, রাজ্যে ও দ্বীপ পুঞ্জের ১৩১৯৩৩ টির বেশী অঞ্চলে পৌঁছেছে। ৮০২টি ভাষায় এর লিখিত সাহিত্য রয়েছে। ১৭৯টি জাতীয় আধ্যাত্মিক পরিষদ রয়েছে। বাংলাদেশে বাহাইদের তৎপরতা সম্পর্কে যতটুকু ইতিহাস পাওয়া যায় তাহল বাহাউল্লাহর জীবদ্দশায়ই ১৮৭২ সালে সুলেমান খাঁন ওরফে জামাল এফেন্দী নামক জনৈক লোক বাহাউল্লাহর নির্দেশে সর্ব প্রথম এদেশে বাহাই ধর্ম প্রচার করতে আসেন। তিনি ঢাকা চট্টগ্রাম হয়ে পরবর্তীতে বার্মায় চলে যান। তার প্রচেষ্টায় চট্টগ্রামের আলীমুদ্দিন নামক জনৈক ব্যক্তি বার্মার রেঙ্গুনে সর্ব প্রথম এ ধর্ম গ্রহণ করে। ইতিহাসের বর্ণনা মতে, তিনিই হলেন সর্ব প্রথম বাহাই ধর্ম গ্রহণকারী বাঙ্গালী। ১৯৫২ সালে বাহাইরা ঢাকায় প্রথম স্থানীয় আধাত্মিক পরিষদ গঠন করে। ১৯৭২ সালে জাতীয় আধ্যাত্মিক পরিষদ গঠন করে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় সব কয়টি জেলাতেই স্থানীয় আধ্যাত্মিক পরিষদ আছে বলে তারা দাবী করে। ১৯৯৯ সালে তাদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ৩২ হাজার বাহাই রয়েছে। তন্মধ্যে রাজধানী ঢাকাতেই হল সাড়ে সাত হাজার। বর্তমানে বাংলাদেশে বাহাইদের প্রধান অফিস হল ঢাকার শান্তিনগরে হাবী-বুল্লাহ বাহার কলেজের পশ্চিম পার্শে ৭নং নওরতন রোড। একে বাহাইরা "জাতীয় বাহাই হাজিরাতুল কুদ্স" বলে থাকেন। এখান থেকেই সমগ্র বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

১. নব নিকুঞ্জ, বাংলাদেশের জাতীয় বাহাই আধ্যাত্মিক পরিষদ "জাতীয় বাহাই কেন্দ্র" কর্তৃক প্রকাশিত, দ্বিতীয় প্রকাশ, পৃঃ ৮ ॥

২. বাহাইঃ একটি ভ্রান্ত ধর্ম ও "কিতাবে ঈক্বান"-এর ভূমিকা ॥

বাহাউল্লাহ ইসলামী শরী'আতকে মানসূখ বা রহিত বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন যে, ইসলামী শরী'আত এক হাজার বছর পূর্ণ হওয়ার পর সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে গেছে। তিনি তার প্রবর্তিত নতুন ধর্মের জন্য নতুন শরী'আত গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার রচিত এই শরী'আত গ্রন্থের নাম 'কিতাব-ই-আকদাস'।[১] বাহাই ধর্ম মতে "কিতাবে ঈক্কান" আসমানী গ্রন্থ।[২]

এই সবকিছু মিলালে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বাহাই ধর্ম মূলতঃ একটি স্বতন্ত্র ধর্ম। ইসলাম ধর্মের সাথে তার কোন সংশ্রব নেই। বাহাইগণ ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস যেমন হাশর-নাশর, বেহেশ্‌ত-দোযখ, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদিকেও অস্বীকার করেন। এমনকি বাহাইগণ ইসলাম ধর্মের পরিভাষাও ব্যবহার করেন না। তারা তাদের ধর্মীয় উপাসনালয়ের নাম দিয়েছেন 'মাস্‌রিকুল আসকার'। এ সব উপাসনালয়ের প্রতিটির ৯টি করে দরজা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে তাদের বৃহত্তম মাস্‌রিকুল আসকার অবস্থিত। তাদের ধর্মগ্রন্থের নাম কিতাব-ই-আকদাস বা কিতাবে ঈক্কান। তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির নামও ভিন্ন। তারা আরবী মাসের নামও পাল্টে দিয়েছে।[৩] ইসলামের কোন কিছুই তারা তাদের ধর্মে অবশিষ্ট রাখেনি। তাদের ধর্ম যে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম, তা তারাও বলে থাকে।

বাহাই ধর্মের কতিপয় আকীদা-বিশ্বাস ঃ

১. বাহাইদের ধর্মমতে নবুওয়াত শেষ হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র শক্তি শেষ হয়নি। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী প্রয়োজনে ঈশ্বর অবতারগণের রূপ ধারণ করতে পারে। তারা যা বলে তা হল ঃ "মুস্তাকিল খোদায়ী জুহুর"।[৪] শুধু তাই নয়; বরং তাদের বিশ্বাস হল অবতার-গণ নিজেকে আল্লাহ হিসেবেও দাবী করতে পারেন। এ সম্পর্কে বাহাউল্লাহ বলেন ঃ

১. এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়নি। কারণ বাহাউল্লাহ্‌র পুত্র এবং বাহাই ধর্মের প্রথম অভিভাবক (মাষ্টার) স্যার আব্বাস আফেন্দী (আবদুল বাহা) বলে গেছেনঃ যদি আকদাস ছাপা হয় তাহলে তা প্রচারিত হয়ে মন্দ লোকের হাতে গিয়ে পৌঁছবে। অতএব এটি ছাপার অনুমতি নেই। বাহাই ঃ একটি ভ্রান্ত ধর্ম ॥

২. বাংলাদেশ জাতীয় বাহাই আধ্যাত্মিক পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত "কিতাবে ঈক্কান" (বাংলা অনুবাদ, প্রথম মুদ্রণ, ডিসেম্বর ১৯৭৫) গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হয়েছে ঃ কিতাবে ঈক্কান ফারসী ভাষায় অবতারিত সন্দেহাতীত প্রামাণ্য গ্রন্থ। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বাহাউল্লাহ যখন নির্বাসিত জীবন যাপন করতেছিলেন, তখন ইহা দুই দিবস ও রজনীতে অবতীর্ণ হয়। বাহাউল্লাহ্‌র পথিকৃত হযরত বা'ব-এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাপ্রাপ্তি এবং হযরত বা'ব-এর 'বয়ান' গ্রন্থের সারাংশ ও পূর্ণতাপ্রাপ্তি হিসাবে ইহা অবতারিত হয় ॥

৩. বাহাই পঞ্জিকার মাসগুলো হল ঃ বাহা, জালাল, জামাল, আজমাৎ, নূর, রহমৎ, কালিমাৎ, কামাল, আসমা, ইজ্জত, মশিয়ৎ, ইল্‌ম, কুদরাৎ, কাওল, মাসাইল, শরফ, সুলতান, মুল্‌ক ও আ'লা। বাহাই একটি ভ্রান্ত ধর্ম, পৃষ্ঠা ১২। বরাত-সচিত্র স্বদেশ, ২য় বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ১৯৮২ এবং বাহাই ধর্ম পুস্তক ॥

৪. বাহাই ঃ একটি ভ্রান্ত ধর্ম, বরাত-মজমুয়া আক্‌দাস, পৃঃ ২৮৯ ॥

"যদি সর্ব গুণান্বিত আল্লাহ্‌র প্রকাশকগণের কেহ বলেন, আমি প্রভূ, তিনি নিশ্চয় সত্য বলিবেন। উহাতে কোন সন্দেহ থাকিবে না।"[১]

অন্যত্র বাহাউল্লাহ নিজের সম্পর্কে বলেন, এই মুহূর্তে কয়েদ খানা থেকে যে কথা বলছে সেই সব কিছুর স্রষ্টা।[২]

অন্যত্র আরো বলেছেন, এই কয়েদখানায় যে আছে সেই আমি ছাড়া এই মুহূর্তে অন্য কোন খোদা নেই।[৩]

বাহাউল্লাহ্‌র এসব বক্তব্য হতে এটাই স্পষ্ট যে, তার দাবী হল তিনি মানব রূপী স্বয়ং খোদা, তার লেখনী ও বাণী ঐশী বাণী তুল্য। সারকথা বাহাইদের মতে মির্যা হোসেন আলী (বাহাউল্লাহ) হলেন আল্লাহ তা'আলার প্রতিভূ ও নবী।

২. মির্যা আলী মুহাম্মাদ বাব হলেন ইমাম মাহ্‌দী[৪] ও হযরত ঈসা মসীহ।[৫]

৩. বাহাইদের ধর্মগ্রন্থের নাম কিতাব-ই-আকদাস বা কিতাবে ঈক্কান।[৬]

৪. এ ধর্মে নির্দিষ্ট কোন কালিমা নেই, কেবল বাহাউল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেই সে বাহাই হিসেবে পরিগণিত হয়।

৫. পৃথিবীর সব ধর্ম বা মতবাদই আল্লাহ্ প্রদত্ত ধর্ম বা দ্বীন।

৬. শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব এরাও ঈশ্বরের বার্তাবাহক বা নবী। বাহাইদের ধারণামতে নবীর সংখ্যা ৯ জন। যথা ঃ ১. ইব্রাহীম, ২. কৃষ্ণ, ৩. মূসা, ৪. যরথুষ্ট্র, ৫. বুদ্ধ, ৬. যীশু, ৭. মুহাম্মাদ (সাঃ), ৮. মির্জা আলী মুহাম্মাদ বাব ও ৯. বাহাউল্লাহ।[৭]

৭. এ ধর্ম মতে, রাসূল (সাঃ)-এর মৃত্যুর এক হাজার বছর পর ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান রহিত হয়ে গেছে। বাহাউল্লাহ রাসূল হিসেবে দাবী করার পর এ ঘোষণা করেন যে, "ইসলামী শরীআত এক হাজার বছর পূর্ণ হওয়ার পর সম্পূর্ণ রূপে বাতিল হয়ে গেছে।[৮]

৮. এ ধর্ম মতে নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়নি; বরং পৃথিবীতে আরও নবী বা রাসূলের আগমন ঘটবে। বাহাইগণ মনে করেন যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-ই সর্বশেষ নবী নন। তাঁরপর বিশ্ব মানুষের হেদায়েতের জন্য যুগ যুগ ধরে পৃথিবীতে অসংখ্য নবী রাসূলের আগমন ঘটবে। এ মর্মে বাহাউল্লাহর ঘোষণা হল ঃ

"পৃথিবী যতদিন থাকিবে তাহাদের (নবীদের) আগমনও ক্রমাগত চলিতে থাকিবে। মূসা ও যীশুর উত্তরাধীকারী রূপে আল্লাহ তাঁহার বার্তা বাহকদের পাঠাইয়াছেন, আর

১. বাহাউল্লাহ, বাংলাদেশের জাতীয় বাহাই আধ্যাত্মিক পরিষদ "জাতীয় বাহাই কেন্দ্র" কর্তৃক প্রকাশিত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃঃ ২৪ ॥

২. বাহাই ঃ একটি ভ্রান্ত ধর্ম, পৃঃ ১১ বরাত-মুবিন পৃ, ২৮৬ ॥

৩. প্রাগুক্ত পৃঃ ১১, বরাত-বাহাই ধর্মের পরিচিতি ॥

৪. পূর্বেও এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে ॥

৫. বাহাই একটি ভ্রান্ত ধর্ম, ৪২ পৃষ্ঠা ॥

৬. বরাত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ॥

৭. বাহাই একটি ভ্রান্ত ধর্ম ॥

৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১ ॥

ক্রমাগত পাঠাইতে থাকিবেন শেষ পর্যন্ত; যাহার কোন শেষ নাই ....."[১]

৯. পরকালে জান্নাত জাহান্নাম বলে কিছুই নেই; বরং কুরআনে বর্ণিত জান্নাত-জাহান্নাম দ্বারা রূহের বিভিন্ন অবস্থা বুঝানো হয়েছে। বাহাইদের মতে "জান্নাত হচ্ছে এক পরিপূর্ণ অবস্থা বা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এবং সৃষ্টির সাথে ঐক্য। এবং দোযখ হচ্ছে বেহেশ্‌তের উক্ত ধারণার বিপরীত অবস্থা। অন্য কথায় আধ্যাত্মিক জীবনই হচ্ছে বেহেশত, আর দোযখ হচ্ছে এই জীবনের মৃত্যু।[২]

১০. বাইতুল্লাহর যিয়ারতকে এ ধর্মে রহিত করা হয়েছে। বাইতুল্লাহর পরিবর্তে ইসরাঈলে আকা হল তাদের তীর্থ স্থান।[৩] এখানকার কার্মেল পর্বতের সানুদেশে রয়েছে বাহাই ধর্মের তিন প্রধান দিক পালের সমাধি। "ইউনিভার্সেল হাউজ অব জাষ্টিস" তীর্থ মন্দিরের উদ্দেশ্যে তীর্থ যাত্রা পূণ্যের কাজ। বাহাই ধর্মমতে বছরে ৯ দিন ইসরাঈলের এই তীর্থক্ষেত্রে তীর্থ করতে যাওয়া বাহাইদের জন্য ফরয।

১১. এ ধর্মে জিহাদ নিষিদ্ধ।

১২. বিজ্ঞান এবং ধর্ম একই অভিন্ন সত্তার দুই দিক। তাই বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে সমন্বয় থাকবে।[৪] মূলতঃ তারা সব ধর্মের মধ্যেই সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন, যাতে তাদের ধর্ম সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারে।"বিশ্ব শান্তি ও একতার জন্য বাহাই শিক্ষা" নামক প্রচার পত্রেও এ দিকে ইংগিত রয়েছে। এজন্য তারা বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, যেমন একটি প্রচেষ্টা চালিয়েছিল বাদশাহ আকবার।

---

১. বাহাউল্লাহ- বাংলাদেশের জাতীয় বাহাই আধ্যাত্মিক পরিষদ "জাতীয় বাহাই কেন্দ্র" কর্তৃক প্রকাশিত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃঃ ২৮ ॥

২. বাহাই একটি ভ্রান্ত ধর্ম, পৃঃ ৫৯॥

৩. ইসরাঈলে বাহাইদের তীর্থস্থান থাকা, ইসরাঈলের হাইফাতে তাদের প্রধান অফিস থাকা ইত্যাদি কারণে তথ্যানুসন্ধানী গবেষকগণ বাহাই-ইয়াহুদী সম্পর্কের একটা সূত্র থাকাটা প্রমাণ করেছেন। তদুপরি বাহাই নেতাগণও সেটা স্বীকার করেছেন। ইয়াহুদী বাহাই ঘনিষ্টতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যায় ইরান জাতীয় বাহাই সোসাইটির মুখপত্র 'আখবার আমেরিকা' পত্রিকায় একবার স্পষ্টতঃই বলা হয়েছিল আমরা গর্ব ও আনন্দের সাথে ঘোষণা করতে চাই যে, বাহাই সম্প্রদায় ও ইসরাঈলী সরকারের মধ্যে সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে ও ঘনিষ্টতর হচ্ছে। ১৯৬১ সালে একই পত্রিকায় বাহাই ধর্মনেত্রী রুহিয়া ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন, "আমরা ইসরাঈলের অঙ্গ এবং তার উপর নির্ভরশীল। ইসরাঈল ও বাহাইদের ভবিষ্যৎ একটি শৃঙ্খলের বিভিন্ন অংশের মত পরস্পর গ্রন্থীবদ্ধ।" এসব স্বীকারোক্তি এবং পদে পদে বাহাইদেরকে আমেরিকা ও ইসরাঈল কর্তৃক আর্থিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক সব ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান থেকে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয়েছে যে, বাহাই ধর্ম আমেরিকা ও ইসরাঈলেরই সৃষ্ট একটি ষড়যন্ত্র। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করাই যার লক্ষ্য। তথ্যসূত্র ঃ বাহাই একটি ভ্রান্ত ধর্ম ॥

৪. "জাতীয় বাহাই কেন্দ্র" কর্তৃক প্রকাশিত প্রচারপত্র "বিশ্ব শান্তি ও একতার জন্য বাহাই শিক্ষা" ॥

বাহাই ধর্মের কতিপয় রীতিনীতি ঃ

১. পৃথিবীর সব জিনিসই পবিত্র।[১]

২. পৃথিবীর সব জিনিসই পানাহার জায়েয।[২]

৩. বীর্য পাতের কারণে কেউ অপবিত্র হয় না।[৩]

৪. বাহাউল্লাহ্‌র মতে, দুটি এবং আব্দুল বাহার মতে একাধিক বিবাহ নিষেধ। (যদিও বাহাউল্লাহ স্বয়ং তিনটি বিবাহ করেছিলেন।)[৪]

৫. বাহাউল্লাহ্‌র জীবদ্দশায় তার দিকে মুখ করে এবং তার মৃত্যুর পর তার করবের দিকে মুখ করে প্রার্থনা করতে হবে।[৫]

৬. ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিবাহ করা বৈধ।[৬]

৭. বাহাইরা সাক্ষাতে পরস্পরকে "আল্লাহ আবহা" বলবে।[৭]

৮. ধনী বাহাইকে দামী বাক্সে এবং সিল্ক কাপড়ে কাফন দিয়ে দাফন করতে হবে।[৮]

৯. মেয়েরা পিতার বাড়িঘর এবং মূল্যবান পোষাক ইত্যাদি পাবে না।[৯]

১০. বাহাই ধর্মে উনিশ দিনে মাস এবং ১৯ মাসে বছর হয় এবং ২১ শে মার্চ হল বাহাই নববর্ষ।

বাহাই সম্প্রদায় ইসলাম ধর্মাবলম্বী কোন মুসলিম বাতিল সম্প্রদায় নয় বরং তারা একটি কাফের সম্প্রদায়। কেননা তারা ইসলাম রহিত হওয়ায় বিশ্বাসী। তারা মানুষের মধ্যে খোদার অবতারিত হওয়া (حلول)-এর আকীদায় বিশ্বাসী। এমনকি তারা মানুষের খোদা হওয়ায় বিশ্বাসী। তারা খতমে নবুওয়াতের আকীদায় অবিশ্বাসী। এমনিভাবে ইসলামের অন্যান্য জরুরী (بديهي) আকীদায় অবিশ্বাসী। ফলে তারা সন্দেহাতীত ভাবে একটি কাফের সম্প্রদায়। তাই তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও রীতিনীতি সম্বন্ধে পর্যালোচনা নিঃস্প্রয়োজনীয়।

কাদিয়ানী মতবাদ

"কাদিয়ানী মতবাদ" বলতে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মতবাদকে বোঝানো হয়েছে। আর "কাদীয়ানী ফিরকা" বা "কাদিয়ানী সম্প্রদায়" বলতে তার অনুসারীদেরকেই বোঝানো হয়। তবে তারা নিজেদেরকে "কাদিয়ানী ফিরকা" বা "কাদিয়ানী সম্প্রদায়" নয় বরং "আহমদিয়া মুসলিম জামাত" বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। 'আহমদী জামাত', 'মির্জায়ী', 'কাদিয়ানী' ইত্যাদি নামেও তারা পরিচিত।

উক্ত মির্জা গোলাম আহমদ পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত কাদীয়ান নামক গ্রামের অধিবাসী। কাদিয়ান গ্রামের অধিবাসী বিধায় তাকে এবং তার অনুসারীদেরকে সংক্ষেপে "কাদিয়ানী" বলে পরিচয় দেয়া হয়।

---

১. বাহাই একটি ভ্রান্ত ধর্ম, পৃষ্ঠা, ১১, বরাত-আকদাস ১৬১-১৬২ নং বাণী ॥ ২. প্রাগুক্ত, বরাত-বাহাউল আছার, ১ম খণ্ড. পৃঃ ২৩ ॥ ৩. প্রাগুক্ত, বরাত-আকদাস ২৫৮ নং বাণী ॥ ৪. প্রাগুক্ত, বরাত-আকদাস ১৩০ নং বাণী ॥ ৫. প্রাগুক্ত, বরাত-আকদাস ॥ ৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ১১ ॥ ৭. প্রাগুক্ত ॥৮. প্রাগুক্ত, বরাত-আক্‌দাস, ২৭০-২৭১ নং বাণী ॥ ৯. প্রাগুক্ত, বরাত-আক্‌দাস ২৬ নং বাণী ॥

১৮৪০ ইং সনে মির্জা গোলাম আহমদ জন্মগ্রহণ করেন। মির্জা গোলাম আহমদ ছিলেন মির্জা গোলাম মুর্তজার কনিষ্ঠ সন্তান। এই পরিবারটি ছিল তৎকালীন ইংরেজ সরকারের হিতাকাঙ্খী ও ইংরেজ সরকারের কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ পরিবার। তার পিতা মির্জা গোলাম মুর্তজা তৎকালীন ইংরেজ সরকারের একজন বিশেষ অনুরাগভাজন ও অনুগত কৃতজ্ঞ জমিদার ব্যক্তি ছিলেন।[১] ইংরেজ সরকারের জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।[২] সিপাহী বিপ্লবের সময় তিনি ৫০টি ঘোড়া ক্রয় করে পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে বৃটিশ সরকারের সাহায্য করেছিলেন। অন্য একটি যুদ্ধে চৌদ্দজন অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।।[৩] তার জ্যেষ্ঠ ভাই মির্জা গোলাম কাদেরও বৃটিশ গভর্নমেন্টের খিদমতে আন্তরিকভাবে নিয়োজিত ছিলেন।[৪] বৃটিশ সরকারের পক্ষ হয়ে তিনি দেশ প্রেমিক আযাদী আন্দোলনের বীর সৈনিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ

১. তার পিতা ইংরেজ সরকারের একজন অনুগত ও কৃতজ্ঞ জমিদার তথা দালাল ছিলেন- এ সম্পর্কে স্বয়ং মির্জা গোলাম আহমদের স্বীকারোক্তি নিম্নরূপ ঃ "আমার পিতা মরহুম এ দেশের বিশিষ্ট জমিদারের মধ্যে গণ্য ছিলেন। গভর্ণরের দরবারে গেলে তিনি কুর্সি পেতেন। তিনি বৃটিশ সরকারের প্রকৃত কৃতজ্ঞ ও হিতাকাংখী ছিলেন।" ازالة الاوهام حصة اول. مصنفه مرزا غلام احمد قادياني. صفحه/٦٧ ॥

২. এ সম্পর্কে স্বয়ং মির্জা গোলাম আহমদের স্বীকারোক্তি নিম্নরূপ ঃ "আমার ওয়ালেদ সাহেবের জীবনী হতে ঐসব খেদমত কিছুতেই পৃথক করা যায় না, যা তিনি আন্তরিকতার সাথে এই সরকারের কল্যাণে আঞ্জাম দিয়েছিলেন। তিনি নিজ মর্যাদা ও সামর্থ অনুযায়ী সর্বদা বৃটিশ সরকারের সেবাকার্যে নিয়োজিত ছিলেন। সরকারের বিভিন্ন অবস্থা ও প্রয়োজনের সময় তিনি এমন সততা ও আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন যে, যতক্ষণ কেউ কারো খাঁটি ও আন্তরিক হিতৈষী না হয়, ততক্ষণ তেমন আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারে না।" گورنمنٹ کی توجہ کے لائق.. مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی. مطبع پنجاب پریس سیالکوٹ۔ صفحہ/١۔ ॥

৩.এ সম্পর্কে স্বয়ং মির্জা গোলাম আহমদের স্বীকারোক্তি নিম্নরূপ ঃ "১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের হাঙ্গামায় যখন উচ্ছৃংখল জনতা এ অনুগ্রহ দাতা গভর্নমেন্টের মোকাবেলা করে দেশে হৈ চৈ সৃষ্টি করে, তখন আমার পিতা মরহুম নিজের টাকা দিয়ে পঞ্চাশটি ঘোড়া ক্রয় করে এবং পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সংগ্রহ করে গভর্নমেন্টের খিদমতে পেশ করেন। আরো একবার চৌদ্দজন অশ্বারোহী দিয়ে সরকারের খিদমত করেন। এসব আন্তরিকতাপূর্ণ খিদমতের কারণে তিনি গভর্নমেন্টের প্রিয় পাত্র বলে গণ্য হন।" ازالة الاوهام حصة اول. مصنفه مرزا غلام احمد قادياني. صفحه/١٦٧ و گورنمنٹ کی توجہ کے لائق . مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی. مطبع پنجاب پریس سیالکوٹ۔ صفحہ/١۔ ॥

৪. এ সম্পর্কে স্বয়ং মির্জা গোলাম আহমদের স্বীকারোক্তি নিম্নরূপ ঃ "এ অধমের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মির্জা গোলাম কাদের যতদিন জীবিত ছিলেন তিনিও পিতা মরহুমের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন এবং বৃটিশ গভর্নমেন্টের আন্তরিক খিদমতে মনে প্রাণে নিয়োজিত থেকেছেন। অতঃপর তিনিও মুসাফিরখানা হতে বিদায় গ্রহণ করেন।" گورنمنٹ کی توجہ کے لائق. مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی. مطبع پنجاب پریس سیالکوٹ۔ صفحہ/١۔ ॥

করেছিলেন।[১]

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রাইভেটভাবে মাধ্যমিক ক্লাস পর্যন্ত উর্দূ, ফারসী, আরবী ও কিছু ইংরেজী পড়াশোনা করেন। কয়েকবার মোক্তারী পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে ব্যর্থ হন।[২] অবশেষে শিয়ালকোট আদালতে কেরানীর চাকুরী আরম্ভ করেন।

কাদিয়ানী মতবাদের পেক্ষাপট ঃ

ইংরেজগণ উপমহাদেশের ক্ষমতা দখলের পর বিভিন্ন সময়ে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালিত হয়। সর্বশেষ দিল্লীর শেষ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ-এর আমলে ১৮৫৭ সালে আযাদী আন্দোলন সংঘটিত হয়। ইংরেজগণ এই আন্দোলনের নাম দিয়েছিল সিপাহী বিপ্লব। শেষ পর্যন্ত কতিপয় বিশ্বাসঘাতক হিন্দু মুসলিমের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এই বিপ্লব পরাজয়ের সন্মুখীন হয়। সিপাহী জনতার সেই পরাজয়ের পর ইংরেজগণ উপলব্ধি করেছিল যে, এ যুদ্ধে যদিও হিন্দু-মুসলিম উভয় জাতিই অংশ গ্রহণ করেছে, তথাপি বিপ্লবের মূল নেতৃত্ব দিয়েছিল মুসলমানরা। তারা এ সত্যটিও অনুধাবন করতে পেরেছিল যে, তারা এ দেশ মুসলমানদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে। তাই সংগত কারণেই মুসলমানরা ইংরেজদের অধীনতা মেনে নিতে পারে না। মুসলমানদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিতে না পারলে পুনরায় সুযোগ পেলেই তারা আবার বিদ্রোহ করবে। তারা মুসলমানদের চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার মানসে তাদের উপর নির্যাতনের স্টিম রোলার চালিয়েছিল, হাজার হাজার আলেমকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়েছিল। মুসলমানদের থেকে নবাবী-জমিদারী কেড়ে নিয়ে প্রতিবেশী হিন্দুদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিল। কিন্তু জিহাদের স্পৃহা তাড়িত মুসলিম জাতির অন্তর থেকে জিহাদের স্পৃহা দূরীভূত করা সম্ভব হল না। হাজী শরীয়তুল্লাহর ফারায়েজী আন্দোলন, হাজী নেসার আলী ওরফে তীতুমীরের বাঁশের কেল্লার সশস্ত্র বিপ্লব প্রভৃতি ঘটনাবলী ইংরেজ জাতিকে বিচলিত করে তুলেছিল। তারা ভাবল এতকিছু করার পরও মুসলমানরা বারবার কেন বিদ্রোহ করছে? এ বিষয়ে সঠিক তথ্য উদঘাটনের জন্য ১৮৬৯ সালে উইলিয়াম হান্টারের নেতৃত্বে একটি কমিশন বা প্রতিনিধি দল ভারতে প্রেরণ করা হল। এ কমিশন প্রায় এক বছর যাবত ভারতবর্ষে অবস্থান করে পর্যবেক্ষণ পূর্বক বৃটিশ সরকারের নিকট এ ব্যাপারে যে রিপোর্ট পেশ করেছিল, তাতে বলা হয়েছিল ভারতীয় মুসলমানরা কঠোরভাবে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে। মুসলমানদের ধর্মীয় নির্দেশ রয়েছে, বিজাতীয়দের শাসন মানতে নেই। তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ কুরআনেই বিজাতীয়দের শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ রয়েছে। তাদের ধর্মীয় নেতারা ফতওয়া জারি করেছে ভারত বর্ষ দারুল হরব (শত্রু দেশ) এ পরিণত হয়েছে। এ অবস্থায় মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরয হয়ে পড়েছে। জিহাদের প্রেরণায় মুসলমানরা উন্মাদের মতো আত্মাহুতি দিতে পারে।[৩]

১. এ সম্পর্কে মির্জা সাহেব বলেন ঃ আমার পিতা আমার ভ্রাতাকে একমাত্র গভর্নমেন্টের খেদমতের জন্য কোন কোন যুদ্ধে পঠিয়েছিলেন। সর্বক্ষেত্রেই গভর্নমেন্টের মনস্তুষ্টি করেছেন। گورنمنٹ کی توجہ کے لائق. مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی. مطبع پنجاب پریس سیالکوٹ۔ صفحہ/١۔ ॥ ২. কাদিয়ানী ধর্মমত, মাওলানা শামসুদ্দীন কাসেমী ॥ ৩. প্রাগুক্ত ৫০-৫১ পৃঃ থেকে সংক্ষেপিত ॥

উক্ত রিপোর্টে যে কয়েকটি বিষয়ের সুপারিশ করা হয়েছিল তন্মধ্যে বিশেষ কয়েকটি দফা ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. দারিদ্রপীড়িত সর্বহারা মুসলমানদের একটি শ্রেণীকে উপঢৌকন ও উপাধি বিতরণের মাধ্যমে বৃটিশের অনুগত করে তুলতে হবে। তারা ভারত বর্ষকে 'দারুল আমান' (শান্তির দেশ) বলে ফতওয়া দিয়ে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ অপ্রয়োজনীয় বলে বর্ণনা করবে। তারা প্রচার করবে, যে দেশে ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন করতে রাষ্ট্রের পক্ষ হতে কোন বাধা নেই, সে দেশের সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ ফরয হতে পারে না।

২. এ দেশের মুসলিম অধিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পীর-মুরীদীর ভক্ত। বর্তমানে মুসলমানদের মধ্য হতে আমাদের আস্থাভাজন এমন একজন পন্ডিত ব্যক্তিকে নবীরূপে দাঁড় করাতে হবে, যে বংশ পরম্পরায় আমাদের আস্থাভাজন বলে প্রমাণিত হয়। দারিদ্র পীড়িত ধর্ম জ্ঞানহীন মুসলমানদের মধ্যে তার নবুওয়াত চালিয়ে দেয়ার জন্য আমাদের সরকার কর্তৃক তাকে সর্ব প্রকার সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার নিশ্চয়তা দিতে হবে। অতঃপর তথাকথিত নবী এক সময় ঘোষণা দিবে, "আমার নিকট এই মর্মে ওহী এসেছে যে, ভারত বর্ষে বৃটিশ সরকার আল্লাহ্‌র রহমত স্বরূপ এবং ওহীর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এখন থেকে জিহাদ হারাম করে দিয়েছেন।" এভাবে মুসলমানদের অন্তর থেকে জিহাদের প্রেরণা ও উন্মাদনা দূরীভূত করা সম্ভব হবে। অন্যথায় ভারতে আমাদের শাসন দীর্ঘায়িত করা সম্ভব হবে না।

৩. সুপারিশ মালার মধ্যে আরও ছিল- প্রথমে সে নিজেকে ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় বই-পুস্তক রচনা করবে। এ কাজে তাকে গড়ে তোলার জন্য আমাদের ওরিয়েন্টালিষ্টরা তাকে উপাদান সংগ্রহ করে দিবে। আমাদের গোয়েন্দা ও প্রচার বিভাগ তার রচিত পুস্তকাদি প্রকাশ ও প্রচার কাজে তাকে সহযোগিতা করবে। এরপর তার প্রতি ভক্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সে নিজেকে মোজাদ্দেদ বলে দাবী করবে। এ দাবী মুসলমানদের গলাধঃকরণ করানোর পর পর্যায়ক্রমে সে নিজেকে মাহ্‌দী বলে দাবী করবে। অতপর সে মুসলিম উম্মাহ্‌র মসীহে মাওউদ হওয়ার দাবী করবে। এক সময় ধীরে ধীরে সে নিজেকে নবী মুহাম্মাদের ছায়া (জিল্লী, বুরূজী ও উম্মতী নবী) বলে দাবী করবে। ইত্যাদি।[১]

১. উপরোক্ত বিবরণ কাদিয়ানী ধর্মমত ৫১-৫৫ পৃষ্ঠা থেকে গৃহীত (সংক্ষেপিত)। লেখক বলেন ঃ আমাদের এ বক্তব্যের কিয়দাংশ 'উইলিয়াম হান্টার' রচিত 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' হতে গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে উক্ত কমিশন ও ভারতে কর্মরত পাদ্রীগণসহ তৎকালীন বৃটিশ সরকারের কর্মকর্তাদের লন্ডনে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সের মুদ্রিত রিপোর্ট 'দি এ্যারাইভেল অব দি বৃটিশ এম্পায়ার ইন ইন্ডিয়া', 'মির্জা কী কাহিনী খোদ মির্জা কী জবানী' এবং 'মিজায়ী তাহ্‌রীক কা পাছ মান্‌জার' হতে উদ্ধৃত ॥

প্রতিনিধি দলের সুপারিশের প্রেক্ষিতে তৎকালীন বৃটিশ সরকারের কর্মকর্তাগণ মুসলমানদের মধ্য থেকে একজন নবী দাঁড় করানোর প্রস্তাবটি গ্রহণ করে এবং ভারতে বৃটিশ সরকারের বংশ পরম্পরা দালালদের থেকে একজন নবী দাঁড় করানোর প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। প্রস্তাব ও পরিকল্পনা মোতাবেক মির্জা গোলাম আহমদকে নবী হিসেবে দাঁড় করানোর জন্য তারা মনোনীত করে। তাই মির্জা গোলাম আহমদ হল ইংরেজদেরই দাঁড় করানো নবী।[১]

পরিকল্পনা মোতাবেক গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এক সময় নিজেকে মোজাদ্দিদ (সংস্কারক) বলে দাবী করে বসলেন। এরপর তিনি নিজেকে ইমাম মাহ্‌দী বলে দাবী করলেন অর্থাৎ, হাদীছে যে ইমাম মাহ্‌দীর আগমনের সু-সংবাদ রয়েছে, তিনি নিজেকে দাবী করে বসলেন যে, আমিই সেই ইমাম মাহ্‌দী। অতঃপর এক সময় তিনি প্রচার করতে আরম্ভ করলেন যে, মুসলমানগণ যে বিশ্বাস রাখে ঈসা (আঃ) স্বশরীরে উর্দ্ধাকাশে উত্তোলিত হয়েছেন-এটা বানোয়াট ও মিথ্যা। আসলে মরিয়মের পুত্র ঈসা নবী আকাশে উত্তোলিত হননি। বরং তিনি তার পরিণত বয়সে কাশ্মীরে এসে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেছেন। শেষ যুগে এ উম্মত হতে ঈসা মসীহ নামে একজন মহাপুরুষের আগমনের যে কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আমিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ। তারপর এক সময় তিনি দাবী করলেন যে, আমি মোহাদ্দাছ (محدث) অর্থাৎ, (তার ভাষায়) "আল্লাহ তা'আলার সাথে ওহীর মাধ্যমে আমার কথোপকথন হয়।"[২]

বিংশ শতাব্দির শুরুতে (১৯০১ সালে) তিনি স্পষ্টভাবে আসল কথায় চলে আসলেন এবং দাবী করলেন যে, 'আমি শরী'আতের অধিকারী পূর্ণ নবী।' এরপর থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এ দাবীর উপর অটল ছিলেন। বরং মাঝে-মধ্যে অন্য সকল নবী রাসূল হতে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবীও করেছেন। এমনকি স্বয়ং আখেরী নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) থেকেও শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবী করেছেন।[৩]

১.মির্জা গোলাম আহমদ যে ইংরেজদেরই দাঁড় করানো নবী তা মির্জা গোলাম আহমদের ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৮ সনে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রের নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্টতঃই বোঝা যায় ঃ "পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতায় সরকার আমার পরিবারকে একটি অনুগত ও ভক্ত পরিবাররূপে সনাক্ত করেছেন এবং বৃটিশ গভর্নমেন্টের মাননীয় অফিসারবৃন্দ সর্বদা দৃঢ় মনোভাবসহ বিভিন্ন চিঠিপত্রে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, "নিজের লাগানো এ চারাগাছটি" (اس خود کاشتہ پودا)-এর ব্যাপারে সুচিন্তিত, সতর্ক ও সুনজরের মনোভাব পোষণ করুন এবং অধীনস্থ অফিসারদেরকে বলে দিন তারাও যেন এ পরিবারের স্বীকৃত আনুগত্য ও আন্তরিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাকে ও আমার দলকে কৃপা ও মেহেরবাণীর দৃষ্টিতে দেখেন।" قادیانی مذہب (جدید ایڈیشن. جنوری ۲۰۰۱م). الیاس برنی. صفحہ/ ۷۰۲. از تبلیغ رسالت جلد ہفتم. صفحہ/ ۲۰-۱۹۔ ॥

২.۔ ازالۃ الاوھام . مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی . حصۂ اول . صفحہ/ ۳۲۰ ॥

৩.পরবর্তীতে এ কথার বরাত পেশ করা হয়েছে ॥

নবূওয়াতের ঘোষণা দেয়ার পরপরই তিনি পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। ইতিপূর্বে জিহাদকে তিনি নিষিদ্ধ ঘোষণাও করেছেন।[১] ইংরেজদের আনুগত্য করার এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধাচরণ না করার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টায় নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন।[২] ইংরেজ সরকারের পক্ষে পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করে এবং বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে প্রচার করেছেন।[৩] এবং পর্যায়ক্রমে তিনি অনেক কিছু দাবী করেছেন এবং

১. এ সম্পর্কে স্বয়ং মির্জা সাহেবের বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ "অদ্য হতে ধর্মের জন্য যুদ্ধ হারাম করা হল। এরপর যে ব্যক্তি ধর্মের জন্য তরবারি উঠাবে এবং গাজী নাম ধারণ করে কাফেরদের হত্যা করবে, সে খোদা ও রাসূলের নাফরমান বলে গণ্য হবে।" (এস্তেহার চান্দা মানারাতুল মসীহ-পৃঃ বে, তে যমীমা খোতবায়ে এলহামিয়া!) তিনি আরও বলেনঃ "আমি এ উদ্দেশ্যে বহু সংখ্যক পুস্তক আরবী, ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় রচনা করেছি যে, অনুগ্রহদাতা গভর্নমেন্টের (বৃটিশের) বিরুদ্ধে জিহাদ কিছুতেই দুরস্ত নেই। বরং খাঁটি মনে আনুগত্য স্বীকার করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। একই উদ্দেশ্যে আমি বহু অর্থ ব্যয়ে সে সমস্ত পুস্তক প্রকাশ করে মুসলিম দেশসমূহে পৌঁছিয়েছি। আমি জানি, এসব পুস্তকের বিস্তর প্রভাব ঐসব দেশেও পড়েছে। (তাবলীগ ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৬৫) তিনি আরও বলেছেন ঃ "জিহাদ নিষিদ্ধ করণ ও ইংরেজ সরকারের আনুগত্য সম্পর্কে আমি এত বেশী পুস্তক রচনা করেছি ও বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছি যে, ঐগুলো একত্রিত করলে পঞ্চাশটি আলমারী ভর্তি হতে পারে"। تریاق القلوب. مرزا غلام احمد قادیانی . صفحہ/۲۷۔ ॥

২. এ সম্পর্কে স্বয়ং মির্জা সাহেবের বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ" আমি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলছিঃ অনুগ্রহদাতার অমঙ্গল কামনা করা হারামী ও বদকার মানুষের কাজ। সেমতে আমার মাযহাব আমি বারবার প্রকাশ করেছি যে, ইসলাম দু'ভাগে বিভক্ত- একটি খোদার আনুগত্য করা, অপরটি ঐ সাম্রাজ্যের আনুগত্য করা, যে সাম্রাজ্য শান্তি স্থাপন করেছে এবং অত্যাচারীর কবল হতে নিজের ছায়ায় আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে। সকলের জানা উচিত বৃটিশ সরকারই এরূপ সাম্রাজ্য"। گورنمنٹ کی توجہ کے لائق.. مرزا غلام احمد قادیانی. مطبع پنجاب پریس سیالکوٹ۔ صفحہ/۳۔ ॥

৩. এ সম্পর্কে স্বয়ং মির্জা সাহেবের বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ "ইংরেজ সরকারের পক্ষে আমি যেসব খিদমত করেছি তা এই যে, আমি প্রায় পঞ্চাশ হাজার পুস্তক-পুস্তিকা এবং বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে এদেশে ও অন্যান্য মুসলমান দেশে প্রচার করেছি। এ সমস্ত পুস্তক-পুস্তিকার আলোচ্য বিষয় ছিল এই যে, ইংরেজ সরকার আমাদের অনুগ্রহ দাতা, সুতরাং এ সরকারের খাঁটি আনুগত্য করা, মনে প্রাণে এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং দোয়া করা প্রত্যেকটি মুসলমানের একান্ত কর্তব্য মনে করা উচিত। এসব পুস্তক উর্দু, ফার্সী, আরবী ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় রচনা করে সমস্ত মুসলিম দেশে এমনকি মক্কা ও মদীনার ন্যায় পবিত্র শহরগুলোতেও সুন্দরভাবে প্রচার করে দিয়েছি। রোমের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল, সিরিয়া, মিসর, কাবুল এবং আফগানিস্তানের বিভিন্ন শহরেও সাধ্যমত প্রচার করেছি। ফলে লক্ষ্য লক্ষ মানুষ জিহাদের নাপাক ধারণা ত্যাগ করেছে। যা মূর্খ মোল্লাদের শিক্ষায় তাদের অন্তরে বদ্ধমূল ছিল। এ মহৎ খিদমত আঞ্জাম দিতে পারায় আমি গর্বিত। বৃটিশ ইন্ডিয়ার কোন মুসলমানই আমার খিদমতের নজির দেখাতে সক্ষম হবে না। ستارۂ قیصرہ صفحہ/۶ . مرزا غلام احمد قادیانی، مطبع ضیاء الاسلام قادیان. ۱۸۹۹ ॥

মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ ও অনৈক্য সৃষ্টির জন্য অনেক নতুন নতুন আকীদা-বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছেন। তার এসব দাবীর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী জঘন্য দাবী হল মুসলমানদের সর্বসম্মত এবং সুস্পষ্ট আকীদার বিরুদ্ধে নিজেকে তিনি নবী বলে দাবী করেছেন।

১৯০৮ সালে আহলে হাদীছের বিখ্যাত আলেম মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতশরীর সাথে মির্জা কাদিয়ানী চ্যালেঞ্জ করে মুবাহালায় অবতীর্ণ হন।[১] মুবাহালা অনুষ্ঠিত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে মির্জা কাদিয়ানী সাহেব লাহোর শহরে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মল-মুত্রের মধ্যে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন।[২]

মির্জা গোলাম আহমদের নবী রাসূল হওয়ার দাবী সম্বলিত কয়েকটি উক্তি

বুরূজী বা যিল্লী বা ছায়া নবী হওয়া সম্পর্কে তার কয়েকটি উক্তি ঃ

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ছায়া নবী হওয়ার দাবীর সপক্ষে যেসব বক্তব্য দিয়েছেন, তার কয়েকটি উদ্ধৃতি নিম্নে পেশ করা হল। তবে তিনি যিল্লী নবীর সাথে সাথে নিজেকে উম্মতী নবী বলেও দাবী করেছেন।

(১) "ছায়া স্বরূপ যার নাম দেওয়া হয় মুহাম্মাদ ও আহমদ তার (মাসীহে মাওউদ) নবুওয়াতের দাবী সত্ত্বেও আঁ-হযরত (সাঃ) খাতামুন্নাবিয়্যীন থাকবেন। কেননা এই দ্বিতীয় মুহাম্মাদ ওই মুহাম্মাদ (সাঃ)-এরই রূপ এবং তারই নাম।"[৩]

(২) আমি রাসূল ও নবী, অর্থাৎ, আমি পূর্ণাঙ্গ ছায়া হিসেবে। আমি এমন আয়না যার মধ্যে মুহাম্মাদী আকৃতি ও মুহাম্মাদী নবুওয়াতের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবিম্ব পড়ছে।[৪]

(৩) "আল্লাহ তা'আলা নবীজি (সাঃ)-কে নবুওয়াতের সীল-মোহর দিয়েছেন। অন্য কথায় কামালিয়াতের ফয়েজ দানের ক্ষমতা দিয়েছেন, যা আর কোন নবীকে দেয়া হয়নি। সে জন্য তাঁর নাম হয় খাতামুন্নাবিয়্যীন। অর্থাৎ, তাঁর আনুগত্য নবুওয়াতের কামালিয়্যাত দান করে। তার রূহানী তাওয়াজ্জুহ (দৃষ্টি) নবী সৃষ্টি করে। এ পবিত্র ও ঐশ্বরিক শক্তি আর কোন নবীকে দান করা হয়নি।"[৫]

১. "মুবাহালা" ইসলামী শরী'আতের একটি পরিভাষা। এ প্রসঙ্গ পবিত্র কুরআনেও আলোচিত হয়েছে। শরী'আতের পরিভাষায় হক্ব ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব অবসানে, সত্যের জয় এবং অসত্যের নিপাতের উদ্দেশ্যে আল্লাহর দরবারে চরম বিনয় ও মিনতি সহকারে উভয় পক্ষের প্রার্থনাকে মুবাহালা বলা হয় ॥

২. মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার দাজ্জালের যে দৃষ্টান্তমূলক পরিণতির প্রয়োজন ছিল তাই হয়েছে ॥

৩. ایک غلطی کا ازالہ. مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی. صفحہ/۶ ۔ ॥

৪. مباحثہ راولپنڈی. مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی. کتابت سید محمد باقر خوشنویس قادیان ، صفحہ/۱۳۴

৫. مباحثہ راولپنڈی. مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی. کتابت سید محمد باقر خوشنویس قادیان ، صفحہ/۱۴۱ اور ضمیمہ حقیقۃ الوحی صفحہ/۱۷۔ وعبارتہ – انی احد من الامۃ النبویۃ ثم مع ذالک سمانی اللہ نبیا تحت فیض النبوۃ المحمدیۃ واوحی الی ما اوحی ۔ ॥

(৪) "যে সমস্ত জায়গায় আমি নবুওয়াত বা রিসালত সম্পর্কে অস্বীকার করেছি তা শুধু এই অর্থে যে, আমি স্বতন্ত্র কোন শরী'আত নিয়ে আসিনি এবং পৃথক কোন নবীও নই। তবে এই অর্থে আমি রাসূল এবং নবী যে, আমি স্বীয় পথ প্রদর্শক রাসূল (সাঃ) থেকে অদৃশ্য বা আধ্যাত্মিক ফয়েজ ও শক্তি লাভ করে এবং নিজের জন্য সেই নাম গ্রহণ করে তাঁরই মধ্যস্থতায় আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে ইল্‌মে গায়েব পেয়েছি। কিন্তু নতুন শরী'আত ছাড়া আমাকে নবী বলতে আমি কখনো প্রতিবাদ করিনি। বরং এ সব অর্থে আল্লাহ তা'আলা আমাকে নবী এবং রাসূল বলে আহবান করেছেন। সুতরাং এখনো আমি এ অর্থে নবী এবং রাসূল হওয়ার কথা অস্বীকার করি না।"[১]

যিল্লী বা ছায়া নবী হওয়ার দাবীটি একটি উদ্ভট, অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক দাবী। এটা অনেকটা হিন্দুদের অযৌক্তিক পুণর্জন্মের আক্বীদার নামান্তর। গোলাম আহমদ কাদিয়ানী যে সব কথার মারপ্যাচে নিজেকে যিল্লী বা ছায়া নবী বলেছেন হিন্দুরা অনুরূপ ভাবে বলতে পারে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই-মুসলমানদের এই আকীদার সাথে আমাদেরও কোন বিরোধ নেই। আমাদের সব খোদা হল যিল্লী খোদা বা ছায়া খোদা।

স্বতন্ত্র নবী হওয়া সম্পর্কে তার কয়েকটি উক্তি ঃ

(১) "আমি সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন এবং তিনিই আমার নাম নবী রেখেছেন।"[২]

(২) "আমি যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে প্রেরিত তা প্রমাণ করার জন্য তিনি এমন অসংখ্য (বারাহীনে আহমদিয়ার বর্ণনা মতে[৩] ১০ লক্ষাধিক) নিদর্শন দেখিয়েছেন যে, সেগুলো হাজার নবীর উপর বন্টন করা হলেও এর দ্বারা তাদের সকলের নবুওয়াত প্রমাণিত হতে পারে। কিন্তু এরপরও মানুষের মধ্যে যারা শয়তান তারা মানে না।"[৪]

(৩) "আমি সেই আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ, তিনিই আমাকে প্রেরণ করেছেন, তিনিই আমার নাম নবী রেখেছেন। তিনিই মাসীহে মাওউদ নামে আমাকে ডেকেছেন। তিনিই আমার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য বিরাট নিদর্শন পেশ করেছেন, যার সংখ্যা তিন লাখ পর্যন্ত পৌঁছেছে।"[৫] উল্লেখ্য তিনি যে সব প্রমাণের কথা বলেছেন, তার মধ্যে রয়েছে তার মনি অর্ডারের মাধ্যমে বা বিভিন্ন উপায়ে টাকা-পয়সা বা হাদিয়া-তোহ্‌ফা আগমনের সংবাদ। (অথচ এটা কৃত্রিম কৌশলের মাধ্যমেও বলা যেতে পারে।) যেমন তিনি বলেছেনঃ আমার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নিয়ম হল প্রায়শই নগদ টাকা-পয়সা যা

---

১. ॥ مباحثہ راولپنڈی. مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی. کتابت سید محمد باقر خوشنویس قادیان، صفحہ/۱۴۲

২. ॥ایضا ، صفحہ/۱۳۵

৩. ॥ براھین احمدیہ حصۂ پنجم. مرزا غلام احمد قادیانی. صفحہ/۵۹ مطبع انوار احمدیہ مشین پریس قادیان ۱۹۰۸

৪. چشمۂ معرفت صفحہ/۳۱۷. مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی. شائع کردہ ڈیو تالیف وتصنیف ربوہ مطبع انوار احمدیہ مشین پریس قادیان ۱۹۰۸ ॥

৫. تتمۂ حقیقۃ الوحی. صفحہ/۶۸. مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی. احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور. ۱۹۵۲/۱۳۷۱ھ -

আসে বা যা হাদিয়া তোহ্‌ফা আসে তা পূর্বাহ্নেই এলহাম কিংবা স্বপ্ন যোগে আমাকে অবগত করানো হয়। এ ধরনের নিদর্শন হবে পঞ্চাশ হাজারের উর্ধ্বে।[১]

(৪) "এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, এই সব এলহামের মধ্যে আমার সম্পর্কে বারবার বলা হয়েছে যে, এ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রেরিত, আল্লাহ্‌র আদেশপ্রাপ্ত, খোদার বিশ্বস্ত এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত। যা কিছু সে বলেন তার প্রতি তোমরা ঈমান আনয়ন কর। তার শত্রুগণ জাহান্নামী।"[২]

(৫) হযরত মসীহ মাওউদ (মির্জা সাহেব) নিজেকে স্পষ্টভাবে আল্লাহ্‌র নবী ও রাসূল হিসেবে পেশ করেছেন। এবং নিজেকে নবী রাসূলদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।[৩]

মির্জা গোলাম আহমদের দাবীসমূহ ঃ

তার দাবীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ টি। এসব দাবীর অনেকটা পরস্পর বিরোধীও ছিল আবার বিচিত্রও ছিল। যেমন তার কয়েকটি দাবীর কথা নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

১. মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবী।[৪]
২. ইমাম হওয়ার দাবী।[৫]
৩. খলীফা হওয়ার দাবী।[৬]
৪. ইমাম মাহ্‌দী হওয়ার দাবী।[৭]
৫. ঈসা ইব্‌নে মারইয়াম হওয়ার দাবী।[৮]
৬. ঈসা ইব্‌নে মারইয়ামের অবতার হওয়ার দাবী।[৯]

---

১. قادیانی مذہب (جدید ایڈیشن. جنوری ۲۰۰۱م). الیاس برنی. صفحہ/۴۹۴ از حقیقۃ الوحی. صفحہ/۳۳۳ ॥ وروحانی خزائن جـ/۲۲. صفحہ/۳۴۶-

২. ॥ انجام اتھم. مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی. صفحہ/۶۲

৩. قادیانی مذہب (جدید ایڈیشن. جنوری ۲۰۰۱م). الیاس برنی. صفحہ/۲۶۵-۲۶۴. از اخبار الفضل قادیان.. جـ/۲ نمبر ۳۸ مورخہ ۱۳ ستمبر ۱۹۱۴ء- ॥

৪. মির্জা বলেনঃ" আল্লাহ আমাকে এই যুগ এবং যমানার ইমাম, খলীফা ও মুজাদ্দিদ বানিয়েছেন।" آئینہ کمالات اسلام. (عربی حصہ) مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی. صفحہ/۴۲۳- ॥

৫. প্রাগুক্ত ॥ ৬.প্রাগুক্ত ॥ ৭. তার প্রায় সব গ্রন্থেই এর উল্লেখ রয়েছে ॥

৮. انجام اتھم. مرزا غلام احمد قادیانی. صفحہ/۵۹ وحقیقۃ الوحی. مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی، صفحہ/۷۲- احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور ۱۳۷۱ھ/۱۹۵۲م- ॥

৯. قادیانی مذہب (جدید ایڈیشن. جنوری ۲۰۰۱م). الیاس برنی. صفحہ/۴۳۵-۴۳۴. ضمیمہ رسالہ جہاد ص ۷۶، روحانی خزائن ص ۲۸-۲۷ مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب- ॥

৭. মসীহ মাওউদ (প্রতিশ্রুত মাসীহ) হওয়ার দাবী। তিনি বলেন, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হযরত ঈসা মসীহের আসমান হতে অবতরণ করার যে কথা হাদীছে উল্লেখ আছে, তা আমি।[১]

৮. যিল্লী নবী বা বুরূজী নবী অর্থাৎ, ছায়া নবী হওয়ার দাবী।[২]

৯. উম্মতী নবী হওয়ার দাবী।[৩]

১০. এলহামী নবী হওয়ার দাবী।[৪]

১১. নবী হওয়ার দাবী।[৫]

১২. রাসূল হওয়ার দাবী।[৬]

১৩. তার নিকট ওহী আসার দাবী।[৭]

১৪. তার উপর ২০ পারার মত কুরআন নাযিল হওয়ার দাবী।[৮]

১৫. ঈসা (আঃ)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবী।[৯] তিনি নিজেকে ঈসা (আঃ)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য হযরহ ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে জঘন্য ধরনের মন্তব্য করেছেন। যেমন

---

১. حقيقة الوحى . مصنفه مرزا غلام احمد قادياني، صفحه/١٩٤-احمديه انجمن اشاعت اسلام لاهور ١٣٧١ھ/١٩٥٢م-॥

২. ॥ مباحثه راولپنڈی. مصنفه مرزا غلام احمد قادیانی . کتابت سید محمد باقر خوشنویس قادیان ، صفحه/١٣٤-

৩. حقيقة الوحى . مصنفه مرزا غلام احمد قادياني، صفحه/٣٩٠ احمديه انجمن اشاعت اسلام لاهور ١٣٧١ھ/١٩٥٢م-॥

৪. ॥ مباحثه راولپنڈی. مصنفه مرزا غلام احمد قادیانی . کتابت سید محمد باقر خوشنویس قادیان ، صفحه/١٣٧

৫. মির্জা বলেনঃ এই উম্মতের মধ্যে নবী নাম পাওয়ার জন্য আমাকেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। حقيقة الوحى . مصنفه مرزا غلام احمد قادياني، صفحه/٣٩١ احمديه انجمن اشاعت اسلام لاهور ١٣٧١ھ/١٩٥٢م-॥

৬. মির্জা বলেনঃ আল্লাহ আমার সম্বন্ধে বলেছেন ঃ আমি তোমাকে রাসূল রূপে প্রেরণ করলাম। ايضا . صفحه/١٠١-॥

৭.মির্জা বলেনঃ "আমি যা কিছু আল্লাহ্‌র ওহী থেকে প্রাপ্ত হই, খোদার কসম তাকে সব রকমের ত্রুটি থেকে পবিত্র মনে করি। কুরআনের ন্যায় আমার ওহী ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত। এটা আমার ঈমান ও বিশ্বাস। খোদার কসম, এটাও আল্লাহ পাকের মুখ নিঃসৃত বাণী। نزول المسيح . مرزا غلام احمد قادياني . صفحه/٩٦-॥

৮.মির্জা বলেনঃ আমার উপর আল্লাহ্‌র কালাম নাযিল হয়েছে . যা লেখা হলে বিশ পারার চেয়ে কম হবে না। حقيقة الوحى . مصنفه مرزا غلام احمد قادياني . صفحه/٣٩١ احمديه انجمن اشاعت اسلام لاهور ١٣٧١ھ/١٩٥٢م-॥

৯. মির্জা বলেনঃ "ইবনে মারইয়াম (ঈসা আঃ)-এর কথা ছেড়ে দাও, গোলাম আহমদ তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। [illegible] ১০১ পৃঃ।

তিনি বলেছেন ঃ ঈসা মাসীহের তিন দাদী ও তিন নানী (বেশ্যা) ছিল নাউযুবিল্লাহ)।[১]

অন্যত্র বলেছেনঃ ঈসা মসীহের মিথ্যা বলার অভ্যাস ছিল।[২]

১৬. সকল নবীর সমকক্ষ হওয়ার দাবী।[৩]

১৭. তিনি আদম, শীষ, নূহ, ইব্রাহীম, ইসহাক, ইসমাঈল, ইয়া'কূব, ইউসুফ, মূসা, দাউদ, ঈসা প্রমুখ বিভিন্ন নবী হওয়ার দাবী করেছেন।[৪]

১৮. কোন কোন নবী থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবী।[৫]

১৯. সমস্ত নবী রাসূল থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবী।[৬]

২০. আহমদ হওয়ার দাবী।[৭]

২১. মুহাম্মাদ হওয়ার দাবী।[৮]

২২. মুহাম্মাদ বরং মুহাম্মাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবী।[৯]

---

১. যমীমা আঞ্জামে আথহাম, ৫ পৃঃ ॥ ২. প্রাগুক্ত, ৫ পৃঃ ॥

৩."যদিও দুনিয়ায় অনেক নবী আবির্ভূত হয়েছেন কিন্তু জ্ঞান বিচক্ষণতায় আমি কারুর চেয়ে কম নই। نزول المسيح . مرزا غلام احمد قادياني . صفحه/٩٠-॥

৪. তিনি বলেছেন ঃ আদম (আঃ) থেকে নিয়ে শেষ নবী পর্যন্ত সব নাম তাকে দেয়া হয়েছে। نزول المسيح . مرزا غلام احمد قادياني . صفحه/٥-॥

৫. হাদীছে এসেছে যদি মূসা ও ঈসা জীবিত থাকতেন তাহলে আঁ হযরত (সাঃ)-এর এত্তেবা করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকত না। কিন্তু আমি বলি মাসীহে মাওউদের সময় মূসা ও ঈসা জীবিত থাকলে মাসীহে মাওউদ (মির্জা সাহেব)-এর অবশ্যই এত্তেবা করতে হত। قادياني مذهب (جديد ايڈيشن جنوری ٢٠٠١م) الياس برنی. صفحه/٣١٠ از اخبار الفضل قاديان. ج/٣ نمبر ٩٨ مورخه ١٨ مارچ ١٩١٦-॥

৬.মির্জা বলেনঃ 'আমার আগমনে প্রত্যেক নবী জীবন লাভ করেছেন। সমগ্র রসূল আমার জামার মধ্যে লুকিয়ে আছেন। نزول المسيح . مرزا غلام احمد قادياني . صفحه/١٠٠-॥ অন্যত্র তিনি বলেছেন, "অনেক নবী আগমন করেছেন কিন্তু কেউই মারেফতে আমার অগ্রগামী হতে পারেননি। (ايضا) তিনি আরও বলেছেন, "ঈসা মূসা মুহাম্মাদ প্রমুখের চেয়ে তার একীন বেশী। (ايضا صفحه/١١٠-٩٠)॥

৭ . মির্জা সাহেব কুরআনের আয়াতে যে "আহমদ" নামের উল্লেখ আছে, তা নিজের জন্য দাবী করেছেন। حقيقة الوحى . مصنفه مرزا غلام احمد قادياني . احمديه انجمن اشاعت اسلام لاهور ١٣٧١ھ/١٩٥٢م-॥

৮. حقيقة الوحى . مصنفه مرزا غلام احمد قادياني، احمديه انجمن اشاعت اسلام لاهور ١٣٧١ھ/١٩٥٢م-॥

৯. আমার বিশ্বাস হল হযরত মাসীহে মাওউদ এত পরিমাণ রাসূল (সাঃ)-এর নকশে কদমে চলেছেন যে, "তিনিই" (মুহাম্মাদ) হয়ে গেছেন। কিন্তু উস্তাদ, আর শাগরেদের মর্যাদা কি এক হতে পারে? শিষ্য শাগরেদ জ্ঞানে উস্তাদের সমকক্ষ হয়ে যায়?..... ঠিক আঁ হযরত (সাঃ) ও মসীহে মাওউদের [illegible] অনুরূপ। قادياني مذهب (جديد ايڈيشن جنوری ٢٠٠١م) الياس برنی. صفحه/٣١٠ از ذکر الٰہی صفحه/١٩ ॥ از میاں محمود احمد صاحب خلیفہ قادیان-

২৩. তিনি জগতবাসীর জন্য আল্লাহ্‌র রহমত স্বরূপ।[১]
২৪. তাকে সৃষ্টি করা না হলে আসমান যমীন কিছুই সৃষ্টি করা হত না।[২]
২৫. আল্লাহ্‌র প্রকাশ হওয়ার দাবী।[৩]
২৬. তিনি আল্লাহ্‌র পুত্রবৎ।[৪]
২৭. শ্রী কৃষ্ণের অবতার হওয়ার দাবী।[৫]
২৮. শ্রী কৃষ্ণ হওয়ার দাবী।[৬]
২৯. যুলকারনাইন হওয়ার দাবী।[৭]

এছাড়াও তার দাবীর শেষ ছিল না। এক পর্যায়ে তিনি তার মধ্যে খোদার অবতারিত হওয়ার কথা এবং অন্যত্র (স্বপ্নযোগে) খোদা হওয়ারও দাবী করেছেন।[৮]

---

১. মির্জা বলেনঃ খোদা তা'আলা আমাকে বলেছেনঃ তোমাকে আমি সারা জাহানের জন্য রহমতরূপে প্রেরণ করলাম। ॥ انجام اتھم. مرزا غلام احمد قادیانی. صفحہ/۷۸۔

২. মির্জা বলেনঃ খোদা তা'আলা আমাকে পাঠিয়েছেন যে, যদি তোমাকে পয়দা না করতাম, তবে আসমান যমীন কিছুই সৃষ্টি করতাম না। حقیقۃ الوحی. مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی، صفحہ/۹۹ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور ۱۳۷۱ھ/۱۹۵۲م۔ ॥

৩. যার প্রকাশ খাস আল্লাহ্‌র প্রকাশ। قادیانی مذہب (جدید ایڈیشن. جنوری ۲۰۰۱م). الیاس برنی. صفحہ/۳۲۸. از اخبار الفضل قادیان. جلد ۳، نمبر ۱۴۶ ص ۳۰۳ مئی ۱۹۱۵ء ॥ برنی. صفحہ/۳۲۸.

৪. قادیانی مذہب (جدید ایڈیشن. جنوری ۲۰۰۱م). الیاس برنی. صفحہ/۳۲۸. از تشحیذ الاذھان جلد ۲ نمبر ۱۱ صفحہ/۴۰۸ نومبر ۱۹۱۱ء۔ ॥

৫. قادیانی مذہب (جدید ایڈیشن. جنوری ۲۰۰۱م). الیاس برنی. صفحہ/۴۳۲ لیکچر سیالکوٹ ۲ نومبر، ۱۹۰۴ صفحہ/۳۴ روحانی خزائن. ص ۲۲۸، ۲۲۹ جـ/۲۰ از مرزا غلام احمد قادیانی صاحب۔ ॥

৬. মির্জা বলেনঃ আমি মুসলমানদের জন্য মাসীহ্ ও হিন্দুদের জন্য শ্রী কৃষ্ণ। قادیانی مذہب (جدید ایڈیشن. جنوری ۲۰۰۱م). الیاس برنی. صفحہ/۳۴۷-۳۴۶. از روحانی خزائن جـ/۲۰. صفحہ/۲۲۸. و مرزا غلام احمد کا لیکچر سیالکوٹ ۲ نومبر ۱۹۰۴ صفحہ/۳۴۔ ॥ তিনি আরও বলেন ঃ যত নবী-রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন তাদের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য আমার মধ্যে বিদ্যমান। হিন্দুদের মধ্যে কৃষ্ণ নামে যে নবী অতিবাহিত হয়েছেন, তারও বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলীও। براہین احمدیہ. مرزا غلام احمد قادیانی. حصہ/۵. صفحہ/۹۷. انوار احمدیہ مشین پریس. قادیان. ۱۵ اکتوبر، ۱۹۰۸۔ ॥

৭. براہین احمدیہ. مرزا غلام احمد قادیانی. حصہ/۵. صفحہ/۹۸. انوار احمدیہ مشین پریس. قادیان. ۱۵ اکتوبر، ۱۹۰۸۔ ॥

৮. মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী লিখেছেন, "আমার সত্তার মধ্যে খোদা প্রবেশ করেছেন।" تذکرہ یعنی وحی مقدس. صفحہ/۱۹۸۔ আরও বলেছেন, "আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি স্বয়ং খোদা এবং আমি বিশ্বাসও করলাম- আমি প্রকৃতই খোদা।"তিনি আরও লিখেছেন, স্বপ্নের ঘোরে আমি বললাম, 'যমীন ও আসমান আমিই তৈরী করেছি।..... আমি বললাম ঃ আমিই প্রথম আসমানকে আলোকবর্তিকা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি।..... আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দর গঠনে। روحانی خزائن بنام آئینہ کمالات اسلام/دافع الوساوس، جـ/۵ صفحہ/۵۶۵-۵۶۴۔ তার আরবী ইবারতটুকু নিম্নরূপঃ

وبینما انا فی ھذہ الحالۃ کنت اقول انا نرید نظاما جدیدا او سماء جدیدۃ وارضا جدیدۃ فخلقت السموت والارض ..... وقلت انا زینا السماء الدنیا بمصابیح ..... وخلقت الانسان فی احسن تقویم۔ ॥

খোদার যেমন ৯৯ টা নাম রয়েছে মির্জা সাহেব দাবী করেছেন তারও অনুরূপ ৯৯ টা নাম রয়েছে।[১] তার অনুসারীরা মির্জা কাদিয়ানীর এসব দাবীর প্রতি ঈমান এনে তার উম্মত ভুক্ত হয়েছে। তার অনুসারীরা তার কোন একটি দাবীকেও অস্বীকার করেনি। বরং তাকে মুজাদ্দিদ, ইমাম মাহ্‌দী, মাসীহে মাওউদ, (প্রতিশ্রুত মাসীহ) যিল্লী, বুরূজী (ছায়া) নবী, উম্মতী নবী ও শরী'আতের অধিকারী নবী হিসেবে মেনে আসছে।

কাদিয়ানীদের বর্ণনা মতে মির্জা গোলাম আহমদের এ সব দাবীর মধ্যে প্রধান ছিল তার "মাসীহে মাওউদ" তথা প্রতিশ্রুত ঈসা মসীহ হওয়ার দাবী। অথচ সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত ঈসা (আঃ) কিয়ামতের পূর্বে নাযিল হবেন এবং নবী হিসেবে নয় বরং নবী (সাঃ)-এর উম্মতী শাসক হিসেবে রাজ্য পরিচালনা করবেন। বাবে লূদ নামক স্থানে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এবং অবশেষে ইন্তেকাল করবেন। মদীনা শরীফে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কবর মুবারকের পশে তাঁকে দাফন করা হবে। অত্র গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ সম্পর্কিত হাদীছগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্য কথা বাদ দিলেও ঈসা দাবী করনেওয়ালা মির্জা কাদিয়ানী মক্কা মদীনা শরীফ জীবনেও যাননি, তার মৃত্যু হয়েছে পাঞ্জাবে এবং সেখানেই হয়েছে তার কবর। ঈসা মাসীহ হওয়ার দাবী করলে প্রশ্ন উঠতে পারত যে, ঈসা (আঃ)এর কোন পিতা ছিল না অথচ মির্জা সাহেবের পিতা রয়েছে। আরও প্রশ্ন উঠতে পারত যে, ঈসা (আঃ)-এর মা ছিল মারইয়াম অথচ মির্জা সাহেবের মাতা অন্য? এ সব প্রশ্নের জওয়াব দেয়ার জন্যই তিনি বলেছেনঃ ঈসা (আঃ)-এর পিতা ছিল, যার নাম ইউসুফ নাজ্জার।[২] এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন এড়ানোর জন্য তিনি নিজেকে দাবী করে বলেছেন যে, আমিই মারইয়াম। আমার থেকেই আমার আবির্ভাব হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছিল মারইয়াম ছিল নারী অথচ আপনি পুরুষ? এর জওয়াবে তিনি বলেছিলেন ঃ আমার মধ্যে নারিত্বও বিদ্যমান। প্রমাণ হল আমার হায়েয হয়। তিনি তার অর্শ রোগের দিকে ইংগিত করেই এ কথা বলেছিলেন। এমন সব হাস্যকর প্রলাপও তিনি বকেছেন।

তার আর একটি প্রধান দাবী ছিল 'মাহ্‌দী' হওয়ার। কিন্তু প্রিয়নবী (সাঃ) সত্যিকার মাহ্‌দীর বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে গেছেন। তিনি জন্মগ্রহণ করবেন প্রিয়নবী (সাঃ)-এর বংশে। তাঁর পিতার নাম হবে আব্দুল্লাহ, মাতার নাম হবে আমিনা। তার আত্মপ্রকাশ হবে মক্কা মুয়াজ্জমায়। পবিত্র কা'বা শরীফের চত্ত্বরেই লোকেরা তাকে সনাক্ত করবে এবং তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করবে। শাম ও ইরাকের আবদালগণ তার কাছে এসে তার হাতে বাই'আত হবেন। তিনি কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করবেন। ইত্যাদি।[৩] অথচ এর কোনটির সঙ্গেই গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর সামান্যতম মিলও নেই।

---

১. قادیانی مذہب (جدید ایڈیشن. جنوری ۲۰۰۱م). الیاس برنی. صفحہ/۲۸۵-۲۸۴۔ از حضرت میر محمد اسماعیل صاحب۔ ॥

২.এভাবে মারইয়ামকে যিনাকারিনী সাব্যস্ত করা হয়েছে ॥

৩. এ সম্পর্কে "মওদূদী মতবাদ" শিরোনামের অধীনে সংশ্লিষ্ট হাদীছসমূহ উল্লেখ পূর্বক বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে ॥

কাদিয়ানীদের আকীদা-বিশ্বাস ঃ

গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর পূর্বোল্লেখিত দাবীসমূহ থেকে কাদিয়ানীদের আকীদা-বিশ্বাস কি তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। পূর্বোল্লেখিত বর্ণনা থেকে তাদের যে আকীদা-বিশ্বাস ফুটে ওঠে সংক্ষেপে তা হল ঃ

* ইমাম মাহ্‌দী সম্পর্কিত মুসলমানদের ধারণা ভুল।
* হযরত ঈসা মাসীহ্ সম্পর্কিত মুসলমানদের ধারণা ভুল।
* খতমে নবুওয়াত সম্পর্কিত মুসলমানদের ধারণা ভুল, রাসূল (সাঃ)-এর পরেও আরও নবী হতে পারে।
* গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নবী, তার নিকট ওহী আসত, তার উপর ২০ পারার মত কুর-আন নাযিল হয়েছিল।
* খোদার পুত্র হতে পারে।
* গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রকাশ (ظهور) ছিলেন।
* গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আল্লাহ্-এর প্রকাশ (ظهور) ছিলেন।
* গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ছিলেন মুহাম্মাদ এবং আহমদ।
* গোলাম আহমদ কাদিয়ানী অনেক নবী বরং সমস্ত নবী রাসূল থেকে এমনকি হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) থেকেও শ্রেষ্ঠ।
* গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ছিলেন খোদার অবতার বা খোদা।
* গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ছিলেন কৃষ্ণের অবতার।

এ ছাড়াও তাদের যে সব আকীদা-বিশ্বাস ছিল তার কিছুটা নিম্নরূপ ঃ

* মির্জা সাহেব ছিলেন ইব্রাহীম।[১]
* পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস।[২]
* কাদিয়ানীগণ নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গকে নবী মনে করেন ঃ রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, জরদশত, কনফুসিয়াস ও বাবা নানক।[৩]

---

১. قادیانی مذہب (جدید ایڈیشن۔ جنوری ۲۰۰۱م)۔ الیاس برنی۔ صفحہ/۳۱۸۔ از اربعین نمبر ۳۔ صفحہ/۳۸، ۶۹۔ و روحانی خزائن صفحہ/۴۲۰-۴۲۱ جـ/۱۷ مصنف غلام احمد قادیانی۔ ॥ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى আয়াত তার দিকেই ইংগিত করেছে।

২. মির্জা বশীর আহমদ বলেছেনঃ মাসীহে মাওউদের অস্বীকার কারী যদি কাফের না হয়, তাহলে নাউযু-বিল্লাহ নবী করীম (সাঃ)এর অস্বীকারকারীও কাফের হবে না। এটা কিভাবে সম্ভব যে, প্রথমবার প্রেরিত হওয়ার প্রাক্কালে তাকে অস্বীকার করা কুফরী হবে আর দ্বিতীয়বার প্রেরিত হওয়ার পর তাকে অস্বীকার করা কুফরী হবেনা? قادیانی مذہب (جدید ایڈیشن۔ جنوری ۲۰۰۱م)۔ الیاس برنی۔ صفحہ/۳۱۹، از کلمۃ الفصل مندرجہ رسالہ ریویو آف ریلیجیز۔ ص ۱۴۶، نمبر ۳ جلد ۱۴۔ ॥

৩. قادیانی مذہب (جدید ایڈیشن۔ جنوری ۲۰۰۱م)۔ الیاس برنی۔ صفحہ/۲۸۲-۲۸۱ از چوہدری ظفر اللہ خان قادیانی۔ ٹریکٹ جو مارچ ۱۹۳۳ء بمقرب یوم التبلیغ شائع ہوا۔ منقول از پیغام صلح لاہور جـ/۲۲ مورخہ ۱۱ اپریل ۱۹۳۳ء۔ ॥

* মির্জা গোলাম আহমদ খাতামুন্নাবী অর্থাৎ, শেষ নবী। তার পরে আর কোন নবী আসবেন না।[১]

গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও তার অনুসারীদের সম্বন্ধে উম্মতে মুসলিমার সর্বসম্মত অভিমত ঃ

মুসলমানদের দ্ব্যর্থহীন আকীদা হল হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) শেষ নবী। তারপর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবেন না। 'শরীআত বিশিষ্ট নবী' বা 'শরী'আত বিহীন নবী' বা 'ছায়া নবী' 'যিল্লী নবী' 'বুরূযী নবী' বা 'উম্মতী নবী' কোন প্রকার নবীই আর আসবেন না। উম্মতের কেউ নবী-র এ সব প্রকার করেননি। অতএব যে বা যারাই যে প্রকারের নবুওয়াত দাবী করবে এবং যে বা যারাই তার নবুওয়াতকে মেনে নিবে, তারা ভণ্ড, প্রতারক, মিত্যাবাদী, ইসলাম থেকে খারিজ, মুরতাদ, কাফের।

হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) খাতামুন্নাবী অর্থাৎ, তিনি শেষ নবী, তাঁরপর আর কোন নবী আসবেন না। এই আকীদা-বিশ্বাসকে বলা হয় খতমে নবুওয়াত-এর আকীদা-বিশ্বাস। খতমে নবুওয়াতের এই আকীদা কুরআন, হাদীছ, ইজ্‌মা ও কিয়াস (যুক্তি) তথা শরী'আতের সব রকম দলীল দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। "খতমে নবুওয়াত প্রসঙ্গ" শিরোনামে পরবর্তী প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মির্জা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী নবী-রাসূল হওয়ার দাবী করে এই অকাট্য আকীদা-বিশ্বাসকে অমান্য করায় নিঃসন্দেহে কাফের সাব্যস্ত হয়েছে। এ ছাড়াও মাসীহে মাওউদ হওয়ার দাবী, শরী'আতের বিভিন্ন বিধান রহিত করার দাবী, সর্বোপরি খোদা হওয়ার দাবী প্রভৃতি দ্বারাও তিনি নিঃসন্দেহে কাফের হয়ে গেছেন। এ কারণে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র উম্মতে মুসলিমা সর্বসম্মত ভাবে তাকে কাফের বলে ফতওয়া দিয়েছেন।

১৯৭৪ সালে বিশ্ব মুসলিম সংস্থা 'রাবেতা আলমে ইসলামী-র উদ্যোগে পবিত্র মক্কা মুকাররমার কনফারেন্স ১৪৪ টি মুসলিম রাষ্ট্র ও সংগঠনের অংশগ্রহণে ঘোষণা করে যে, কাদিয়ানীরা কাফের এবং তাদের প্রচারিত কুরআন শরীফের তাফসীর বিকৃত এবং তারা মুসলমানদের ধোকা দিচ্ছে ও পথভ্রষ্ট করছে। ১৯৮৮ সালে ও, আই, সি-র উদ্যোগে ইরাকে সকল মুসলিম দেশের ধর্মমন্ত্রীদের এক সম্মেলনে প্রত্যেক মুসলিম দেশে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার জন্য লিখিত প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়। সেমতে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক মুসলিম দেশই যথাঃ সউদী আরব, ইরান, ইরাক, কুয়েত, মালয়েশিয়া কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। পাকিস্তান গণপরিষদও ১৯৭৪ সালে

---

১. এই উম্মতের মধ্যে নবী শুধু একজনই আসতে পারেন। তিনি হলেন মাসীহে মাওউদ। তিনি ব্যতীত কোনক্রমেই অন্য কারও আগমনের অবকাশ নেই। যেমন অন্যান্য হাদীছের দিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) শুধু মাসীহ মাওউদের নামই নবী রেখেছেন, আদৌ অন্য কারও এ নাম রাখেননি। قادیانی مذہب (جدید ایڈیشن۔ جنوری ۲۰۰۱م)۔ الیاس برنی۔ صفحہ/۲۴۹۔ از رسالۃ تشحيذ الاذهان۔ قادیان، جـ/۳ صفحہ/۳۲-۳۰ مارچ ۱۹۱۴۔ ॥

আইনগত এবং শাসনতান্ত্রিকভাবে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম সম্প্রদায় বলে ঘোষণা দিয়েছে। সৌদী আরবসহ বহু মুসলিম দেশই তাদেরকে অনুরূপ অমুসলিম ঘোষণা করেছে। পাকিস্তানে ১৯৭৪ সালে কাদিয়ানীগণ সংখ্যালঘু অমুসলিম ঘোষিত হওয়ার পর কাদিয়ানী ধর্মমতের সূতিকাগার লন্ডনে তাদের প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। বৃটেন ও বর্তমান বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধান নেতা আমেরিকা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে এবং কাদিয়ানী ধর্মমত প্রচারের জন্য লক্ষ্য-কোটি ডলার তাদেরকে দিচ্ছে।

কাদিয়ানীদের লাহোরী গ্রুপ সমাচার ঃ

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মৃত্যুর পর কাদিয়ানীদের প্রথম নেতা (তাদের ভাষায় প্রথম খলীফা) নির্বাচিত হন হাকীম নূর উদ্দীন। হাকীম নূর উদ্দীন ১৯১৪ সালের মার্চ মাসে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্তের প্রশ্নে সর্বপ্রথম তাদের মধ্যে মতানৈক্যের সূচনা হয়। কাদিয়ানীদের ভাষায় তাদের দলে হাকিম নূর উদ্দীনের পরে শিক্ষিত ও যোগ্য লোক হিসেবে মোহাম্মাদ আলী সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাই তাদের ভাষায় শিক্ষিত লোকদের অধিকাংশের মনোভাব ছিল মোহাম্মাদ আলীই তাদের নেতা নির্বাচিত হবেন। অন্য দিকে সাধারণ ভক্তরা তাদের নবীপুত্র মির্জা বশীর উদ্দীন মাহ্মুদ আহমদকে স্থলাভিষিক্ত করার পক্ষপাতি ছিল। এমনিতে কাদিয়ানী ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা মির্জা কাদিয়ানীর ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে এমন অনেক ঘটনা রয়েছে, যা কোন রুচিশীল ব্যক্তির পক্ষে মুখে উচ্চারণ করা দুস্করই বটে। তবে মির্জা বশীর উদ্দীন মাহ্মুদের চারিত্রিক অধঃপতন সম্পর্কে কাদিয়ানী মহলেও বহুল প্রচারিত ছিল বলে তাদের শিক্ষিত লোকেরা তাকে নেতা হিসেবে মেনে নিতে সম্মত হয়নি। কিন্তু সাধারণ ভক্তদের দল ভারী ছিল, তারা তাকে নেতা মনোনীত করে নিল। ১৯১৪ সালের ১৪ই মার্চ মির্জা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ কাদিয়ানীদের বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে নেতা মনোনীত হন। অতঃপর ১৯১৪ সালের ২২শে মার্চ মোহাম্মাদ আলী তার দলবল নিয়ে লাহোর চলে এসে এ দলের নেতা মনোনীত হন। এভাবে কাদিয়ানী ধর্মমতাবলম্বীরা দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রথমোক্ত দলটি 'কাদিয়ানী' নামে পরিচিতি লাভ করে। আর অপর দলটি 'লাহোরী কাদিয়ানী' নামে আখ্যায়িত হয়।[১]

কাদিয়ানী ও লাহোরী কাদিয়ানীদের মধ্যে পার্থক্য ঃ

হাকিম নূর উদ্দীনের নেতৃত্বের দীর্ঘ ছয় বছরে তাদের যে সব পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, ঐ সবগুলোতে মির্জা কাদিয়ানীকে নবী-রাসূল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা সকলে তাকে নবী-রাসূল হিসেবে মান্য করে আসছে। পরবর্তীতে সৃষ্ট লাহোরী গ্রুপের নেতা মোহাম্মাদ আলী এ সময় কাদিয়ানীদের ইংরেজি পত্রিকা 'রিভিউ অফ রিলিজিয়াস'-এর সম্পাদকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এসব দিনগুলোতে উক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় কলাম ও মোহাম্মাদ আলী কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধে মোহাম্মাদ

১. কাদিয়ানী ধর্মমত ১০৫ পৃঃ থেকে গৃহীত ॥

আলী তাকে শুধু নবী-রাসূল হিসেবে উল্লেখ করেছেন তা নয় বরং নবী-রাসূলের সকল বৈশিষ্ট্যাবলীর অধিকারী হিসেবে প্রমাণ করার অপপ্রয়াস চালিয়েছেন।[১]

মোহাম্মাদ আলী আরও লিখেছেন, "আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা যাই বলুক না কেন, আমরা কিন্তু এ বিশ্বাসের উপর স্থির ও অটল আছি যে, আল্লাহ তা'আলা এখনও নবী সৃষ্টি করতে পারেন। সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ (আল্লাহ্র অলী ও নেককার) এর মর্যাদা দান করতে পারেন, তবে মর্যাদা লাভের আগ্রহী থাকতে হবে। ..... আমরা যে ব্যক্তিত্বের হাতে হাত মিলিয়েছি (মির্জা কাদিয়ানী) তিনি সত্যবাদী ছিলেন এবং আল্লাহ্র মনোনীত পবিত্র রাসূল ছিলেন।"[২]

এ সকল উদ্ধৃতি কাদিয়ানী লাহোরী গ্রুপের নেতা মোহাম্মাদ আলীর। এ সকল উদ্ধৃতি দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী মানার দিক থেকে কাদিয়ানীদের উভয় গ্রুপ ঐক্যমত্য পোষণ করে আসছে। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন দ্বিমত ছিল না।

কাদিয়ানীদের দু'দলে বিভক্তি ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মতানৈক্যের কারণে নয়। বরং উভয় দলের ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল এক ও অভিন্ন। নেতৃত্বের প্রশ্নে সৃষ্ট কোন্দলের ফলশ্রুতিতেই তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তবে উভয় দলের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, কাদিয়ানীরা মির্জা কাদিয়ানীকে স্পষ্ট ভাষায় নবী বলে প্রকাশ করেন। আর লাহোরী কাদিয়ানীগণ বলেন, "আমরা তাকে আভিধানিক ও রূপক অর্থে নবী মান্য করি।" এটাও তাদের বহুবিধ প্রতারণার একটি।

যেহেতু কাদিয়নীদের বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মির্জা কাদিয়ানীর পুত্র মির্জা বশীর উদ্দীন মাহ্মুদ আহমদকে নেতা মেনে নিয়েছিল। আর লাহোরী গ্রুপ-যাদের নেতা মোহাম্মাদ আলী মনোনীত হয়েছিলেন, তারা- পূর্বোক্ত দলের তুলনায় একটি ক্ষুদ্রতম দল ছিল। এহেতু লাহোরী কাদিয়ানী জামাতের জন্য এমন দুর্বিসহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, এ দলটির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় লাহোরী গ্রুপটি তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে মুসলমানদের সহানুভূতি লাভ করা তাদের জন্য অত্যাধিক প্রয়োজনীয় মনে করে পরিভাষায় কিছুটা শাব্দিক পরিবর্তন এনে প্রচার করতে আরম্ভ করল, "আমরা মির্জা সাহেবের জন্য নবী শব্দটির ব্যবহার বর্জন করেছি। আর যদি কোথাও এ শব্দটির ব্যবহার আমাদের লেখনী কিংবা উক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে থাকে, তবে নবী শব্দটিকে আমরা আভিধানিক কিংবা রূপক অর্থে ব্যবহার করে থাকি।" তারা আরও বলতে আরম্ভ করল "আমরা গায়রে আহমদীদেরকে 'কাফের' বলার পরিবর্তে 'ফাসেক' বলে মনে করি।"[৩]

১.কাদিয়ানী ধর্মমত ১০৫ পৃঃ থেকে গৃহীত ॥

২. প্রাগুক্ত, ১০৩-১০৪ পৃঃ বরাত- আহ্মদিয়া মিলনায়তনে মোহাম্মাদ আলীর ভাষণ, কাদিয়ানী পত্রিকা আল-হাকাম, ১৮ জুলাই ইং এবং কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত মাসিক ফোরকান, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা ১১ পৃষ্ঠা ॥

৩. কাদিয়ানী ধর্মমত ১০৭ পৃঃ ও موقف الامة الاسلامية من القاديانية ॥

সারকথা কাদিয়ানী গ্রুপ কুরআন, হাদীছ ও উম্মতের সর্ববাদী মতে কাফের ও মুরতাদ সাব্যস্ত হয়েছে। তেমনি কাদিয়ানীদের লাহোরী গ্রুপও নিঃসন্দেহে কাফের ও মুরতাদ বলে গণ্য। মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে তারা কাদিয়ানীদের ন্যায় ব্যাপক অর্থে নবী বলে প্রচার না করলেও তাদের প্রামাণ্য পুস্তকাদি দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে কাদিয়ানীদের এ গ্রুপটিও তাকে যিল্লী নবী ও উম্মতি নবী বলে মান্য করে। তাছাড়া প্রকাশ্যে তারা মির্জা কাদিয়ানীকে মাসীহে মাওউদ বলে ব্যাপকভাবে দাবী করে থাকে। এ দাবীও কুরআন, হাদীছ ও উম্মতের ইজ্‌মা (ঐক্যমত্য)-এর পরিপন্থী হওয়ায় এটাও তাদের কাফের ও মুরতাদ সাব্যস্ত হওয়ার অন্যতম প্রমাণ।

বাংলাদেশে কাদিয়ানীদের তৎপরতা ঃ

যেহেতু বর্তমানে অপরাপর মুসলিম রাষ্ট্রে কাদিয়ানীদের ধর্মমতের প্রচার রাষ্ট্রীয় ভাবে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে। মুসলিম দেশ সমূহের মধ্যে কেবলমাত্র বাংলাদেশেই তাদের ধর্মমত প্রচারের সুযোগ রয়েছে। তাই বর্তমানে তাদের দৃষ্টি বাংলাদেশের উপর নিবদ্ধ হয়ে আছে। বাংলাদেশে সরকারী ভাবে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা না করার কারণে কাদিয়ানীগণ বাংলাদেশকে তাদের ধর্মমত প্রচারের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে। সেমতে কাদিয়ানীগণ বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে এমন কি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও কেন্দ্র কায়েম করে নানা ধরনের পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ করে দেশে মারাত্মক ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে চলেছে। পুরনো ঢাকায় ৪ নং বকশীবাজারে তাদের প্রধান কেন্দ্র। এ ছাড়াও ঢাকা মহানগরে তাদের আরও ৬ টি ছোট কেন্দ্র রয়েছে। কিছু দিন পূর্বেকার একটি জরিপ মোতাবেক বর্তমানে সারা বাংলাদেশে তাদের ১২৩ টির মত সেন্টার রয়েছে। এ ছাড়াও মুসলমানদেরকে মুরতাদ বানানোর জন্য তাদের পাঁচটি পৃথক পৃথক সংগঠন রয়েছে।

(১) মসলিসে আনসারুল্লাহ ঃ চল্লিশোর্ধ বয়সের লোকেরাই কেবল এ সংগঠনের সদস্য হয়ে থাকে। এ সংগঠন সাধারণ মুসলমান, সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষিত লোকদের মধ্যে কাদিয়ানী ধর্মমতের প্রচার করে থাকে। এ সংগঠনের উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে জড়িত ব্যক্তিবর্গ ও সংবাদপত্র সেবীদেরকে কাদিয়ানী ধর্মমতের দিকে আকৃষ্ট করা।

(২) মজলিসে খোদ্দামে আহমদিয়াঃ এ সংগঠনের সদস্য তারা হয়ে থাকে যাদের বয়স ১৫ বছরের উর্দ্ধে এবং ৪০ এর কম। এ সংগঠন যুবকদেরকে কাদিয়ানী বেড়াজালে আবদ্ধ করার তৎপরতা চালায়। বেকার যুবকদেরকে কাদিয়ানী অফিসারদের মাধ্যমে চাকুরী দানের প্রলোভন এবং শিক্ষিত বেকারদেরকে বৃটেন, আমেরিকাসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রেরণের প্রলোভন দেখিয়ে কাদিয়ানী ধর্মমতে দীক্ষিত করার চেষ্টা চালায়। এ সংগঠনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হচ্ছে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ছাত্রদেরকে শিক্ষা লাভের জন্য সাহায্য দান ও উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বিদেশে প্রেরণের প্রলোভন

দেখিয়ে কাদিয়ানী ধর্মমতে দীক্ষিত করার তৎপরতা চালিয়ে যাওয়া। এ সংগঠন শিক্ষার্থী ছাত্রদের মধ্যে কাদিয়ানী পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রচার পত্রসমূহ বিতরণ করে থাকে।

(৩) মজলিসে আত্‌ফালুল আহমদিয়াঃ এ সংগঠনের সদস্যদের বয়সের সীমারেখা হয়েছে ১৫ বছর বা তার কম। এ সংগঠন দ্বারা কাদিয়ানীদের কম বয়সী ছেলেরা তাদের সমবয়সী মুসলমান ছেলেদের নিকট কাদিয়ানীদের রচিত শিশু সাহিত্য বন্টন করে। যেমন তারা মুসলমান কচি কাঁচাদের নিকট 'এসো ভাল মুসলমান হই' জাতীয় প্রচার পত্র বিলি করে মুসলিম শিশুদের অন্তরে কাদিয়ানী মতবাদের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে। বিশেষ করে শহরের তথাকথিত অভিজাত পরিবারের মুসলমানরা তাদের সন্তান সন্ততিদেরকে ইসলামের মৌলিক ও প্রাথমিক শিক্ষা দান করাটা অপ্রয়োজনীয় মনে করে থাকে। এদের ছেলেদের অন্তরে ইসলাম সম্পর্কে কোন ধারণাই থাকে না। এদের মধ্যে পূর্বোক্ত প্রচার পত্র সমূহ বিলি করে তাদের অন্তরে কাদিয়ানী ধর্মমতের বীজ বপন করা হয়।

উপরোক্ত তিনটি সংগঠন পুরুষ ও কিশোরদের মধ্যে কাজ করে থাকে। আর মহিলাদের মধ্যে কাদিয়ানী ধর্মমত প্রচারের জন্য দুটি পৃথক সংগঠন রয়েছে।

(১) লাজ্‌না এমাইল্লাঃ ১৫ বছরের উর্দ্ধ বয়সী মহিলারা এ সংগঠনের সদস্যা হয়ে থাকে। এ সংগঠনের সদস্যা মহিলারা শহর, বন্দর ও গ্রামাঞ্চলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলাদের মধ্যে কাদিয়ানী ধর্মমতের পুস্তকাদি বিলি করে থাকে এবং সুযোগ পেলে কাদিয়ানী ধর্মমতের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে মহিলাদেরকে লোভ-লালসা ও প্রলোভন দিয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে এ সংগঠনের ৩০/৩৫ টি কেন্দ্র কার্য্যরত রয়েছে।

(২) নাসেরাতঃ ১৫ বছরের কম বয়সের কিশোরীদের মধ্যে প্রচার কার্য্য পরিচালনার জন্য 'নাসেরাত' নামে একটি পৃথক সংগঠন রয়েছে। এ সংগঠনের কিশোরীরা তাদের সম বয়স্কা কিশোরীদেরকে কাদিয়ানী মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। সমবয়সী কিশোরীদের সাথে স্কুল কলেজে বন্ধুত্ব পেতে কাদিয়ানীদের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে কাদিয়ানী মতবাদকে খাঁটি বলে বুঝানো হয়ে থাকে।[১]

কাদিয়ানী ধর্মমতের সাথে ইসলামের বিরোধ কোন্ পর্যায়ের ?

কাদিয়ানীদের সাথে মুসলমানদের বিরোধ শাখাগত বিরোধ নয়।[২] কাদিয়ানী ফিতনা কোন শাখাগত ফিতনা নয়। ইসলামের নামে আরও অনেক ফিতনা রয়েছে, এটিও

---

১. কাদিয়ানী ধর্মমত থেকে গৃহীত ॥

২. স্বয়ং কাদিয়ানীরাও এরূপ বলেছেঃ আমাদের এবং অকাদিয়ানীদের মধ্যকার বিরোধকে কোন শাখাগত (فروعی) বিরোধ মনে করা নির্জলা ভুল। ..... আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূলকে অস্বীকার করা কুফ্‌রী। আমাদের বিরোধীগণ মির্জা সাহেবের আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত হওয়াকে অস্বীকার করে। এটা শাখাগত বিরোধ হয় কেমন করে? الیاس. قادیانی مذہب (جدید ایڈیشن. جنوری ۲۰۰۱م). برنی. صفحہ/۵۶۴. از نہج المصلی مجموعہ فتاوی احمدیہ. صفحہ/۲۷۵-۲۷۴. مولفہ محمد فضل خان صاحب قادیانی۔ ॥

তেমন ধরনের ফিতনা নয়। বরং এটি একটি মৌলিক ফিতনা। এটি একটি মৌলিক আকীদাগত ফিতনা। এটি ইসলাম এবং অনৈসলামের বিরোধ। মুসলিম উম্মাহ কাদিয়ানীদেরকে মুসলমানদের তালিকাভূক্তই মনে করেন না। স্বয়ং কাদিয়ানীগণও মুসলিমদেরকে তাদের দলভূক্ত মনে করেন না। এ বিষয়টি কাদিয়ানী নয়-এমন লোকদের সম্পর্কে কাদিয়ানীদের ধারণা কি তা জানলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

অন্য ধর্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে কাদিয়ানীদের মত ও বিশ্বাস ঃ

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তার বিরুদ্ধবাদীদেরকে তার ভাষায় অমুসলিম, কাফের, জাহান্নামী বলে সাব্যস্ত করেছেন। মির্জা সাহেব বলেছেন, "নিঃসন্দেহে আমার শত্রুরা অরণ্যের বানরে পরিণত হয়েছে এবং তাদের স্ত্রীরা কুকুরীর চেয়েও বেশী সীমাতিক্রম করেছে।[১]

তিনি আরও বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার বিরোধী সে খৃষ্টান, ইয়াহুদী, মুশরিক এবং জাহান্নামী।[২]

তিনি আরও বলেছেন, "সমগ্র মুসলমান যারা মাসীহে মাওউদের নিকট বয়াত করেনি, যদি কেউ মাসীহে মাওউদের নাম নাও শুনে থাকে, তবু তারা সকলেই কাফের ও ইসলামের গন্ডি বহির্ভূত।[৩]

কাদিয়ানীর দ্বিতীয় পুত্র মির্জা বশীর আহমদ এম, এ-এর বক্তব্য হচ্ছে, "যে লোক মূসা নবীকে মানে কিন্তু ঈসা নবীকে মানে না, অথবা ঈসা নবীকে মানে কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে মানে না, অথবা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে মানে মাসীহে মাওউদকে মানে না সে যে শুধু কাফের তা নয় বরং কট্টর কাফের ও ইসলামের গন্ডি বহির্ভূত।"[৪]

কাদিয়ানীদের অপর দল লাহোরী কাদিয়ানীদের নেতা মোহাম্মাদ আলী লিখেছেন ঃ "আহমদী আন্দোলন (কাদিয়ানী ধর্মমত) এর সাথে ইসলামের সম্পর্ক অনুরূপই যেরূপ খৃষ্টানদের সাথে ইয়াহুদী মতবাদের সম্পর্ক রয়েছে।[৫]

উপরোক্ত বক্তব্যসমূহ থেকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াহুদী ধর্ম, খৃষ্টধর্ম ও ইসলাম যেমন পৃথক পৃথক ধর্ম, তেমনি কাদিয়ানী ধর্মমতও একটি পৃথক ধর্ম। স্বয়ং কাদিয়ানীদের উভয় দলের স্বীকৃতিও অনুরূপ। বস্তুতঃ কাদিয়ানী ধর্মমত ইসলাম হতে সম্পূর্ণ একটি পৃথক ধর্মমত। ইসলামপন্থীরা কোনক্রমেই কাদিয়ানীদেরকে মুসলিম জাতির অন্তর্ভুক্ত মনে করতে পারে না।

১.- ختم نبوت . از نجم الهدى صفحه/١٠ و در ثمين صفحه/٢٩٤ ॥

٢. ختم نبوت . از نزول المسيح صفحه/٤ وتبليغ رسالت جـ/٩ صفحه/٢٧و تذكره صفحه/٢٢٧ - ॥

٣. آئينه صداقت صفحه/٣٥ ॥

٤. قاديانى مذهب (جديد ايڈيشن. جنورى ٢٠٠١م). الياس برنى. از كلمة الفصل مصنفه بشير احمد صاحب قاديانى. مندرجه رساله ريويو آف ريلجيز. صفحه/١١٠ نمبر ٣ جلد ١٤- ॥

৫. কাদিয়ানী ধর্মমত, ৯৬ পৃঃ, বরাত - মুবাহাসা রাওয়াল পিন্ডি ২৪০ পৃঃ কাদিয়ান হতে প্রকাশিত ও তাবলীগে আক্বায়েদ ১২ পৃঃ মোহাম্মদ ইসমাঈল কাদিয়ানী কর্তৃক রচিত ॥

খতমে নবুওয়াত প্রসঙ্গ

"খতমে নবুওয়াত"-এর অর্থ রাসূল হযরত মুহাম্মাদ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ (সাঃ) শেষ নবী। তাঁর মাধ্যমে নবুওয়াত-এর সিলসিলার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তাঁর পর কোন মানুষের কাছে ওহী আগমন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। তাঁরপর আর কেউ নবী হিসেবে দুনিয়ায় আসবেন না।

নবুওয়াত-এর ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রকারভেদ নেই। "বুরূজী নবী" বা যিল্লী নবী বা ছায়া নবী, "শরী'আত বিশিষ্ট নবী" বা "শরী'আত বিহীন নবী" অথবা "উম্মতী নবী" ইত্যাদি ধরনের কোন প্রকারভেদ নবুওয়াত-এর ক্ষেত্রে নেই। নবুওয়াত-এর ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রকারভেদ কুরআন, হাদীছ ও তাফসীরের কিতাবে কোথাও পাওয়া যায় না। উম্মতের কেউ নবুওয়াত-এর ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রকারভেদ আছে বলেও বর্ণনা করেননি। রাসূল (সাঃ)-এর পর আর কোন নবী নেই অর্থ এ জাতীয় কোন প্রকার নবী নেই।

"খতমে নবুওয়াত"-এর এই আকীদা ইসলামের একটি মৌলিক আকীদা। কুরআন, হাদীছ, ইজ্‌মায়ে উম্মত এবং কিয়াস বা যুক্তি সব রকম দলীলাদি দ্বারা এই "খতমে নবুওয়াত"-এর বিষয়টি সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। খতমে নবুওয়াত-এর বিষয়টি অস্বীকার কারী উম্মতের সর্বসম্মত মতে কাফের। রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পর থেকে আজ প্রায় চৌদ্দশ বৎসরাধিক কাল যাবত উম্মতের সাধারণ ও বিশেষ, শিক্ষিত ও মূর্খ, শহুরে ও গ্রাম্য নির্বিশেষে সকল স্তরের মুসলমান এ আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

নিম্নে "খতমে নবুওয়াত"-এর পক্ষে কুরআন, হাদীছ, ইজ্‌মা ও যুক্তি ভিত্তিক সব ধরনের দলীলাদি থেকে কয়েকটি করে পেশ করা হল।

কুরআন থেকে দলীল ঃ

"খতমে নবুওয়াত"-এর পক্ষে প্রায় শতাধিক আয়াত রয়েছে।[১] তন্মধ্যে বিশেষ কয়েকটি আয়াত নিম্নে প্রদান করা হল।

(١) ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين -

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ তোমাদের কারও পিতা নন, তবে সে আল্লাহ্‌র রাসূল ও খাতামুন্নাবী (শেষ নবী)। (সূরাঃ ৩৩-আহ্‌যাবঃ ৪০)

(٢) اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا -

অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করলাম আর দ্বীন হিসেবে তোমাদের জন্য ইসলামকে মনোনীত করলাম। (সূরাঃ ৫-মায়িদাঃ ৩)

---

১. মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহঃ) তার "খতমে নবুওয়াত" গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে এসব আয়াত পেশ করেছেন ॥

(٣) واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جائكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه -

অর্থাৎ, আর স্মরণ কর যখন আল্লাহ নবীদের থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, যখন তোমাদেরকে আমি কিতাব ও হেকমত দান করব, অনন্তর তোমাদের নিকট আগমন করবে সেই রাসূল যে তোমাদের নিকটস্ত কিতাবের সত্যায়নকারী হবে, তখন অবশ্যই তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর সহযোগিতা করবে। (সূরাঃ- ৩-আলু ইমরানঃ ৮১)

(٤) قل يايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك السموت والارض-

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও হে মানুষেরা ! অবশ্যই আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহ্‌র রাসূল যার অধিকারে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব। (সূরাঃ ৭-আ'রাফঃ ১৫৮)

(٥) تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نذيرا -

অর্থাৎ, মহান ঐ সত্তা, যিনি তাঁর বান্দার উপর নাযিল করেছেন ফুরকান (কুরআন) যাতে সে জগৎবাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারে। (সূরাঃ ২৫-ফুরকানঃ ১)

(٦) واوحى الى هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ -

অর্থাৎ, আমার নিকট ওহী যোগে প্রেরণ করা হয়েছে এই কুরআন যেন তার দ্বারা সতর্ক করি তোমাদেরকে এবং ঐ সব লোকদেরকে যাদের নিকট তা পৌছবে। (সূরাঃ ৬-আন্‌আমঃ ১৯)

(٧) وما ارسلناك الا رحمة للعلمين -

অর্থাৎ, আমি তোমাকে জগৎবাসীর জন্য রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি। (সূরাঃ ২১- আম্বিয়াঃ ১০৭)

(٨) وارسلناك للناس رسولا -

অর্থাৎ, আমি তোমাকে সমস্ত মানুষের জন্য রাসূল রূপে প্রেরণ করেছি। (সুরাঃ ৪-নিসাঃ ৭৯)

(٩) ان هو الا ذكر للعلمين -

অর্থাৎ, এ তো শুধু বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ। (সূরা ঃ ৮১-তাকবীর ঃ ২৭)

(١٠) ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده -

অর্থাৎ, আর অন্যান্য দলের যারা একে (কুরআনকে) অস্বীকার করে অগ্নিই তাদের প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরাঃ ১১-হুদঃ ১৭)

হাদীছ থেকে দলীল ঃ

"খতমে নবুওয়াত"-এর পক্ষে প্রায় দুই শতাধিক হাদীছ রয়েছে।[১] তন্মধ্যে বিশেষ কয়েকটি হাদীছ নিম্নে প্রদান করা হল।

১. মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহঃ) তার "খতমে নবুওয়াত" গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে এসব হাদীছ পেশ করেছেন ॥

(١) عن ابى هريرةؓ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان مثلى ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا مواضع لبنة من زاويه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون به ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة وانا خاتم النبيين - (بخارى ومسلم)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত- রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের উদাহরণ হল ঐ ব্যক্তির মত, যে একটা গৃহ নির্মাণ করে আর ঐ গৃহের সবকিছুই সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করে, শুধু এক কোণে একটা ইটের স্থান খালি রাখে। মানুষ ঐ গৃহের চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে দেখে তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয় আর বলতে থাকে এই ইটটা কেন স্থাপন করা হল না? আর আমি হলাম খাতামুন্নাবী।

(٢) عن ابى سعيد الخدرىؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثلى ومثل النبيين كمثل رجل بنى دارا فاتمها الا لبنة واحدة فجئت انا فاتممت تلك اللبنة - (مسلم و احمد)

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) থেকে বর্ণিত- রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের উদাহরণ হল ঐ ব্যক্তির মত যে একটা গৃহ নির্মাণ করে আর একটা ইটের স্থান ব্যতীত ঐ গৃহের সবকিছুই পূর্ণ করে। অতঃপর আমি আগমন করি এবং ঐ ইটের স্থান পূর্ণ করি।

(٣) عن ابى حازم قال قاعدت ابا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء ، كلما هلك نبى خلفه نبى وانه لا نبى بعدى وسيكون خلفاء فيكثرون . الحديث - (بخارى ومسلم)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত- রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ নবীগণ বনী ইসরাঈলের নেতৃত্ব প্রদান করতেন। কোন এক নবী প্রস্থান করলে পরবর্তিতে অন্য নবী আগমন করতেন। আর আমার পরে অন্য কোন নবী নেই। অচিরেই আমার খলীফা হবে এবং সংখ্যায় তারা প্রচুর হবে।

(٤) عن جبير بن مطعم ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : انا محمد انا احمد وانا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر وانا الحاشر الذى يحشر الناس على عقبى وانا العاقب والعاقب الذى ليس بعده نبى - (بخارى ومسلم)

অর্থাৎ, হযরত জুবায়র ইব্‌নে মুত্‌ইম (রাঃ) থেকে বর্ণিত- নবী (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ আমি মুহাম্মাদ, আমি আহ্‌মদ, আমি মাহী (মোচনকারী), আমার মাধ্যমে আল্লাহ কুফ্‌রকে মোচন করবেন। আমি হাশির (সমবেতকারী), আমার পরে সকলকে সমবেত করা হবে। আর আমি আকিব (পরে আগমনকারী) যার পরে আর কোন নবী নেই।

(٥) عن ابى هريرةؓ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ..... لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم انه رسول الله - (بخارى مسلم واحمد)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত- নবী (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ কেয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ মিথ্যুক প্রতারকদের আবির্ভাব না হবে; যাদের সংখ্যা ত্রিশের কাছাকাছি। যাদের প্রত্যেকে দাবী করবে যে, সে আল্লাহ্‌র রাসূল।

(٦) عن ابى هريرةؓ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لى الغنائم وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا وارسلت الى الخلق كافة وختم بى النبيون - (مسلم)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত- রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ আমাকে অন্যান্য নবীর উপর ছয়টি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে - আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক স্বল্পভাষা দান করা হয়েছে, আমাকে প্রভাব (رعب) দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, আমার জন্য গনীমতকে হালাল করা হয়েছে, আমার জন্য সমগ্র ভূমিকে সাজদার স্থান ও পবিত্র বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সমগ্র মাখলূকের জন্য রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে - আমার মাধ্যমে নবীদের আগমনের সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে।

(٧) عن ثوبانؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انه سيكون فى امتى كذابون ثلثون كلهم يزعم انه نبى وانا خاتم النبيين لا نبى بعدى - (مسلم)

অর্থাৎ, হযরত ছওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত- রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যুক প্রতারকের আবির্ভাব হবে, যাদের প্রত্যেকে মনে করবে যে, সে নবী, অথচ আমি খাতামুন্নাবী - আমার পরে আর কোন নবী নেই।

(٨) عن ابى هريرةؓ فى حديث الشفاعة فيقول لهم عيسى اذهبوا الى غيرى الى محمد صلى الله عليه وسلم فياتوا فيقولون يا محمد ﷺ انت رسول الله وخاتم النبيين - (بخارى ومسلم)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে শাফা'আত সম্পর্কিত হাদীছে বর্ণিত- অতঃপর ঈসা (আঃ) তাদেরকে বলবেন তোমরা অন্যের কাছে যাও- তোমরা মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর কাছে যাও। তখন তারা মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর কাছে এসে বলবে হে মুহাম্মাদ ! আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং খাতামুন্নাবী (শেষ নবী) ....।

বিরোধী উলামাকে ওয়াহ্‌হাবী বলে আখ্যায়িত করার একটা অপপ্রয়াস এই উপমহাদেশে পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। যদিও বিদআত ও কুসংস্কার বিরোধী এই উলামা হযরাত আরব দেশীয় ওয়াহ্‌হাবীদের সাথে কোনভাবেই জাড়িত নন এবং তাদের বাড়াবাড়ি ও জমহুর উম্মত থেকে বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারা পোষণের সাথেও আদৌ একমত নন। নাচ-গান ও মদ পন্থী বেশরা লোকেরাও সুন্নী লোকদেরকে ওহাবী বলে গালী দিত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ذخيرة كرامت- গ্রন্থের বর্ণনা মতে হিন্দুস্তানের এক শহরে ওহাবী অভিযোগে গ্রেফতার হওয়ার পর তার সম্পর্কে আর একজন তাড়ী পান করতে দেখেছে বলে সাক্ষী দেয়ার পর তাকে ওহাবী অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার কথা এবং অন্য একজনের ব্যাপারে তাকে নাচ দেখতে দেখা গেছে সাক্ষী দেয়ার পর তাকে ওহাবী অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

ওয়াহ্‌হাবী বা সালাফিগণ জমহুরে উম্মতের চিন্তাধারা থেকে বিচ্ছিন্ন যে সব চিন্তাধারা পোষণ করেন তার মধ্যে বিশেষ কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

ওয়াহ্‌হাবী বা সালাফীগণ প্রধানতঃ ৬ টি বিষয়ে জমহুরে উম্মতের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন।

১. তাক্‌লীদ প্রসঙ্গ
২. তাসাওউফ প্রসঙ্গ
৩. দু'আর মধ্যে ওসীলা প্রসঙ্গ
৪. তাবীজ-কবচ প্রসঙ্গ
৫. تبرك بالمكان বা বুযুর্গানে দ্বীন ও অলী-আউলিয়াদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান থেকে বরকত লাভ প্রসঙ্গ
৬. রওযায়ে আতহার যিয়ারতে যাওয়ার নিয়ত প্রসঙ্গ

এ ৬ টি বিষয়ের মধ্যে পূর্বে তাক্‌লীদ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। তাসাওউফ প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা হবে। অবশিষ্ট চারটি বিষয়ের প্রত্যেকটা সম্বন্ধে নিম্নে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা পেশ করা হল।

দুআর মধ্যে ওসীলা প্রসঙ্গ

দুআর মধ্যে ওসীলা কয়েক ধরনের হতে পারে। যথা ঃ

১. কোন নেক আমলের ওসীলা দিয়ে দুআ করা। চাই নিজের আমলের দ্বারা হোক, অথবা অন্যের আমলের দ্বারা। অর্থাৎ, দুআর মধ্যে এভাবে বলা যে, হে আল্লাহ! আমার অথবা অন্যের অমুক নেক আমল, যে আমলকে আপনি পছন্দ করেন, তার ওসীলায় আমার দুআকে কবূল করুন।
২. কোন জীবিত নেককার মকবূল বান্দার (নবী হোক বা ওলী) ওসীলা দিয়ে দু'আ করা যে, হে আল্লাহ! অমুক মকবূল বান্দার ওসীলায় অর্থাৎ, তাঁর উপর তোমার যে রহমত রয়েছে তার ওসীলায় দু'আ করি।
৩. কোন মৃত নেককার মকবূল বান্দার (নবী হোক বা ওলী) ওসীলা দিয়ে দুআ করা।

প্রথম দুই প্রকার ওসীলা জায়েয বরং মুস্তাহাব- তা নিয়ে কোন মতবিরোধ নেই। নেক আমলের ওসীলা দিয়ে দু'আ করা জায়েয এ বিষয়ে দলীল হল প্রসিদ্ধ ঐ হাদীছ, যাতে তিন ব্যক্তির এক গুহায় আটক হওয়া এবং তিন জনের বিশেষ তিনটি নেক আমলের ওসীলা দিয়ে দু'আ করার পর দু'আ কবূল হওয়া এবং গুহার মুখ থেকে পাথর সরে যাওয়ার কথা বর্ণিত আছে। (হাদীছটি মুসলিম শরীফ ২য় খণ্ডের كتاب العلم অধ্যায়ের শেষ باب-এ হযরত ইব্‌নে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।)

দ্বিতীয় প্রকার ওসীলা-এর দলীল ঃ

(এক) এক অন্ধ ব্যক্তিকে রাসূল (সাঃ) নিজে তাঁর ওসীলা দিয়ে দুআ করতে শিক্ষা দেন এবং সেভাবে দু'আ করায় তার চোখ ভাল হয়ে যায়। হাদীছটি নাসায়ী, তিরমীযী ও ইব্‌নে মাজায় সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। হাদীছটি এই ঃ

عن عثمان بن حنيف ان رجلا ضريرا اتى النبى ﷺ ، فقال ادع الله ان يعافينى ، فقال : ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خير لک - قال فادعه ، قال فامره ان يتوضأ فيحسن الوضوء . ويدعو بهذا الدعاء اللهم انى اسألک واتوجه اليک بنبيک محمد نبى الرحمة انى توجهت بک الى ربى ليقضى لى فى حاجتى هذه . اللهم فشفعه فى - (مشكوة) قال فى انجاح الحاجة والحديث اخرجه النسائى والترمذى فى الدعوات مع اختلاف يسير وقال الترمذى حسن صحيح وصححه البيهقى وزاد وقد ابصر وفى رواية ففعل الرجل فبرى -

(দুই) বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে হযরত ওমর (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর চাচা আব্বাস (রাঃ)-এর ওসীলা দিয়ে বৃষ্টি কামনা করেছিলেন এবং এটা ছিল আব্বাস (রাঃ)-এর জীবিত থাকাকালীন সময়ে।

عن انس ان عمر بن الخطاب كان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليک بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليک بعم نبينا فاسقنا فيسقوا - (مشكوة)

গায়রে মুকাল্লিদদের ইমাম শাওকানী (রহঃ) উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন-

ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع باهل الخير والصلاح واهل بيت النبوة (نيل الاوطار ص ٩ جه/ ٤ وكذا فى عمدة القارى ص ٤٣٧ جـ/ ٣ وفتح البارى ص ٣٧٧ جـ/ ٢)

অর্থাৎ, হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর ঘটনা দ্বারা বোঝা যায়, নবী পরিবার ও নেককার বুযুর্গদের ওসীলায় সুপারিশ অন্বেষণ করা মুস্তাহাব।

তৃতীয় প্রকার ওসীলা জায়েয কি-না এ বিষয়েও কোন মতবিরোধ ছিল না। সর্বপ্রথম ইব্‌নে তাইমিয়া (রহঃ) এ বিষয়ে মতবিরোধের সূচনা করেন। তিনি মৃত এবং জীবিতদের ওসীলার মধ্যে পার্থক্য করেন এবং বলেন জীবিত নবী বা ওলীর ওসীলা প্রদান জায়েয, তবে মৃত নবী বা ওলীর ওসীলা প্রদান জায়েয নয়। ইব্‌নে তাইমিয়া (রহঃ)-এর পূর্বে ওসীলার ক্ষেত্রে জীবিত ও মৃতদের মাঝে পার্থক্য করার এই নীতি উম্মতের কেউ গ্রহণ করেননি। তিনিই সর্বপ্রথম এ বিষয়ে ভিন্ন মত সৃষ্টি করে উম্মতের মাঝে বিভেদের সূচনা করেন। এবং বর্তমানে ইব্‌নে তাইমিয়ার ভক্ত সালাফিয়া ও গায়রে মুকাল্লিদগণ এ মতটির সপক্ষে প্রচার করছেন এবং এরূপ ওসীলা জায়েয হওয়ার প্রবক্তা জমহুরে উম্মতকে এ কারণে মুশরিকদের পর্যায়ভুক্ত সাব্যস্ত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন। তারা বলতে চান ওসীলা জায়েয হওয়া সম্পর্কিত উক্ত রেওয়ায়েত সমূহ জীবিতদের দ্বারা ওসীলা গ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মৃতদের দ্বারা ওসীলা গ্রহণ করা হয়েছে-এমন কোন স্পষ্ট রেওয়ায়েত পাওয়া যায় না এবং মৃতদের দ্বারা ওসীলা জায়েয হওয়ার কোন দলীল নেই। অথচ তাদের বক্তব্য অজ্ঞতার পরিচায়ক। কারণ এ ব্যাপারে জমহুরে উম্মতের কুরআন, হাদীছ ও কিয়াস - এই তিন ধরনের দলীল রয়েছে। যথা ঃ

মৃতদের দ্বারা ওসীলা জায়েয হওয়ার দলীল

কুরআন থেকে দলীল ঃ

ولما جائهم كتب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا . الاية -

অর্থাৎ, আর যখন তাদের কাছে আসল তাদের নিকটস্ত কিতাবের সত্যায়নকারী কিতাব, (তারা তা প্রত্যাখ্যান করল) যদিও তারা পূর্বে কাফেরদের বিরুদ্ধে এর সাহায্যে বিজয় কামনা করত। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ৮৯)

এ আয়াতে হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবীরূপে প্রেরণ করার পূর্বে ইয়াহূদীরা তাঁর ওসীলায় মুশরিকদের বিরুদ্ধে সফলতা ও সাহায্য লাভের দু'আ করতো বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলাম এ পদ্ধতিকে অস্বীকার করেনি। যার দ্বারা বোঝা যায় রাসূল (সাঃ)-এর ওসীলায় দু'আ করার বিষয়টি শুধু তাঁর জীবদ্দশার সাথেই খাস নয়।

হাদীছ থেকে দলীল ঃ

وفى مجمع الزوائد جـ/٢ صفحـ/٢٧٩ عن عثمان بن حنيف ان رجلا كان يختلف على عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه فى حاجة له فكان لا يلتفت اليه ولا ينظر فى

حاجته فلقى عثمان بن حنيف فشكا ذلك اليه فقال له عثمان بن حنيف ائت الميضاة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل اللهم انى اسألك واتوجه اليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبى الرحمة يا محمد انى اتوجه بك الى ربى فيقضى لى حاجتى وتذكر حاجتك ورح الى حين اروح معك فانطلق الرجل فصنع ما قال له ثم اتى باب عثمان فجاء البواب حتى اخذ بيده فادخله على عثمان بن عفان فاجلسه معه على الطنفسة وقال حاجتك ؟ فذكر حاجته فقضاها له ثم قال له ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة وقال ما كانت لك من حاجة فائتنا ثم ان الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا ما كان ينظر فى حاجتى ولا يلتفت الى حتى كلمته فىّ فقال عثمان بن حنيف والله ما كلمته ولكن شهدت رسول الله ﷺ واتاه رجل ضرير فشكا اليه ذهاب بصره فقال له النبى ﷺ او تصبر فقال يا رسول الله انه ليس لى قائد وقد شق على فقال له النبى ﷺ : ائت الميضاة و توضأ ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه الكلمات - فقال عثمان بن حنيف فوالله ما تفرقنا و طال بنا الحديث حتى دخل عليه الرجل فكان لم يكن به ضرر قط - قلت روى الترمذى وابن ماجة طرفا من اخره خاليا عن القصة وقد قال الطبرانى عقبه : والحديث صحيح بعد ذكر طرقه التى روى بها - وقال صاحب انجاح الحاجة : رواه البيهقى من طريقين نحوه واخرج الطبرانى فى الكبير والمتوسط بسند فيه روح بن سلام وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح - .

এ হাদীছে রাসূল (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর সাহাবী হযরত উছমান ইব্‌নে হানীফ (রাঃ)-এর শেখানো মোতাবেক জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর ওসীলা দিয়ে দু'আ করায় তাঁর দু'আ কবূল হওয়ার কথা স্পষ্টতঃ বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য এই হযরত উছমান ইব্‌নে হানীফ সেই সাহাবী যার সামনে রাসূল (সাঃ) জনৈক অন্ধকে রাসূল (সাঃ)-এর ওসীলা দিয়ে দু'আ করার কথা শিক্ষা দিয়েছিলেন। হযরত উছমান ইব্‌নে হানীফ (রাঃ) তা থেকে বুঝেছিলেন যে, রাসূল (সাঃ)-এর ওসীলায় দুআ করার বিষয়টি শুধু রাসূল (সাঃ)-এর জীবদ্দশার সাথেই খাস নয়। তাই রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর তিনি হাদীছে উল্লেখিত ব্যক্তিকে অনুরূপ রাসূল (সাঃ)-এর ওসীলা দিয়ে দু'আ করার শিক্ষা দিলেন।

কিয়াস থেকে দলীল ঃ

মৃতদের দ্বারা ওসীলা গ্রহণকে জীবিতদের দ্বারা ওসীলা গ্রহণের উপর কিয়াস করা যায়। বস্তুতঃ ওসীলা চাই জীবিতদের দ্বারাই হোক, অথবা মৃতদের দ্বারা, সত্তার দ্বারা হোক, অথবা আমলের দ্বারা; নিজের আমলের দ্বারা হোক, অথবা অন্যের আমলের দ্বারা সর্বাবস্থায়

এর হাকীকত এক। সবগুলো পদ্ধতিগুলোর মূলকথা হল আল্লাহ তা'আলার রহমতের ওসীলা ধারণ করা। এভাবে যে, অমুক মাকবূল বান্দার উপর যে রহমত রয়েছে তার ওসীলায় দু'আ করি। এ ক্ষেত্রে মৃত ও জীবিতদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকার কথা নয়।

সালাফীগণ রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর ওসীলা অবলম্বন থেকে বলছেন যে, ওসীলা জীবিতদের সাথে খাস বা বিশেষিত। নতুবা হযরত ওমর (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর ওসীলা বাদ দিয়ে আব্বাস (রাঃ)-এর ওসীলা দিতে গেলেন কেন? কিন্তু হাদীছ দ্বারা যখন জীবিত মৃত উভয় দ্বারা ওসীলা ধারণ করা বৈধ সাব্যস্ত হল, তখন এই যুক্তির বৈধতা কোথায় ?

তবে হ্যাঁ এই প্রশ্ন অবশিষ্ট রয়ে গেল যে, হযরত ওমর (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর পরিবর্তে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর দ্বারা কেন ওসীলা গ্রহণ করলেন ? এর কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে। যথা ঃ[১]

১. হযরত আব্বাস (রাঃ) দ্বারা ওসীলা ধারণ করার সাথে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর দু'আও উদ্দেশ্য ছিল।
২. এ ব্যাপারে মনোযোগ আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য ছিল যে, রাসূল (সাঃ)-এর ওসীলা ধারণ করার দুটি পদ্ধতি। প্রথমতঃ তাঁর সত্তার ওসীলা ধারণ করা, দ্বিতীয়তঃ তাঁর নিকটাত্মীয়ের ওসীলা ধারণ করা।
৩. এটা বোঝানো উদ্দেশ্য ছিল যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম ছাড়া আউলিয়া এবং নেক্‌কারদেরকেও ওসীলা বানিয়ে দু'আ করা যায়, তাঁদের ওসীলাও বরকতের কারণ ও রহমত আকর্ষক।
৪. মানুষের মাঝে এই স্বভাব বিদ্যমান যে, যাকে দেখা যায় এবং অনুভব করা যায়, তার উপরই তাদের মনের প্রশান্তি বেশী হয়। এ কারণেই রাসুল (সাঃ)-এর খেদমতে সালাম প্রেরণ এবং দু'আর দরখাস্ত পৌছানোর ক্ষেত্রেও মানুষের মাধ্যমের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। অথচ ফেরেশতাদের মাধ্যমে সালাম পৌছান হলে তা নেহায়েত দ্রুত হয়, সাথে সাথে এ মাধ্যমটি শক্তিশালীও। তাদের কাছে সালাম পৌছানোর আমানত রাখা হলে না তাদের দ্বারা সেই আমানত আদায়ের ব্যাপারে উদাসীনতার আশংকা আছে না তাদের ভুলে যাওয়ার কোন ভয় আছে। এতদসত্ত্বেও মানুষের মাধ্যমে সালাম পৌছানোর বিষয়টাতে বেশী মনের প্রশান্তি হয়, কেননা দেখা এবং অনুভব হলে বেশী প্রশান্তি হয়ে থাকে।

সালাফী এবং গায়রে মুকাল্লিদগণ এরপরও যদি জীবিত এবং মৃতদের মাঝে পার্থক্য করতে চান, তাহলে আমরা বলব যদি জীবিত এবং মৃতদের মাঝে কিছু পার্থক্য করতেই হয় তাহলে মৃতদের ওসীলা গ্রহণের বিষয়টি বেশী গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। কারণ, জীবিত মানুষ অবস্থার পরিবর্তন থেকে নিরাপদ নয়। এ জন্য হাদীছ শরীফে আছে, যদি কারো অনুসরণ করতে চাও তাহলে মৃতদের অনুসরণ কর। হযরত ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

---

১. احسن الفتاوى جـ١/ থেকে গৃহীত ॥

عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه (قال) من كان مستنا فليستن بمن قد مات فان الحى لاتؤمن عليه الفتنة. الحديث - رواه رزين (مشكوة)

অর্থাৎ, কেউ যদি কারো আদর্শ অনুসরণ করতে চায়, তাহলে সে যেন মৃতদের আদর্শের অনুসরণ করে। কারণ, জীবিত ব্যক্তি ফিতনা থেকে নিরাপদ নয়।

সারকথা - নেক আমল দ্বারা এবং জীবিতদের দ্বারা ওসীলা গ্রহণের মত মৃতদের দ্বারাও ওসীলা গ্রহণ কুরআন, হাদীছ ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত। এমনকি বলা যায় সাহাবীদের ঐক্যমত দ্বারা জীবিতদের ওসীলা ধারণ করা মুস্তাহাব বলে প্রমাণিত। কারণ উছমান ইব্‌নে হানীফের আমলের ব্যাপারে কোন সাহাবীর বিরোধিতা (نكير) বর্ণিত হয়নি। অতএব মৃত নেককার ওলী আউলিয়া এবং নবীগণের ওসীলা ধারণ করা উত্তমরূপে মুস্তাহাব হবে।

ঝাড়-ফুঁক ও তাবীজ-কবচ প্রসঙ্গ

এখানে দুটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছেঃ

১. ঝাড়-ফুঁকের বিষয় ঃ

কুরআনের আয়াত, আল্লাহ্‌র নাম ও দু'আয়ে মাছূরা (যে সব দু'আ হাদীছে বর্ণিত আছে) দ্বারা ঝাড় ফুঁক করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। বহু সহীহ হাদীছে রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম ঝাড় ফুঁক করতেন তার প্রমাণ রয়েছে।

وهي جائزه بالقران والاسماء الالهية وما فى معنا ها بالاتفاق - (اللمعات)

অর্থাৎ, ঝাড়-ফুঁক কুরআন, আল্লাহ্‌র আসমায়ে হুছনা ও অনুরূপ অর্থ বিশিষ্ট কিছু দিয়ে জায়েয। (লূমআত)

তবে পাঁচ ধরনের ঝাড়-ফুঁক জয়েয নয়।

(এক) যে কালামের অর্থ জানা যায় না (অবোধগম্য ভাষা) তার দ্বারা।

(দুই) আরবী ছাড়া অন্য ভাষায়।

(তিন) কুরআনের আয়াত, আল্লাহর নাম ও সিফাত এবং দু'আয়ে মাছূরা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা।

(চার) শির্‌ক যুক্ত কালাম দ্বারা।

(পাঁচ) ঝাড়-ফুঁকের মধ্যে নিজস্ব ক্ষমতা আছে (موثر بالذات) মনে করে তার উপর ভরসা করলে।

যে সব হাদীছে ঝাড়-ফুঁককে নিষেধ করা হয়েছে বা ঝাড়-ফুঁককে শির্‌ক বলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য এই পাঁচ ধরনের ঝাড় -ফুঁক, সব ধরনের ঝাড়-ফুঁক নয়। যেমন আবূ দাঊদ শরীফে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছেঃ

ان الرقى والتمائم والتولة شرك -

অর্থাৎ, ঝাড়-ফুঁক ও তাবীজ শির্‌ক।

২. তাবিজ-কবচের বিষয়ঃ

বর্তমান যুগের গায়রে মুকাল্লিদ ও সালাফীগণ তাবীজ কবচকে নিষিদ্ধ এমনকি শির্‌ক বলে আখ্যায়িত করেন। পক্ষান্তরে অন্য সকলের নিকট তাবীজ-কবচ ও ঝাঁড়-ফুঁকের হুকুম একই রকম। যে ধরনের কালাম দ্বারা ঝাড়-ফুঁক জায়েয নয়, সেগুলো লিখে তাবীজ-কবচ ব্যবহার করাও জায়েয নয়। পক্ষান্তরে যে ধরনের কালাম দ্বারা ঝাড়-ফুঁক জায়েয সে ধরনের কালাম বা তার নকশা[১] দ্বারা তাবীজও জায়েয। সব শ্রেণীর উলামায়ে কেরাম এ ধরনের তাবীজ-কবচকে জায়েয বলেছেন। এমনকি সালাফীগণ পদে পদে যার তাক্‌লীদ করেন সেই ইব্‌নে তাইমিয়া (রহঃ)ও বলেছেনঃ

ويجوز ان يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئا من كتاب الله وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى - (فتاوى ابن تيميه ج/١٩ صفحه/ ٦٤)

অর্থাৎ, অসুস্থ প্রমুখ বিপদগ্রস্ত লোকদের জন্য কালি দ্বারা আল্লাহ্‌র কিতাব, আল্লাহ্‌র যিক্‌র লিখে দেয়া এবং ধুয়ে পান করানো জায়েয।

গায়রে মুকাল্লিদগণ যে আল্লামা শাওকানীকে ইমাম হিসেবে মান্য করেন, তিনিও বলেছেনঃ সমস্ত ফকীহের নিকট এ ধরনের তাবীজ জায়েয।[২]

তাবীজ জায়েয হওয়ার পক্ষে জমহুরের দলীলঃ

(১) اخرج ابن ابى شيبه في مصنفه عن عمروبن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله ﷺ : اذا فزع احدكم فى نومه فليقل بسم الله اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وسوء عقابه ومن شر عباده ومن شر الشياطين وان يحضرون فكان عبد الله (يعنى بن عمروؓ) يعلمها ولده من ادرك منهم ومن لم يدرك كتبها وعلقها عليه -

এ হাদীছে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আমর ইব্‌নুল আস (রাঃ) কর্তৃক তার অবুঝ বাচ্চাদের জন্য তাবীজ লিখে দেয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে।

(২) واخرج ابو داؤد فى سننه ايضا عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله ﷺ كان يعلمهم من الفزع كلمات اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون - وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه - (اخرجه ابو داؤد فى الطب - باب كيف الرقى ؟)

---

১. ابجد-এর হিসেবে তাবীজ লেখাও জায়েয। এটাও এক ধরনের বোধগম্য ভাষা। (احسن الفتوى)

২. نيل الاوطار ॥ (ج/٨)

এ হাদীছেও হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আমর ইব্‌নুল আস (রাঃ) কর্তৃক তার অবুঝ বাচ্চাদের জন্য তাবীজ লিখে দেয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে।

(৩) واخرج ابن ابى شيبة ايضاعن مجاهد انه كان يكتب الناس التعويذ فيعلقه عليهم ـ واخرج عن ابى جعفر ومحمد بن سيرين وعبيد الله بن عبد الله بن عمر و الضحاك ما يدل على انهم كانوا يبيحون كتابة التعويذ وتعليقه او ربطه بالعضد ونحوه ـ

এ রেওয়ায়েতে হযরত মুজাহিদ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌নে সীরীন (রহঃ) প্রমুখ কর্তৃক অন্যদেরকে তাবীজ লিখে দেয়ার কথা, তাবীজ হাতে বা গলায় বাঁধা ও তাবীজ লেখা বৈধ হওয়ার মর্মে তাদের মন্তব্য বর্ণিত হয়েছে।

(৪) قال عبد الله بن احمد قرأت على ابى ثنا يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن محمد بن ابى ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اذا عسر على المراة ولا دتها فليكتب بسم الله لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفسقون ـ

এ রেওয়ায়েতে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বাচ্চা প্রসবের সময় প্রসূতীর প্রসব বেদনা লাঘব করা ও সহজে প্রসব হওয়ার জন্য বিশেষ তাবীজ শিক্ষা দেয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। এ রেওয়ায়েতটি সালাফী ও গায়রে মুকাল্লিদগণের সর্বজনমান্য ব্যক্তিত্ব ইব্‌নে তাইমিয়া (রহঃ) তাঁর ফাতাওয়াতে উল্লেখ করেছেন।[১]

সালাফী ও গায়রে মুকাল্লিদগণের দলীল ও তার জওয়াব

দলীল ঃ

সালাফীগণ তা'বীজ-কবচ নাজায়েয হওয়া সম্পর্কে পুস্তক-পুস্তিকাও প্রকাশ করেছেন। তন্মধ্যে একটি পুস্তিকা হল التمائم فى ميزان العقيدة . د. على بن نفيع العلياني অনুবাদ "আকীদার মানদণ্ডে তা'বীজ"। এর মধ্যে লেখক প্রধানতঃ যে দলীলগুলি পেশ করেছেন নিম্নে জওয়াবসহ সেগুলো তুলে ধরা হল ঃ

১. তাদের একটা দলীল হল কুরআনের ঐ সব আয়াত, যার মধ্যে দুঃখ কষ্ট ও বিপদ-আপদ দূর করাকে আল্লাহ্‌র শান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ

وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতীত কেউ তা হটানোর নেই। আর তিনি যদি তোমার মঙ্গল চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই। (সূরাঃ ১০-ইউনুসঃ ১০৭)

১. দ্র ঃ فتاوى ابن تيميه جـ/١٩ صفحـ/٦٤ ॥

জওয়াব ঃ

তাবীজ গ্রহণ করা এ আয়াতের পরিপন্থী হবে যদি তাবীজের মধ্যে নিজস্ব প্রভাব আছে বলে মনে করা হয় অর্থাৎ, এ বিশ্বাস করা হয় যে, তাবীজই সবকিছু করে। এরূপ মনে না করলে তাবীজ এ আয়াতের পরিপন্থী হবে না। নতুবা বলতে হবে বৈধ পদ্ধতিতে চিকিৎসা গ্রহণ করাও এ আয়াতের পরিপন্থী। এ আয়াত দ্বারা তাবীজ নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল দেয়া অনেকটা শিশু সুলভ ও ভাসা জ্ঞানের পরিচায়ক।

২. তাদের আরেকটা দলীল কুরআনের ঐ সব আয়াত ও হাদীছ যাতে আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। যেমনঃ

(১) وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌রই উপর তোমরা ভরসা কর যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক। (সূরাঃ ৫-মায়িদাঃ ২৩)

(২) و على الله فليتوكل المؤمنون ـ

অর্থাৎ, মু'মিনগণ যেন আল্লাহ্‌রই উপর ভরসা করে। (সূরাঃ ১৪-ইবরাহীমঃ ১১)

(৩) ومن تعلق شيئا وكل اليه ـ (رواه احمد وابن ماجه والحاكم)

অর্থাৎ, যে কোন কিছু লটকায়, তার দিকে তাকে অর্পন করা হয়।

জওয়াব ঃ

তাবীজ গ্রহণ করা এ আয়াতের পরিপন্থী হত যদি তাবীজ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাবীজের উপরই ভরসা করা হত। কিন্তু যদি ভরসা আল্লাহ্‌র উপর থাকে এবং তাবীজকে শুধু ওসীলা হিসেবে গ্রহণ করা হয় যেমনটি করা হয় ঔষধ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে, তাহলে আদৌ তা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী হবে না। নতুবা বলতে হবে বৈধ পদ্ধতিতে চিকিৎসা গ্রহণ করাও এ আয়াতের পরিপন্থী। এ জাতীয় আয়াত দ্বারাও তাবীজ নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল দেয়া অনেকটা শিশু সুলভ ও ভাসা জ্ঞানের পরিচায়ক।

৩. তাদের আরেকটা দলীল ঐ সব আয়াত, যাতে শিরকের নিন্দাবাদ করা হয়েছে। যেমনঃ

(১) ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ـ

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শির্‌ক করাকে ক্ষমা করবেন না। অন্য গোনাহ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। (সূরাঃ ৪-নিছাঃ ১১৬)

(২) ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوى به الريح فى مكان سحيق ـ

অর্থাৎ, যে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ে, অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করে। (সূরাঃ ২২-হজ্জঃ ৩১)

জওয়াবঃ

তাবীজের মধ্যে নিজস্ব প্রভাব আছে (অর্থাৎ, তাবীজ مؤثر بالذات -এরূপ) মনে করলেই শির্কের প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এরূপ মনে না করলে তাবীজ কেন শির্ক হবে তা কোনভাবেই বোধগম্য নয়। অথচ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, যে ধরনের তাবীজ গ্রহণ করা জায়েয, তাও কিছু শর্ত সাপেক্ষে, আর সেই শর্তের মধ্যে রয়েছে তাবীজের মধ্যে নিজস্ব ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস না থাকা।

৪. তাদের আরেকটা দলীল ঐ সব হাদীছ, যাতে ঝাড়-ফুঁক ও তাবীজকে শির্ক বলা হয়েছে। যেমনঃ

(١) من علق تميمة فقد اشرك - (رواه احمد و الحاكم)

(٢) ان الرقى والتمائم والتولة شرك - (ابو داؤد وابن ماجة)

(٣) ان رسول الله ﷺ اقبل اليه رهط فبايع تسعة وامسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا قال ان عليه تميمة فادخل يده فقطعها فبايعه وقال من علق تميمة فقد اشرك - (مسند احمد والحاكم)

তর্জমা ঃ

(১) যে তাবীজ লটকালো, সে শির্ক করল।

(২) অবশ্যই ঝাড়-ফুঁক, তাবীজ[১] ও জাদু শির্ক।

(৩) এ হাদীছে বলা হয়েছে রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে একদল লোক উপস্থিত হল। অতপর তিনি নয় জনকে বাই'আত করালেন এবং একজনকে বাই'আত করালেন না। তারা বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ"! নয় জনকে বাইআত করালেন আর একজনকে বাদ রাখলেন? রাসূল (সাঃ) বললেন তার সাথে একটি তা'বীজ রয়েছে। তখন তার হাত ভিতরে ঢুকালেন এবং সেটা ছিড়ে ফেললেন। অতপর তাকেও বাই'আত করালেন এবং বললেন ঃ যে ব্যক্তি তা'বীজ ব্যবহার করল সে শির্ক করল।

জওয়াব ঃ

এখানে প্রথম হাদীছদ্বয়ে যে তাবীজের কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা শির্কপূর্ণ তাবীজ উদ্দেশ্য। তার প্রমাণ হল এখানে উল্লেখিত দ্বিতীয় হাদীছে ঝাড়-ফুঁককেও শির্ক বলা হয়েছে, অথচ সব ঝাড়-ফুঁক শির্ক নয়; স্বয়ং রাসূল (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামও ঝাড়-ফুঁক করতেন, যা পূর্বে সহীহ হাদীছের বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব এখানে ঝাড়-ফুঁকের ক্ষেত্রে যে ব্যাখ্যা দেয়া হবে তাবীজের ক্ষেত্রেও সেই ব্যাখ্যাই দেয়া হবে। বিশেষতঃ এ ব্যাখ্যা দিতে আমরা বাধ্য এ কারণেও যে, সহীহ হাদীছে সাহাবা ও তাবিয়ীগণ কর্তৃক তাবীজ ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. تمائم শব্দের আর একটা অর্থ হল পুঁতি। এ অর্থ গ্রহণ করলে এ হাদীছ দ্বারা তাবীজ নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল দেয়া যাবে না ॥

তৃতীয় হাদীছে তা'বীজ থাকার কারণে যে ব্যক্তির বাইআত না করা এবং তার তা'বীজ খুলে ফেলার কথা বর্ণিত হয়েছে এ দ্বারা কোনভাবেই সব রকম তা'বীজ নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল দেয়া যায় না। কারণ সে লোকটা ইসলাম গ্রহণের জন্যই এসেছিল অতএব মুসলমান হওয়ার পূর্বে সে তা'বীজ লাগিয়েছিল তা নিশ্চিতই শির্ক পূর্ণ তা'বীজ ছিল। আর এই শির্কপূর্ণ হওয়ার কারণেই সে তা'বীজ নিষিদ্ধ ছিল।

বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলী-আল্লাহ্দের নিদর্শন থেকে বরকত লাভের প্রসঙ্গ

বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলী আল্লাহ্দের নিদর্শন থেকে বরকত লাভ تبرك بآثار الصالحين। এটা দুই ভাবে হয়ে থাকে।

১. তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত বস্তু দ্বারা বরকত লাভ। এটাকে বলা হয় تبرك بالاشياء। যেমন নবী করীম (সাঃ)-এর চুল মুবারক, তাঁর জুব্বা মুবারক, ইত্যাদি। এমনিভাবে ওলী-আউলিয়াগণের এ জাতীয় কোন বস্তু।

২. তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান থেকে বরকত লাভ। এটাকে বলা হয় تبرك بالمكان। যেমন নবী করীম (সাঃ)-এর জন্মস্থান, তাঁর উপর প্রথম ওহী আগমন ও তাঁর সুদীর্ঘ ধ্যানমগ্ন থাকার স্থান হেরা গুহা, হাজার বার ওহী আগমনের স্থান খাদীজা (রাঃ)-এর গৃহ, হিজরতের সময় তাঁর আত্মগোপন থাকার স্থান গারে ছাওর, দারে আরকাম, আবূ বকর, ওমর প্রমুখ সাহাবীদের গৃহ ইত্যাদি।

প্রথম প্রকার অর্থাৎ, বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলী আল্লাহ্দের স্মৃতি বিজড়িত বস্তু দ্বারা বরকত লাভ (تبرك بالاشياء)-এর বিষয়ে উম্মতের কারও কোন মতবিরোধ নেই। কেননা নবী করীম (সাঃ)-এর চুল মুবারক কাটার পর তা সাহাবাদের মধ্যে বন্টনের কথা এবং তাঁর উযূর পানি সাহাবাগণের গায়ে মাখানোর কথা সহীহ হাদীছের বর্ণনায় বিদ্যমান। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ, তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান থেকে বরকত লাভ (تبرك بالمكان)-এর বিষয়েও উম্মতের মাঝে অতীতে কোন মতবিরোধ ছিল না। সর্ব প্রথম ইব্নে তাইমিয়া ও তার শাগরেদ ইব্নে কাইয়্যেম এ বিষয়ে মতবিরোধের সূচনা করেন। তারপর সালাফিয়াগণ এ বিষয়টি প্রচারে তৎপর ভূমিকা রাখতে শুরু করে। বর্তমানের সৌদি কর্তৃপক্ষ অনুরূপ মতপোষণ ও প্রচার করছে। তাদের মতে নবী ও ওলী-আউলিয়াগণের স্মৃতি বিজড়িত বস্তু দ্বারা বরকত লাভের বিষয়টি সহীহ, তবে তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান থেকে বরকত লাভের বিষয়টি সহীহ নয় বরং বিদ'আত।

বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলী আল্লাহ্দের স্মৃতি বিজড়িত স্থান থেকে বরকত লাভ (تبرك بالمكان)-এ বিষয়টি জায়েয হওয়ার ব্যাপারে আমাদের জমহুরের পক্ষে কুরআন, হাদীছ, ইজমা' ও কিয়াস-এই সব প্রকার দলীল বিদ্যমান। এতসব দলীল থাকা সত্ত্বেও যারা এটাকে অস্বীকার করেন এবং নিজেদের মতে গো ধরেন, তাদেরকে শরী'আত প্রিয় বলা যেতে পারে না।

কুরআন থেকে দলীল ঃ

سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذى باركنا حوله . الاية -

অর্থাৎ, মহান ঐ সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমনে নিয়ে যান মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার আশ-পাশকে আমি বরকতময় করেছি। (সূরাঃ ১৭-বানী ইসরাঈলঃ ১)

ونجيناه ولوطا الى الارض التى باركنا فيها للعلمين -

অর্থাৎ, আর আমি লূতকে উদ্ধার করে এমন এলাকায় নিয়ে যাই, যাতে জগৎবাসীর জন্য আমি বরকত রেখেছি। (সূরাঃ ২১-আম্বিয়াঃ ৭১)

এই উভয় আয়াতে শাম ও বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকাকে রবকতময় এলাকা বলে অভিহিত করা হয়েছে। বলাবাহুল্য-অত্র এলাকা বহু সংখ্যক নবী রাসূলের আগমনের এলাকা হওয়ার কারণেই সেটাকে বরকতময় এলাকা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এ আয়াতদ্বয়ই বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলী আল্লাহ্‌দের স্মৃতি বিজড়িত স্থান বরকতময় হওয়ার দলীল। এর থেকে تبرک بالمکان এর নীতিটি সুপ্রমাণিত হয়।

হাদীছ থেকে দলীল ঃ

১. বোখারী শরীফের হাদীছে এসেছে ঃ

عن عتبان بن مالک انه اتى رسول الله ﷺ فقال قد انكر بصرى وانا اصلى لقومى فاذا كانت الامطار سال الوادى الذى بينى وبينهم لم استطع ان اتى مسجدهم فاصلى و وددت يا رسول الله انک تاتينى فتصلى فى بيتى فاتخذه مصلى قال فقال له رسول الله ﷺ سافعل ان شاء الله - قال عتبان فغدا رسول الله ﷺ وابو بكر حين ارتفع النهار ..... فصلى ركعتين . الحديث - (رواه البخارى فى باب المساجد فى البيوت)

অর্থাৎ, হযরত ইত্‌বান ইব্‌নে মালেক (রাঃ) একবার রাসূল (সাঃ)-এর কাছে এসে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দৃষ্টিশক্তি খারাপ হয়ে গেছে। আমি আমার গোত্রের লোকদের সাথে নামায পড়তাম। বৃষ্টি হলে সেখানে যাওয়ার পথ পানিতে সয়লাব হয়ে যায়। যার ফলে আমি তাদের মসজিদে নামায পড়তে যেতে পারি না। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আন্তরিক কামনা-আপনি আমার গৃহে তাশরীফ এনে (এক জায়গায়) নামায পড়বেন, সেই স্থানকে আমি আমার নামাযের স্থান বানাব। রাসূল (সাঃ) বললেন অচিরেই আমি তা করব। হযরত ইত্‌বান ইব্‌নে মালেক (রাঃ) বলেনঃ পরের দিন সকাল বেলা আলো পরিষ্কার হতেই আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)কে সাথে নিয়ে রাসূল (সাঃ) আমার গৃহে তাশরীফ আনলেন এবং দুই রাকআত নামায আদায় করলেন .....।

এ রেওয়ায়েত থেকে স্পষ্টতঃই বোঝা যায় রাসূল (সাঃ)-এর নামায পড়া স্থানে নামায পড়ে বরকত লাভ করার জন্যই তিনি এমন আবেদন করেছিলেন এবং রাসূল (সাঃ)ও তা সমর্থন পূর্বক তাকে সেরূপ বরকত লাভ করার সুযোগ দিয়েছিলেন।

২. বোখারী শরীফের হাদীছে আরও এসেছে ঃ

হযরত ইব্‌নে উমার (রাঃ) মক্কা মদীনার পথে সফরকালে রাসূল (সাঃ) যে সব স্থানে নামায পড়েছেন সেসব স্থান খুঁজে খুঁজে সেসব স্থানে নামায পড়তেন।[১] বলা বাহুল্য-বরকত লাভ করা ছাড়া এরূপ করার পিছনে ইব্‌নে উমার (রাঃ)-এর আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

৩. নাসায়ী শরীফের হাদীছে এসেছে ঃ

عن انس بن مالک ان رسول الله ﷺ قال اوتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفها فركبت ومعى جبرئيل عليه السلام فسرت فقال انزل فصل ففعلت فقال اتدرى اين صليت ؟ صليت بطيبة واليها المهاجر - ثم قال انزل فصل فصليت فقال اتدرى اين صليت ؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى عليه السلام - ثم قال انزل فصل فصليت فقال اتدرى اين صليت ؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام - ثم دخلت الى بيت المقدس ..... الحديث -

(رواه النسائى فى اول كتاب الصلوة)

এ হাদীছে মে'রাজের রাত্রে মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস যাওয়ার পথে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) কর্তৃক রাসূল (সাঃ)কে তূর পর্বতে আল্লাহ তা'আলা যেখানে মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছিলেন সেখানে এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মস্থান বাইতে লাহামে (বেতেলহামে) বোরাক থেকে অবতরণ করিয়ে নামায পাঠ করানোর উল্লেখ এসেছে। এটা স্পষ্টতঃই এসব স্থানের বরকতের কারণ। অতএব এটা স্থানের বরকতময় হওয়ার (تبرک بالمکان)-এর স্পষ্ট দলীল।

মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্‌মীরী (রহঃ) বলেছেনঃ এ হাদীছটি নাসাঈ শরীফ ছাড়াও ১০ খানা হাদীছের কিতাবে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে। তার মধ্যে রয়েছে বায্‌যার, ইব্‌নে আবী হাতিম, তাবরানী, বায়হাকী প্রভৃতি। আল্লামা সুয়ূতীর খাসায়েসে কুব্‌রা, ঝার্‌কানীর মাওয়াহেব প্রভৃতিতেও হাদীছটি উল্লেখিত হয়েছে।[১] এতদসত্ত্বেও ইব্‌নে কাইয়্যেম যাদুল মা'আদ গ্রন্থে বলেছেন বেতেলহামে নেমে নামায পড়ার রেওয়ায়েত মোটেই সহীহ নয়। তিনি কি নাসাঈ শরীফের সনদকেও অনির্ভরযোগ্য বলতে চান যা উম্মতের কেউ বলেননি ?

---

১. البخارى . باب المساجد فى طريق مكة والمدينة ॥

বরং নাসাঈ শরীফের কোন কোন সনদকে সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে বোখারী শরীফ থেকেও উপরের স্বীকার করা হয়েছে।

ইজমা' থেকে দলীল ঃ

ইব্‌নে তাইমিয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা' তথা ঐক্যমত চলে আসছিল। অতঃপর তিনি এবং পরবর্তীতে তার শাগরেদ ইব্‌নে কাইয়্যেম এ বিষয়ে নতুন মতের সূচনা করেন। এভাবে এক দু'জনের বিরোধ উম্মতের ইজমা'কে ক্ষতিগ্রস্ত করে না। তদুপরি তাদের মত কোন শক্তিশালী দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, যা পরবর্তীতে আলোচনা করা হচ্ছে।

কিয়াস থেকে দলীল ঃ

স্থান থেকে বরকত লাভ (تبرک بالمکان)-এর বিষয়কে বস্তু দ্বারা বরকত লাভ (تبرک بالاشیاء)-এর উপর কিয়াস করা হবে। বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলী আল্লাহ্‌দের স্মৃতি বিজড়িত হওয়ার কারণে বস্তু যদি বরকতময় হতে পারে তাহলে তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত হওয়ার কারণে স্থান কেন বরকতময় হতে পারবে না ? তদুপরি শরীআতে স্থান বরকতময় হওয়ার নমুনাও রয়েছে। হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশমীরী (রহঃ) বলেন[২] হজ্জের সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানগুলো আম্বিয়া ও সুলাহাদের স্মৃতি বিজড়িত হওয়ার কারণেই সেগুলো আজমত ও মর্যাদার স্থান পেয়েছে। নতুবা এ স্থানগুলোর পবিত্রতা ও মর্যাদার আর কি কারণ থাকতে পারে? এটাকে স্থানের মর্যাদাপূর্ণ হওয়া ও স্থান থেকে বরকত লাভ করা ছাড়া আর কি বলা যায় ? এ কারণেই সমস্ত আকাবিরে উম্মত ফয়সালা করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) যেহেতু সমগ্র মাখলূকাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাই তাঁর চির শায়িত থাকার পবিত্র স্থানটিও সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান। অথচ ইব্‌নে তাইমিয়া (রহঃ) রাসূল (সাঃ)কে সমগ্র মাখলূকাতের শ্রেষ্ঠ স্বীকার করা সত্ত্বেও তাঁর চির শায়িত থাকার স্থানটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান হিসেবে স্বীকার করেননি। বরং তিনি সমূলে কোন স্থানের বরকতময় হওয়াকেই অস্বীকার করে বসেছেন। আর আফসূস সালাফী ও গায়রে মুকাল্লিদগণও এই মতবাদ পোষণ করে চলেছেন।

স্থান থেকে বরকত লাভ (تبرک بالمکان)-এর বিষয়কে অস্বীকারকারী সালাফীদের দলীল ও তার জওয়াব ঃ

১৯২৪ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ১৩৪৪ হিজরীতে মক্কা মোআজ্জমায় বাদশাহ আব্দুল আযীয কর্তৃক আহুত মু'তামারে আলমে ইস্‌লামী-এর আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়। সেই কনফারেন্সে উপস্থিত আমাদের উলামায়ে কেরাম হযরত মাওলানা শাব্বির আহ্‌মদ ওছমানী প্রমুখ সালাফী ও নজ্‌দী উলামায়ে কেরামের সামনে সম্মেলনে এবং পরবর্তীতে এ বিষয়ে উপরোক্ত দলীল সমূহ তুলে ধরেন। তারা এসব দলীলের কোন উত্তর না দিয়ে শুধু তাবাকাতে ইব্‌নে সা'দ-এর একটা রেওয়ায়েত

২. ملفوظات محدث کشمیری ॥ ১. প্রাগুক্ত ॥

পেশ করেন। যে রেওয়ায়েতে আছে হযরত ওমর (রাঃ) বাইয়াতুর রেদওয়ান যে বৃক্ষের নীচে হয়েছিল সে বৃক্ষ কেটে ফেলেছিলেন। অথচ এ রেওয়ায়েতের অনেকগুলি জওয়াব রয়েছে। যথা ঃ

১. রেওয়ায়েতটি মুন্‌কাতি' (منقطع) কেননা এর সনদে হযরত নাফে' ইব্‌নে উমার থেকে বর্ণনা করেছেন অথচ হযরত ইব্‌নে উমারের সাথে হযরত নাফে'-এর সাক্ষাৎ হয়নি।[১]
২. এটা মারফূ' (مرفوع) হাদীছের পর্যায়ভুক্ত নয়। মারফূ' হাদীছের মোকাবিলায় এটা দলীল হতে পারে না।
৩. হযরত ওমর (রাঃ) এ কারণে বৃক্ষটি কেটে দেননি যে, স্থান থেকে বরকত লাভ (تبرک بالمکان) জায়েয নয় বরং তিনি এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি রোধ করার জন্য এটা করেছেন। স্বয়ং ইব্‌নে কাইয়্যেমও স্বীকার করেছেন যে, ওমর (রাঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল বাড়াবাড়ি থেকে রক্ষা করা। (زاد المعاد جـ١) হযরত ওমর (রাঃ)-এর উপরোক্ত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সমর্থন পাওয়া যায় এর থেকে যে, হযরত ওমর (রাঃ) স্বয়ং স্থান থেকে বরকত লাভ (تبرک بالمکان)-এর প্রবক্তা ছিলেন। তার প্রমাণ হল যখন তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়েছিলেন, তখন কা'বে আহ্‌বারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি কোথায় নামায পড়ব ? কা'বে আহ্‌বার বলেছিলেন বড় পাথর (صخرة)-এর কাছে পড়ুন। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেন ঃ না, আমিতো সেখানে পড়ব যেখানে নবী করীম (সাঃ) পড়েছিলেন।
৪. হযরত আনওয়ার শাহ কাশমীরী (রহঃ) বলেছেন ঃ হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক বৃক্ষ কর্তনের মূল কারণ ছিল সে বৃক্ষ নির্দিষ্ট কোন্‌টি তা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। এমনকি দুজন সাহাবীও সে ব্যাপারে একমত ছিলেন না। এমতাবস্থায় প্রশ্ন ছিল যে বৃক্ষটি বরকতময় নয় সেটিকে বরকতময় মনে করা হয়ে যায় কি-না। তাই তিনি সেখানকার বৃক্ষ কেটে ফেলেন। কারণ নির্দিষ্ট ঐতিহ্যবাহী পবিত্র স্থানকে যেমন মর্যাদা ও গুরুত্ব না দেয়া ঠিক নয়, তদ্রূপ অনির্দিষ্ট স্থানকেও ঐতিহ্যবাহী পবিত্র স্থানের মত মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রদান করা ঠিক নয়।

অতএব হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক বৃক্ষ কর্তনের ঘটনার এতসব জওয়াব থাকা সত্ত্বেও যদি সালাফীগণ কর্তৃক উপরোক্ত আয়াত, হাদীছ ও কিয়াসকে বর্জন করে শুধু হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক বৃক্ষ কর্তনের দূর্বল ও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হাদীছের (ঘটনার) ভিত্তিতে স্থান থেকে বরকত লাভ (تبرک بالمکان)-এর বিষয়কে অস্বীকার করার উপর হটকারিতা প্রদর্শন করা হয়। উপরন্তু স্থান থেকে বরকত লাভ (تبرک بالمکان)-এর প্রবক্তা জমহুর উম্মতের মাসলাককে বিদআত বা আরও আগে বেড়ে শির্‌ক পর্যন্ত বলা হয়, তাহলে তা হবে অবশ্যই বাড়াবাড়ি, সেটা কোনক্রমেই হক সন্ধানী মনোবৃত্তির পরিচায়ক হবে না।

১. كذا في التهذيب ॥

রওযায়ে আতহার যিয়ারতে যাওয়ার নিয়ত প্রসঙ্গ

কেউ যখন মদীনা মুনাওয়ারা গমন করেন, তখন তিনি মসজিদে নববী যিয়ারতের নিয়তে নয় বরং রাসূল (সাঃ)-এর রওযায়ে আতহার যিয়ারতের নিয়তেই গমন করে থাকেন। এ বিষয়ে উম্মতের মধ্যে কোন মতবিরোধ ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি সালাফীগণ নতুন বিতর্কের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন। তারা বলছেন কেউ যখন মদীনা মুনাওয়ারা গমন করবেন, তখন তিনি রাসূল (সাঃ)-এর রওযায়ে আতহার যিয়ারতের নিয়ত করবেন না বরং মসজিদে নববী যিয়ারতের নিয়তে গমন করবেন।

সর্ব প্রথম কাজী ইয়াজ মালিকী নিম্নোক্ত হাদীছের আলোকে বলেন যে, কোন কবর যিয়ারতের জন্য সফর করা জায়েয নয়। হাদীছটি এই ঃ

لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الاقصى -

অর্থাৎ, মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা-এই তিন মসজিদের উদ্দেশ্য ব্যতীত সফর করা যাবে না।

ইব্‌নে তাইমিয়া (রঃ) এ বিষয়ে আরও অতিরঞ্জন করেছেন এবং বলেছেন যে, নবী (সাঃ)-এর রওযায়ে আত্‌হার যিয়ারতের উদ্দেশ্যেও সফর করা জায়েয নয়। তিনি বলেন মসজিদে নববীর যিয়ারতের নিয়তে সফর করবে, তারপর আনুষঙ্গিকভাবে রওযায়ে আত্‌হারেরও যিয়ারত করে নিবে। অথচ চিন্তা করার বিষয় হল - তাহলে হাজীগণ মক্কার মসজিদে হারামের এক লক্ষ্যগুণ ছওয়াব ছেড়ে মসজিদে নববীর এক হাজার (অন্য বর্ণনা মতে পঞ্চাশ হাজারগুণ ছওয়াব)-এর জন্য কেন মদীনা গমন করবেন? ইব্‌নে তাইমিয়া (রহঃ) বলতে চান হাদীছের অর্থ হল-মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা -এই তিন মসজিদ ব্যতীত 'অন্য কোন কিছুর উদ্দেশ্যে' সফর করা যাবে না। কিন্তু জমহুর উম্মত ইব্‌নে তাইমিয়া (রহঃ)-এর এই অভিমতকে গ্রহণ করেননি। বরং তার তারদীদ (খণ্ডন) করেছেন, এমনকি আল্লামা তাকিউদ্দীন সুবকী (রহঃ) তাঁর বক্তব্যের খণ্ডনে شفاء السقام নামক একখানা বিশদ গ্রন্থও রচনা করেছেন।

জমহুর এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ এখানে বলা হয়েছে - মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা-এই তিন মসজিদ ব্যতীত 'অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে' সফর করা যাবে না। কেননা অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করার মধ্যে কোন অতিরিক্ত ফায়দা নেই। তবে হ্যাঁ এই তিন মসজিদের ছওয়াব বেশী থাকায় এই তিন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করার মধ্যে অতিরিক্ত ফায়দা অর্জনের দিক রয়েছে। ইব্‌নে তাইমিয়া যে অর্থ করেছেন যে, এই তিন মসজিদ ব্যতীত 'অন্য কোন কিছুর উদ্দেশ্যে' সফর করা যাবে না। এ অর্থ গ্রহণ করা হলে ইল্‌ম তলব করার উদ্দেশ্যে সফর, জিহাদের উদ্দেশ্যে সফর, কোন আলেমের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফর - এগুলি সব নিষিদ্ধ হয়ে যায়। অথচ তা নিষিদ্ধ নয়। সারকথা এখানে উহ্য مستثنى منه টি الى شئ নয় বরং الى مسجد। এ বক্তব্যের অনুকূলে পাওয়া যায় মুসনাদে আহমদের নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত ঃ

ঐক্যমত্যের বিপরীত ভিন্ন মত গ্রহণ করল। ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহ্‌মদ, ইমাম গাযালী, ইব্‌নে হায্‌ম, ইব্‌নে কায়্যিম প্রমুখ হাদীছ অস্বীকার করার এই ফিতনার বিরুদ্ধে কলম ধরেন।

এরপর বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যখন মুসলমানদের উপর পাশ্চাত্য জাতি সমূহের রাজনৈতিক মতবাদের প্রভাব বেড়েছে, তখন স্বল্প জ্ঞান সম্পন্ন মুসলমানদের এরূপ একটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে যারা পাশ্চাত্যের চিন্তা-গবেষণা দ্বারা সীমাহীন প্রভাবিত ছিল। তারা মনে করত পৃথিবীতে পাশ্চাত্যের অনুসরণ ব্যতীত উন্নয়ন সম্ভব নয়। কিন্তু পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরনে ইসলাম একটি বড় বাঁধা। তাই তারা ইসলামে বিকৃতির ধারা আরম্ভ করে। যাতে এটাকে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা মোতাবেক তৈরী করা যায়। এই শ্রেণীটিকে বলা হয় আহলে তাজাদ্দুদ বা আধুনিকতাবাদী। হিন্দুস্তানে স্যার সৈয়দ আহমদ খান, মিসরে তাহা হোসাইন, তুর্কীতে জিয়া গোগ আলফ এই শ্রেণীর পথ প্রদর্শক। এই শ্রেণীর উদ্দেশ্য ততক্ষণ পর্যন্ত অর্জিত হতে পারেনি যতক্ষণ পর্যন্ত হাদীছকে পথ থেকে না সরানো যায়। কারণ, হাদীছ সমূহে জীবনের প্রতিটি শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট এরূপ বিস্তারিত দিক নির্দেশনা রয়েছে। যেগুলো পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সাথে সুস্পষ্টরূপে সাংঘর্ষিক। এ কারণে এই শ্রেণীর কেউ কেউ হাদীছকে প্রমাণ মানতে অস্বীকার করেছেন। হিন্দুস্তানে সর্ব প্রথম এই আওয়াজ বুলন্দ করেছেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং তার বন্ধু মৌলভী চেরাগ আলী। কিন্তু তারা হাদীছ অস্বীকারের মতবাদকে প্রকাশ্যে ও সুস্পষ্ট ভাষায় পেশ করার পরিবর্তে এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন যে, যেখানে কোন হাদীছ নিজের দাবী পরিপন্থী বলে পরিলক্ষিত হয়েছে সেখানে তারা এর বিশুদ্ধতাকে অস্বীকার করেছেন। চাই সুত্র যতই শক্তিশালী হোক না কেন। কোথাও কোথাও প্রকাশ করা হত যে, এই হাদীছগুলো বর্তমান যুগে প্রমাণ হওয়া উচিত নয়। কোন কোন স্থানে মতলব উদ্ধারে সহায়ক ও উপকারী হাদীছগুলো দ্বারা প্রমাণও পেশ করা হত। এর মাধ্যমেই বাণিজ্যিক সূদকে হালাল করা হয়েছে, মু'জিযাগুলোকে অস্বীকার করা হয়েছে, পর্দাকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং বহু পাশ্চাত্য মতবাদকে বৈধতার সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে।

তাদের পর হাদীছ অস্বীকারের মতবাদে আরো উন্নতি হয়, এবং এই মতবাদ কিছুটা সাংগঠনিকভাবে আব্দুল্লাহ চকড়ালভীর নেতৃত্বে অগ্রসর হয়। তিনি ছিলেন একটি ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা। যিনি নিজেকে আহ্‌লে কুরআন বলতেন। তার উদ্দেশ্য ছিল হাদীছকে পুরোপুরি অস্বীকার করা। এরপর আসলাম জয়রাজপুরী আহলে কুরআন থেকে সরে এই মতবাদকে আরো সমনে এগিয়ে নেন। এমনকি গোলাম আহমদ পারভেজ এই ফিতনার নেতৃত্ব হাতে নেন এবং এটাকে একটি সুশৃংখল মতবাদ ও চিন্তাধারা কেন্দ্রের রূপ দেন। যুবকদের জন্য তার লেখায় বিরাট আকর্ষণ ছিল। এজন্য তার যুগে এই ফিতনা সবচেয়ে বেশি ছড়িয়েছে। নিম্নে হাদীছ অস্বীকার করার এই ফিতনার মৌলিক মতবাদের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হল।

হাদীছ অস্বীকারকারীদের চারটি মতবাদ ঃ

হাদীছ অস্বীকারকারীদের পক্ষ থেকে যেসব মতবাদ এখন পর্যন্ত সামনে এসেছে সেগুলো চার প্রকার। যথা ঃ

১। রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর দায়িত্ব ছিল শুধু কুরআন পৌঁছানো। আনুগত্য ওয়াজিব শুধু কুরআনের। রাসূল হিসেবে রাসূল (সাঃ)-এর আনুগত্য না সাহাবায়ে কেরামের উপর ওয়াজিব ছিল না আমাদের উপর ওয়াজিব। এবং ওহী শুধু মাতলূ' (প্রত্যক্ষ ওহী অর্থাৎ, কুরআন)। ওহীয়ে গায়রে মাতলূ' (অপ্রত্যক্ষ ওহী অর্থাৎ, হাদীছ) বলতে কোন জিনিস নেই। তাছাড়া কুরআনে কারীম বুঝার জন্য হাদীছের প্রয়োজন নেই।

২। রাসূল (সাঃ)-এর বাণীগুলো সাহাবীদের জন্য তো প্রমাণ ছিল কিন্তু আমাদের জন্য তা প্রমাণ নয়।

৩। রাসূল (সাঃ)-এর হাদীছ সমূহ সমস্ত মানুষের জন্য হুজ্জাত বা প্রমাণ। কিন্তু বর্তমানে হাদীছগুলো আমাদের নিকট নির্ভরযোগ্য সূত্রে পৌঁছেনি। এজন্য আমাদের উপর এগুলো মানার দায়িত্ব বর্তায় না।

৪। রাসূল (সাঃ)-এর হাদীছ হুজ্জাত। কিন্তু খবরে ওয়াহেদ জন্নী (ظنى) বা ধারণামূলক (নিশ্চিত অর্থবোধক নয়) বিধায় তা গ্রহণযোগ্য নয়।

হাদীছ অস্বীকারীরা যে কোন শ্রেণী বা দলের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক তাদের প্রতিটি লেখা এই চারটি মতবাদ থেকে কোন একটির মুখপত্র হিসেবে কাজ করে। এজন্য আমরা তাদের পরস্পর বিরোধী সাংঘর্ষিক এই মতবাদগুলোর প্রত্যেকটির উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করছি।

প্রথম মতবাদ খন্ডন
তথা হাদীছ হুজ্জাত বা দলীল হওয়ার প্রমাণ

১। وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا أو من وراىٔ حجاب او يرسل رسولا -

অর্থাৎ, মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে, অথবা দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে। (সূরা শূরাঃ ৫১)

এ আয়াতে রাসূল প্রেরণ ছাড়াও "ওহীর মাধ্যম" বলে ওহীর একটি স্বতন্ত্র প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই হল ওহীয়ে গায়রে মাতলূ'।

২। কুরআনে কারীমে আছে-

وما جعلنا القبلة التى كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه -

অর্থাৎ, তুমি এ যাবৎ যে কিবলার অনুসরণ করে আসছিলে, সেটাকে এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম, যাতে জানতে পারি কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে অনুসরণ না করে। (সূরা বাকারা ঃ ১৪৩) এতে القبلة التى كنت عليها "যে কিবলার অনুসরণ করে আসছিলেন" দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাসকে বোঝানো হয়েছে। এর দিকে মুখ ফিরানোর

নির্দেশকে সৃষ্টিকর্তা جعلنا "আমি করেছিলাম" শব্দ দ্বারা নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। অথচ পুরো কুরআনের কোথাও বায়তুল্লাহর দিকে মুখ ফিরানোর নির্দেশ নেই। অবশ্যই এ হুকুম ছিল ওহীয়ে গায়রে মাতলূর মাধ্যমে। এটাকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট করে দিলেন যে, ওহীয়ে গায়রে মাতলূর হুকুমও পালন করা সেরূপ ওয়াজিব যেরূপ ওহীয়ে মাতলূর হুকুম।

৩। علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم (আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি খেয়ানত বা অবিচার করছিলে। (সূরা বাকারা ঃ ১৮৭) এ আয়াতে রমযানের রাতে স্ত্রী সহবাসকে খিয়ানত আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে এর অনুমতি দেয়া হয়েছে। কুরআনে কারীমের এ বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, এর পূর্বে সহবাস হারামের নির্দেশ এসেছিল। তাই সে হুকুমের বিরোধিতা ছিল খেয়ানত। অথচ এই হুকুম কুরআনে কারীমের কোথাও উল্লেখ নেই। অবশ্যই এই নির্দেশ ছিল ওহীয়ে গায়রে মাতলূর মাধ্যমে।

৪। ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون -.....الى قوله تعالى : وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به -

অর্থাৎ, বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে, আল্লাহ তো তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। সুতরাং, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ..... এটাকে কেবল তোমাদের জন্য সুসংবাদ ও তোমাদের চিত্ত-প্রশান্তির নিমিত্তে আল্লাহ করেছেন। (সূরা আলূ-ইমরান ঃ ১২৩-১২৬) এ আয়াতটি ওহুদের যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে আল্লাহ তা'আলা বদরের যুদ্ধে ফেরেশতা অবতরণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। অবশ্য এই ভবিষ্যদ্বাণী কুরআনের কোথাও উল্লেখ নেই। স্পষ্ট বিষয়-এটা ছিল ওহীয়ে গায়রে মাতলূর মাধ্যমে।

৫। واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم

অর্থাৎ, স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে, দুই দলের এক দল তোমাদের আয়ত্বাধীন হবে। (সূরা আনফাল ঃ ৭) এতেও যে প্রতিশ্রুতির উল্লেখ রয়েছে সেটা হয়েছিল ওহীয়ে গায়রে মাতলূর মাধ্যমে। কুরআনে কারীমের কোথাও এর উল্লেখ নেই।

৬। سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله

অর্থাৎ, তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন যারা গৃহে রয়ে গিয়েছিল, তারা বলবে, আমাদেরকে তোমাদের সংগে যেতে দাও। তারা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করতে চায়। (সূরা ফাতহ ঃ ১৫) এ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, মুনাফিকদের খায়বারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা করেছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, এ ভবিষ্যদ্বাণীও ওহীয়ে গায়রে মাতলূর মাধ্যমে ছিল। কারণ, কুরআনে কারীমের কোথাও এর উল্লেখ নেই।

৭। রাসূল (সাঃ)-এর মানসাবে নবুওয়াতের দায়িত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে-

ويعلمهم الكتاب والحكمة -

অর্থাৎ,আর তিনি তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন। (সুরা বাকারা ঃ ১২৯)

তাছাড়া ইরশাদ রয়েছে - وانزل اليک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم

অর্থাৎ, তোমার নিকট আমি অবতীর্ণ করেছিলাম কুরআন মানুষদের সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। (সূরা নাহল ঃ ৪৪)

এসব আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, তার মানসাব একজন ডাক পিয়নের ন্যায় নাউযুবিল্লাহ শুধু পয়গাম পৌঁছে দেয়াই ছিল না; বরং কিতাব ও হিকমত শেখানো এবং এর বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যা প্রদানও তাঁর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যদি নবী (সাঃ)-এর ইরশাদগুলো প্রমাণ না হত, তাহলে আল্লাহ্র কিতাবের বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যার জন্য প্রিয়নবী (সাঃ)-এর নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বলার প্রয়োজন হত না ? তাহলে কিতাব ও হিকমতের বিশদ বিবরণ কিভাবে হতে পারে ?

৮। কুরআনে কারীমের বিভিন্ন স্থানে واطيعوا الله (আল্লাহ্র আনুগত্য কর)-এর সাথে সাথে اطيعوا الرسول (রাসূলের আনুগত্য কর) কথাটা উল্লেখ করা হয়েছে। যা স্পষ্টরূপে হাদীছ হুজ্জাত বা প্রমাণ হওয়াকে বোঝায়।

এ সম্পর্কে হাদীছ অস্বীকারকারীরা বলে থাকেন যে, এই আনুগত্য শরী'আতের প্রমাণ হিসেবে নয়, বরং মিল্লাতের কেন্দ্র ও শাসক হিসেবে। অর্থাৎ, রাসূল (সাঃ)-এর বাণীগুলো একজন শাসকরূপে তৎকালীন লোকদের উপর মান্য করা ওয়াজিব ছিল। তারপর যারাই শাসক হবে তাদের আনুগত্য করতে হবে। রাসূল (সাঃ)-এর নয়। এর দুটি উত্তর।

(১) শাসকের আনুগত্যের আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে পরবর্তীতে করা হয়েছে। অর্থাৎ, اولی الامر منکم । অতএব, রাসূলের আনুগত্য ও শাসকদের আনুগত্য দুটি স্বতন্ত্র বিষয়।

(২) এখানে اطيعوا الرسول শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটা সর্বজন স্বীকৃত মূলনীতি যে, যখন কোন اسم مشتق তথা ক্রিয়াজাত বিশেষ্যের উপর যখন কোন হুকুম লাগানো হয়, তখন ক্রিয়ামূল এই হুকুমের কারণ হয়ে থাকে। যেমন اکرم العالم বাক্যে আলিমের সম্মান প্রদর্শনের কারণ হল, ইল্ম। এরূপভাবে اطيعوا الرسول বাক্যে আনুগত্যের কারণ হল রিসালত, শাসকত্ব নয়।

৯। فلاوربک لایؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما -

অর্থাৎ, কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ, তারা কখনো খাঁটি ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পন না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে না নেয়। (সূরা নিসা ঃ ৬৫)

এ আয়াতে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সাঃ)-এর বাণীগুলোর আনুগত্য শুধু ওয়াজিব নয়; বরং এর উপর ঈমান নির্ভরশীল।

১০। পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে এরূপ অনেকেই ছিলেন যাঁদের উপর কোন কিতাব অবতীর্ণ হয়নি। যদি তাঁদের বাণীগুলোর উপর আমল ওয়াজিব না হয়ে থাকে, তাহলে তাঁদেরকে প্রেরণ করা হল কেন ?

হাদীছ হুজ্জাত হওয়ার ব্যাপারে কয়েকটি যৌক্তিক প্রমাণ (عقلی دلائل) ঃ

১। কুরআনে কারীমে জীবনের প্রতিটি শাখা সম্পর্কে যেসব দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে সেগুলো তো সাধারণতঃ মৌলিক বিধি-বিধান সম্বলিত। এসব বিধি-বিধানের বিস্তারিত বিবরণ, এগুলোর উপর আমলের পদ্ধতি সব বর্ণনা করেছে হাদীছ। নামায পড়ার পদ্ধতি, এর ওয়াক্ত, রাক'আতের সংখ্যা নির্ধারণ - এসবের কিছুই কুরআনে নেই। যদি হাদীছ প্রমাণ না হয়, তাহলে اقیموا الصلوة (তোমরা সালাত অর্থাৎ, নামায কায়েম কর)-এর উপর আমলের পদ্ধতি কি ? যদি কেউ বলে যে, সালাত শব্দের অর্থ আরবী অভিধানের আলোকে تحریک الصلوین বা দুই নিতম্ব দোলানো (নৃত্য করা)। অতএব, اقیموا الصلوة -এর অর্থ হল নৃত্যের আসর কায়েম করা। তাহলে আপনার কাছে এর কি উত্তর ?

২। আরবের পৌত্তলিকদের কামনা ছিল, আল্লাহ্র কিতাব যেন রাসূলের মাধ্যমে প্রেরণের স্থলে সরাসরি তাদের উপর অবতীর্ণ করা হয়-

حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه -

অর্থাৎ, যতক্ষণ না তুমি আমাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ কর, যা আমরা পাঠ করব (ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ঈমান আনব না)। (সূরাঃ ১৭-বানী ইসরাঈলঃ ৯৩)

প্রকাশ থাকে যে, এমতাবস্থায় মু'জিযাও বেশী প্রকাশ পেত এবং মুশরিকদের ঈমান আনয়নের আশাও অধিক হত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এই পদ্ধতি অবলম্বন করেননি। প্রশ্ন হল, যদি হাদীছগুলো প্রমাণ না হয়, তাহলে রাসূল প্রেরণের উপরই কেন জোর দেয়া হল ? মূলতঃ রাসূল এজন্য পাঠানো হয়েছে যে, শুধু কিতাব কোন জাতির সংশোধনের জন্য কখনও যথেষ্ট হতে পারে না, যতক্ষণ না এরূপ শিক্ষক হবেন যিনি এর অর্থ নির্ধারণ করবেন, স্বয়ং এর কার্যতঃ আদর্শ হয়ে আসবেন। আর এটা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতিটি বাণী ও কর্মের অনুসরণ ওয়াজিব না হয়।

৩। সমস্ত উম্মত হাদীছগুলোকে প্রমাণ মেনে আসছে। যদি গোটা উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে থাকে এবং ১৪০০ বছর পর্যন্ত পারভেজ সাহেব ব্যতীত ইসলাম অনুধাবনকারী কেউ সৃষ্টি না হয়ে থাকে তাহলে চিন্তা করা উচিত যে, সে দ্বীন কি অনুসরণযোগ্য হতে পারে যা চৌদ্দশত বছর পর্যন্ত কোন একজন আদম সন্তানও বুঝতে পারেননি।

হাদীছ অস্বীকারকারীদের প্রমাণাদি ও তার খণ্ডন

১। হাদীছ অস্বীকারকারীরা সর্বপ্রথম তাদের দলীলে এ আয়াত পেশ করেন-

ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر -

অর্থাৎ, কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, কেউ আছে উপদেশ গ্রহণ করার ? (সূরা ঃ ৫৪কামার ঃ ১৭)

তাদের বক্তব্য হল, এই আয়াতের আলোকে কুরআন একেবারেই সহজ। অতএব, তা অনুধাবন এবং তার উপর আমল করার জন্য হাদীছের মাধ্যমে কোন তা'লীম বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

খণ্ডন ঃ

(১) কুরআনে কারীমের বিষয়াবলী দুই প্রকার। (এক) কিছু বিষয় এরূপ রয়েছে যেগুলোর উদ্দেশ্য আল্লাহর ভয়, পরকালের ফিকির, আল্লাহর দিকে রুজূ' পয়দা করা এবং সাধারণ উপদেশের বিষয়। (দুই) আর কিছু বিষয় আছে এরূপ, যেগুলোতে আহকাম তথা বিধি-বিধান এবং এগুলোর মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। ولقد يسرنا القران আয়াতটি প্রথম প্রকার বিষয়াবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট, দ্বিতীয় প্রকার বিষয়াবলীর সাথে নয়। যার প্রমাণ হল. يسرنا القران -এর সাথে للذكر শর্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। যদি বিধি-বিধান উদঘাটন করাও সহজ হত তাহলে এই শর্ত যোগ করা হত না। তাছাড়া সামনে فهل من مذكر বলা হয়েছে। هل من مستنبط অথবা هل من مجتهد এ রকম বলা হয়নি।

(২) কুরআনে কারীমের কয়েকটি আয়াতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, এই কিতাব রাসূল ছাড়া বুঝে আসতে পারে না। যেমন-

وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم -

অর্থাৎ, তোমার নিকট আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন মানুষদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। (সূরাঃ ১৬-নাহ্লঃ ৪৪)

২। হাদীছ অস্বীকারকারীরা বলেন- কুরআনে কারীম বিভিন্ন স্থানে স্বীয় আয়াতগুলোকে বায়্যিনাত (স্পষ্ট প্রমাণ) বলে সাব্যস্ত করেছে। এর দ্বারাও বোঝা যায় যে, কুরআন স্বয়ং স্পষ্ট। এর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

খণ্ডন ঃ

কুরআনে যে আয়াতগুলোকে বায়্যিনাত বা সুস্পষ্ট বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে সেগুলো মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে করা হয়েছে। অর্থাৎ, তাওহীদ, রিসালত ও আখিরাতের প্রমাণাদি এত স্পষ্ট যে, সামান্য মনোযোগ দিলেই তা অন্তরে বসে যায়। খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদী আকীদার মত কোন হেয়ালি বিষয় নয় যে, গোটা বিশ্ব মিলেও তা অনুধাবন করতে পারে না। অতএব এটা আবশ্যক হয় না যে, আহকাম বা বিধি-বিধানের ব্যাপারেও কুরআন এতই সুস্পষ্ট যে, সেগুলোর ব্যাখ্যার জন্য কোন রাসূলের প্রয়োজন নেই।

৩। হাদীছ অস্বীকারকারীদের আর একটি দলীল হল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত ঃ

قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى . الاية -

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। (সূরাঃ ১৮-কাহ্ফঃ ১১০)

হাদীছ অস্বীকারকারীগণ বলেন যে, এ আয়াতে রাসূল (সাঃ) কে অন্যান্য মানুষের ন্যায় মানুষ সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতএব, রাসূল (সাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ ওহীয়ে মাতলূর

তো অনুসরণ করা ওয়াজিব; কিন্তু রাসূল (সাঃ)-এর বাণীগুলোর উপর আমল করা আবশ্যক নয়।

খণ্ডন ঃ

(১) বস্তুতঃ এই প্রমাণ পেশ করা হয়েছে আয়াতটিকে পূর্বাপর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে। আসলে এ আয়াতটি সেসব পৌত্তলিকের উত্তরে এসেছিল যারা প্রিয়নবী (সাঃ)-এর নিকট মু'জিযা দাবী করে আসছিল। তার উত্তরে বলা হয়েছে- আমি তোমাদের মতো মানুষ, এজন্য স্বীয় মর্জি মোতাবেক অলৌকিক বিষয় প্রদর্শনে সক্ষম নই, যতক্ষণ না আল্লাহ ইচ্ছা করবেন। এতে বোঝা গেল, مثلكم শব্দের উপমা দেয়া হয়েছে শুধু আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত অলৌকিক বিষয় প্রদর্শনের ক্ষমতা না থাকার ব্যাপারে, সর্ব ব্যাপারে নয়।

(২) এ আয়াতেই অন্য মানুষের সাথে তার পার্থক্যের কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে ওহীকে। আর "ওহী" কথাটা ব্যবহৃত হয়েছে শর্তবন্ধনহীনভাবে (مطلق) যা ওহীয়ে মাতলূ' গায়রে মাতলূ' উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব, রাসূল (সাঃ)-এর বাণীর উপর আমল করা ওয়াজিব নয়- এ মর্মে এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করার অবকাশ নেই।

৪। হাদীছ অস্বীকারকারীরা সেসব ঘটনা দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেন, যেগুলোতে রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি কোন কাজের ফলে কুরআনে কারীমে ভর্ৎসনা অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন, বদরের যুদ্ধের সময় কয়েদীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে কুরআনে কারীমে ভর্ৎসনা অবতীর্ণ হয়েছে।

হাদীছ অস্বীকারকারীদের বক্তব্য হল, এ ঘটনায় কুরআন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, রাসূল (সাঃ)-এর সিদ্ধান্ত আল্লাহ্র সন্তোষ অনুযায়ী ছিল না। অতএব রাসূল (সাঃ)-এর উক্তি ও কর্মকে ব্যাপকভাবে প্রমাণ বলা যাবে না ?

খণ্ডন ঃ

এসব ঘটনাতে নিঃসন্দেহে রাসূল (সাঃ)-এর ইজতিহাদী বিচ্যুতি হয়েছিল। যার ফলে ওহীর মাধ্যমে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে; কিন্তু যদি গভীরভাবে দেখা হয় তাহলে এই ঘটনাই হাদীছের প্রামাণিকতা প্রমাণ করে। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন এই ইজতিহাদী ভুলের উপর সতর্ক করেনি ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত সাহাবী এই হুকুমের উপর রাসূল (সাঃ)-এর অনুসরণ করেছেন। আর যখন কুরআনের সতর্কবাণী অবতীর্ণ হয়েছে তখন রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি তো প্রিয়জন সুলভ ভর্ৎসনা হয়েছে যে,

ماكان لنبى ان يكون له اسرى . الاية

অর্থাৎ, দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দি রাখা কোন নবীর জন্য সংগত নয়। (সূরাঃ ৮-আনআমঃ ৬৭)

কিন্তু সাহাবীদের উপর কোন প্রকার ভর্ৎসনা হয়নি যে, এই ফয়সালাতে তাঁরা রাসূল (সাঃ)-এর অনুসরণ কেন করলেন ? এতে পরিষ্কার বোঝা যায় রাসূল (সাঃ)-এর ফয়সালার আনুগত্যই কাম্য ছিল।

৫। হাদীছ অস্বীকারকারীরা ঐসব ঘটনা দ্বারাও প্রমাণ পেশ করে, যাতে রাসূল (সাঃ) মদীনার অনুসারীগণকে তা'বীরে নখল (খেজুর গাছের পরাগায়ন) থেকে নিষেধ করেছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম তা বর্জন করলে উৎপাদন হ্রাস পায়। এর ফলে রাসূল (সাঃ) বললেনঃ

انتم اعلم بامور دنياكم-

অর্থঃ তোমরা তোমাদের পার্থিব বিষয়ে আমার চেয়ে ভাল জান। অর্থাৎ, এ ব্যাপারে আমার অনুসরণ করা তোমাদের উপর ওয়াজিব নয়।

খণ্ডন ঃ

এর উত্তর হল, রাসূল (সাঃ)-এর বাণীগুলোর দুটি দিক রয়েছে- (এক) সেসব বাণী যেগুলো তিনি রাসূল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। (দুই) সেসব বাণী যেগুলো তিনি ব্যক্তিগত পরামর্শরূপে দান করেছিলেন। انتم اعلم بامور دنياكم - এর সম্পর্ক দ্বিতীয় প্রকার বাণীর সাথে। আর আলোচ্য বিষয় হল, প্রথম প্রকার বাণীগুলো। অতএব, হাদীছ অস্বীকারকারীদের এই প্রমাণ ঠিক নয়।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, কোন্ বাণীটি কোন্ শ্রেণীর বা কোন্ প্রকারের সেটা জানা আমাদের জন্য কঠিন। অতএব, রাসূল (সাঃ)-এর উক্তি ও কর্মগুলোকে ব্যাপকরূপে প্রমাণ বলা যায় না।

এর উত্তর হল - রাসূল (সাঃ)-এর আসল দিক রাসূল হওয়ার। অতএব, রাসূল (সাঃ)-এর প্রতিটি কথা ও কর্মকে এই শ্রেণীভূক্ত ধরে প্রমাণ সাব্যস্ত করা হবে। কোন স্থানে যদি কোন প্রমাণ বা নিদর্শন এরূপ কায়েম হয় যে, এ বাণীটি ব্যক্তিগত পরামর্শের মর্যাদা রাখে এবং বাস্তব ঘটনাও এই যে, পুরো হাদীছ ভান্ডারে ব্যক্তিগত পরামর্শের উদাহরণ হাতে গোণা কয়েকটি এবং এরূপ স্থানে স্পষ্ট ভাষায় বিবরণ রয়েছে যে, এই ইরশাদটি শরঈ হুকুম নয়; বরং ব্যক্তিগত পরামর্শ। এই হাতে গোণা কয়েকটি স্থান ছাড়া বাকী সব বাণী রাসূল হিসেবে সম্পাদিত হয়েছে এবং সেগুলো সব প্রমাণ।

দ্বিতীয় মতবাদ খন্ডন
তথা সর্বযুগে হাদীছ দলীল- এ প্রসঙ্গ

এ মতবাদ অনুযায়ী হাদীছগুলো সাহাবীদের জন্য প্রমাণ ছিল। কিন্তু আমাদের জন্য প্রমাণ নয়। এ মতবাদটি এতই স্বতঃসিদ্ধ ভ্রান্ত যে, এর খন্ডনের জন্য বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন নেই। রাসূল (সাঃ)-এর রেসালাত সর্বযুগের জন্য। তিনি শুধু সাহাবীদের জন্যই রাসূল ছিলেন না। রাসূল (সাঃ)-এর রেসালাত ব্যাপক- এ সম্পর্কিত দলীলাদিই এ মতবাদ খণ্ডনের জন্য যথেষ্ট। এরূপ অনেকগুলো দলীল প্রথম খণ্ডে রাসূল (সাঃ) সম্বন্ধে কি আকীদা রাখতে হবে এ বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে পেশ করা হয়েছে। দেখুন ৮৩ পৃষ্ঠা।

তাছাড়া মৌলিক প্রশ্ন হল- কুরআন বোঝার জন্য রাসূলের শিক্ষার প্রয়োজন আছে কি না ? যদি না থাকে তাহলে রাসূল কেন প্রেরিত হয়েছেন ? আর যদি থাকে, তাহলে সাহাবীদের প্রয়োজন থাকলে আমাদের প্রয়োজন কেন থাকবে না ? আমাদের প্রয়োজনতো

আরও বেশী। সাহাবায়ে কেরা.ম স্বয়ং কুরআন অবতরণের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছেন! অবতরণের কারণ ও পরিবেশ সম্পর্কে তাঁরা পরিপূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন, যা থেকে আমরা বঞ্চিত।

তৃতীয় মতবাদ খন্ডন
তথা হাদীছ সংরক্ষিত হওয়া প্রসঙ্গ

এ বক্তব্য সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যে, হাদীছগুলো প্রমাণ ঠিকই কিন্তু আমাদের নিকট তা নির্ভরযোগ্য সূত্রে পৌঁছেনি বলে আমাদের উপর তা মান্য করার কোন দায় দায়িত্ব বর্তায় না। আমাদের নিকট হাদীছ নির্ভরযোগ্য সূত্রে পৌঁছেছে এ মর্মে কয়েকটি দলীল পেশ করা হল ঃ

১। আমাদের নিকট কুরআন সেসব মাধ্যমেই পৌঁছেছে, যেসব মাধ্যমে হাদীছ পৌঁছেছে। এবার যদি এসব সূত্র অনির্ভরযোগ্য হয়, তাহলে কুরআন মান্য করা থেকেও হাত গুটিয়ে নিতে হবে।

হাদীছ অস্বীকারকারীদের একটি ভ্রান্তি ও তার খণ্ডন ঃ

হাদীছ অস্বীকারকারীরা বলে থাকেন যে, কুরআনে কারীমের আয়াত, انا له لحافظون (আমি এর হেফাযতকারী। (সূরা হিজর ঃ ৯) বলে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কুরআনের হেফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। হাদীছ সম্পর্কে এরূপ কোন দায়িত্ব নেয়া হয়নি।

খণ্ডন ঃ

(১) এর প্রথম উত্তর হল, انا له لحافظون আয়াতটিও আমাদের নিকট সেসব মাধ্যমেই পৌঁছেছে যেগুলো আপনার উক্তি অনুযায়ী অনির্ভরযোগ্য। এর কি প্রমাণ যে, এ আয়াতটি কেউ নিজের পক্ষ থেকে সংযোজন করেনি।

(২) এতে কুরআনের হেফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছে। আর কুরআন উসূলিয়্যীনের সর্বসম্মতিক্রমে শব্দ এবং অর্থের নাম। এজন্য এ আয়াতটি শুধু কুরআনের শব্দের নয়; বরং এর অর্থের সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করাও জ্ঞাপন করে। আর কুরআনের অর্থের শিক্ষা দেয়া হয়েছে হাদীছে। তদুপরি উক্ত আয়াতে বর্ণিত শব্দটি শরী'আতের ব্যাপক জ্ঞান অর্থেও গ্রহণ করা যায়। তাহলে তার মধ্যে হাদীছ সংরক্ষণের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যেমন এরূপ ব্যাপক অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে ঃ فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون -

২। হদীছগুলো যেসব সূত্রে আমাদের নিকট পৌঁছেছে, সেসব সূত্র অনির্ভরযোগ্য হওয়ার ফতওয়া লাগিয়ে দেয়া অজ্ঞতার প্রমাণ। বস্তুতঃ হাদীছের হেফাযতের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা এক কথায় অনুপম। যার বিস্তারিত বিবরণ হাদীছের ইতিহাস দ্বারা জানা যেতে পারে।

৩। হাদীছের উপর আমল করা ওয়াজিব- এ কথা স্বীকার করে নিলে আপনা আপনি এ কথা স্বীকার করে নিতে হয় যে, হাদীছ কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে। অন্যথায় বলতে হবে, আল্লাহ তা'আলা হাদীছের উপর আমল করা তো ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন, কিন্তু এর সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা করেননি। যেন বান্দাদের উপর সাধ্যাতীত বিষয়ের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন। অথচ এ বিষয়টি لا يكلف الله نفسا الا وسعها -(আল্লাহ সাধ্যাতীত বিষয়ের দায়িত্ব অর্পন করেন না। -সূরা বাকারা ঃ ২৮৬)-এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

চতুর্থ মতবাদ খণ্ডন
তথা খবরে ওয়াহেদ হুজ্জাত হওয়া প্রসঙ্গ

খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের হাদীছগুলোকে অস্বীকারকারীরা বলেন যে, মুহাদ্দিছীনের স্পষ্ট বিবরণ অনুযায়ী খবরে ওয়াহেদগুলো সব যন্নী (ظنى) বা ধারণামূলক, ইয়াকীনী নয়। আর ধারণামূলক বিষয়ের অনুসরণ করা কুরআনে কারীমের স্পষ্ট বিবরণ অনুযায়ী নিষিদ্ধ। অতএব খবরে ওয়াহেদ গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغنى من الحق شيئا ـ

অর্থাৎ, তারা কেবল অনুমানের অনুসরণ করে, সত্যের বিপরীতে অনুমানের কোন মূল্য নেই। (সূরাঃ ৫৩-নাজম ঃ ২৮)

খণ্ডন ঃ

তাদের এই উক্তি প্রতারণা বৈ কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে, যন (ظن) শব্দটি আরবী ভাষায় তিনটি অর্থে ব্যবহৃত। (১) অনুমান-আন্দাজ, (২) প্রবল ধারণা, (৩) প্রমাণ নির্ভর নিশ্চিত জ্ঞান।

কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে যন (ظن) শব্দটি ইয়াকীন বা নিশ্চিত বিশ্বাসের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১। الذين يظنون انهم ملقوا ربهم (অর্থাৎ, খুশূ'-এর অধিকারী তারা যারা বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রতিপালকের সাথে নিশ্চিতভাবে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে। -সূরা বাকারা ঃ ৪৬)

২। قال الذين يظنون انهم ملقوا الله (অর্থাৎ, যাদের প্রত্যয় ছিল যে, আল্লাহ্‌র সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে তারা বলল ..... । -সূরা বাকারা ঃ ২৪৯)

৩। وظن داود انما فتناه (অর্থাৎ, দাঊদ [আঃ] বুঝতে পারলেন যে, আমি তাঁকে পরীক্ষা করেছি।- সূরা সাদ ঃ ২৪)

বস্তুতঃ হাদীছগুলোকে যে ظنى বলা হয়, এটা আন্দাজ-অনুমানের অর্থে নয়, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবল ধারণা আবার কোন কোন স্থানে নিশ্চিত বিশ্বাসের অর্থে ব্যবহৃত। আর কুরআনে যে ধারণার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে তদ্বারা উদ্দেশ্য অনুমান-আন্দাজ করা। অন্যথায় প্রবল ধারণাকে শরীআতের অগণিত মাসায়েলে প্রমাণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। বাস্তবতা হল, এটাকে প্রমাণ সাব্যস্ত করা ব্যতীত মানুষ একদিনও বেঁচে থাকতে পারবে না। কারণ, গোটা বিশ্ব এই প্রবল ধারণার উপরই প্রতিষ্ঠিত। হাফিজ ইব্‌নে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেছেন- খবরে ওয়াহেদগুলো (اخبار احاد) এই ধরনের যন বা ধারণাকে সৃষ্টি করে। অবশ্য কোন কোন খবরে ওয়াহেদ যেগুলো বিভিন্ন নিদর্শনাবলী (قرائن) দ্বারা সহায়তা ও শক্তিপ্রাপ্ত, সেগুলো প্রমাণ নির্ভর নিশ্চিত জ্ঞানের ফায়দাও দেয়। যেমন সেসব হাদীছ যেগুলো ধারা পরম্পরায় হাফিজ ও ইমামগণ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।[১]

---

১. মুনকিরীনে হাদীছ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য درس ترمذى , ترجمان السنة ও السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى থেকে গৃহীত। ॥

পারভেজী মতবাদ

"পারভেজী মতবাদ" বলতে বোঝানো হচ্ছে পারভেজ গোলাম আহমদ চৌধুরী কর্তৃক কুরআন ও হাদীছ অস্বীকার করার মতবাদ। জেনারেল আয়্যুব খানের আমলে সে তার প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা "তুলূয়ে ইসলাম" (طلوع اسلام)-এর মাধ্যমে তার চিন্তাধারা প্রচার করেছিল। সে কিছু পুস্তকও রচনা করেছিল। তার মতবাদ ও চিন্তাধারা প্রচার করার জন্য সারা দেশে "বায্‌মে তুলূয়ে ইসলাম" (بزم طلوع اسلام) নামে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। পাকিস্তানের তৎকালীন উলামায়ে কেরাম কুরআন-হাদীছের দলীল সহকারে তার মতবাদ খণ্ডন করেন। এবং এ মর্মে ফতওয়া প্রস্তুত করে দেশব্যাপী সর্বস্তরের উলামায়ে কেরাম থেকে তাতে দস্তখত গ্রহণ করা হয়। মক্কা মদীনার বিভিন্ন মাযহাবের উলামায়ে কেরামও এ ফতওয়ার সাথে একাত্মতা পোষণ করেন। এ ফতওয়ায় ব্যক্ত করা হয় যে, পারভেজ গোলাম আহমদ একজন মুল্‌হিদ ও যিন্দীক (কাফের) এবং তার চিন্তাধারা ও আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে বহু সংখ্যক কুফ্‌রী আকীদা-বিশ্বাসও রয়েছে। মুফতী ওলী হাছান খান সাহেব (রহঃ) এ ফতওয়ার উল্লেখসহ পারভেজ গোলাম আহমদের চিন্তাধারা ও আকীদা-বিশ্বাসের বিবরণ এবং কুরআন-হাদীছের দলীল সহকারে তার খণ্ডন পেশ করে একখানা পুস্তক রচনা করেন। পুস্তকখানার নাম "ফিতনায়ে ইন্‌কারে হাদীছ" (فتنۂ انکار حدیث)। এতে পারভেজ গোলাম আহমদের রচিত কিতাব-পত্রের উদ্ধৃতি সহকারেই তার চিন্তাধারা ও আকীদা-বিশ্বাসগুলো তুলে ধরা হয়েছে এবং কুরআন-হাদীছের দলীল সহকারে তার খণ্ডন পেশ করা হয়েছে। পারভেজ গোলাম আহমদের চিন্তাধারা ও আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে অবগতি এবং তার খণ্ডন জানার জন্য উক্ত পুস্তকখানাই যথেষ্ট। নিম্নে উক্ত পুস্তক থেকে সংক্ষিপ্তাকারে এতদসম্পর্কিত বিবরণ তুলে ধরা হল।

পারভেজ গোলাম আহমদের আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা

আল্লাহ ও রাসূল সম্পর্কে পারভেজ গোলাম আহমদ ঃ

১. "আল্লাহ" ও "রাসূল" বলতে বোঝায় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ বা শাসকমণ্ডলী (central Authority)।

খণ্ডনঃ

"আল্লাহ" ও "রাসূল" শব্দদ্বয়ের এরূপ অর্থ না অভিধান স্বীকার করে না পরিভাষা। যারা কুরআন-হাদীছের কোন শব্দের এরূপ অর্থগত বিকৃতি সাধন করে, তাদেরকে বলা হয় মুল্‌হিদ ও যিন্দীক। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

ان الذين يلحدون فى ايتنا لا يخفون علينا ـ

অর্থাৎ, যারা আমার আয়াতসমূহে ইল্‌হাদ (বিকৃতি সাধন) করে, তারা আমার অগোচর নয়। (সূরাঃ ৪১ হা,মীম-সাজদাঃ ৪০)

২. আল্লাহ্‌র কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। আল্লাহ বলতে বোঝায় ঐ সব উন্নত গুণাবলী যেগুলোকে মানুষ নিজের মধ্যে প্রতিবিম্বিত করতে চায়।

খণ্ডনঃ

পৃথিবীর কোন ধর্মই এটা স্বীকার করবে না। এটা কুফ্‌রী আকীদা। কুরআনে আল্লাহ্‌র পরিচয়ে বলা হয়েছে- তিনি এমন এক সত্তা, যিনি আসমান যমীন ইত্যাদি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এ সবকিছু আল্লাহ্‌র স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وهو الذى خلق السموت والارض -

অর্থাৎ, তিনি ঐ সত্তা যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরাঃ ৬-আনআমঃ ৪৭)

ولئن سألتهم من خلق السموت والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فانى يؤفكون -

অর্থাৎ, যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর কে সৃষ্টি করেছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং নিয়ন্ত্রিত করেছে সূর্য ও চন্দ্র ? তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ। তবুও কোথায় তারা ফিরে যায় ? (সূরাঃ ২৯-আন্‌আমঃ ৬১)

قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم -

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুর ইবাদত করবে যা তোমার কোন উপকার ও ক্ষতির মালিক নয় অথচ আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (সূরাঃ ৫-মায়িদাঃ ৭৬)

والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم -

অর্থাৎ, তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি অত্যন্ত দয়াময়, অতি দয়ালু। (সূরাঃ ২-বাকারাঃ ১৬৩)

৩. "আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য" বলতে বোঝায় কেন্দ্রীয় শাসকমণ্ডলীর আনুগত্য করা। আর "উলূল আম্‌র" (اولو الامر) অর্থ হল অধীনস্ত অফিসারগণ। কোন বিষয়ে মতবিরোধ হলে আল্লাহ ও রাসূলের নিকট গমনের কুরআনী নির্দেশের অর্থ হল অধীনস্ত অফিসারদের সাথে বিরোধ না করে মীমাংসার জন্য কেন্দ্রীয় শাসকমণ্ডলীর কাছে রুজূ করা।[১]

খণ্ডনঃ

এটাও অর্থগত বিকৃতি, যা ইল্‌হাদ ও যান্দাকাহ। "আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য" অস্বীকারকারীকে কাফের বলা হয়। কেন্দ্রীয় শাসনের অস্বীকারকারীকেও কি কাফের বলা হবে? ইরশাদ হয়েছে ঃ

واطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكفرين -

অর্থাৎ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং রাসূলের। তবুও তারা ফিরে গেলে আল্লাহ এরূপ কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরাঃ ৩-আলু ইমরান ঃ ৩২)

---

১. এখানে নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তুর দিকে ইংগিত করা হয়েছে ঃ

اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم فى شئ فردوه الى الله والرسول . الاية -(সূরাঃ ৪-নিসাঃ ৫৯) ॥

৪. "খতমে নবুওয়াত-এর অর্থ হল এখন মানুষকে তাদের যাবতীয় বিষয়ের ফয়সালা নিজেদেরই করতে হবে।" এ কথার মাধ্যমে রাসূল (সাঃ)-এর নবুওয়াতের ব্যাপকতা ও খতমে নবুওয়াতকে অস্বীকার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে রেসালাতকেও অস্বীকার করা হয়েছে।

খণ্ডনঃ

রাসূল (সাঃ)-এর নবুওয়াতের ব্যাপকতা ও খতমে নবুওয়াতের আকীদা কুরআন ও মুতাওয়াতির রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত। এ আকীদা অস্বীকারকারী উম্মতের সর্বসম্মত মতানুসারে কাফের।

ঈমান সম্পর্কিত বিষয়ে পারভেজ গোলাম আহমদ ঃ

১. "আখেরাত" বলতে বোঝায় ভবিষ্যত।
২. "জান্নাত" ও "জাহান্নাম" কোন বাস্তব স্থানের নাম নয় বরং তা হল মানুষের ব্যক্তি সত্তাগত অবস্থা।
৩. "ফেরেশতা" দ্বারা উদ্দেশ্য হল আত্মিক চেতনা বা প্রাকৃতিক শক্তি। ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হল মানুষের সামনে এই শক্তিগুলির নত থাকা চাই।
৪. "জিব্রাঈল" বলতে বোঝায় কোন কিছুর স্বরূপ বিকশিত হওয়া।[১]

খণ্ডনঃ

আখেরাত, জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশতা, জিব্রাঈল সম্পর্কিত ধারণা জরূরিয়াতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। এসব ব্যাপারে কোন রূপ দলীল ছাড়া জাহিরী অর্থ থেকে সরে যাওয়া যায় না। এসব ব্যাপারে প্রসিদ্ধ জাহিরী অর্থ ভিন্ন অন্য কোন রূপ ব্যাখ্যা দাতাদেরকে মুলহিদ ও যিন্দীক বলা হয়। শরহে আকাইদ গ্রন্থে এ কথাই বলা হয়েছে ঃ

والنصوص من الكتاب والسنة تحمل على ظاهرها ما لم يصرف عنها دليل قطعى ..... والعدول عنها اى عن الظواهر الى معان يدعيها اهل الباطن وهم الملاحدة لادعائهم ان النصوص ليست على ظاهرها بل لها معان باطنية الخ - (شرح عقائد)

শামীতে বলা হয়েছে ঃ

وكذالك نكفر من انكر الجنة والنار نفسهما او محلهما - (رد المحتار جـ٤/)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি জান্নাত জাহান্নামকে বা এতদুভয়ের স্থানকে অস্বীকার করবে, তাকে কাফের আখ্যায়িত করা হবে।

---

১. "জিব্রাঈল"-এর স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রমাণ কুরআনেও বিধৃত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك مصدقا لما بين يديه . الاية -

অর্থাৎ, কেউ জিব্রাঈলের শত্রু হলে সে জেনে রাখুক সেতো আল্লাহ্‌র নির্দেশে তোমার হৃদয়ে কুরআন পৌঁছে দিয়েছে। (সূরা ঃ ২-বাকারা ঃ ৯৭) ॥

মনে রাখতে হবে কুরআনের শব্দ যেমন সংরক্ষিত তেমনি তার অর্থও সংরক্ষিত। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحفظون -

অর্থাৎ, আমি এই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই তার হেফাযতকারী। (সূরাঃ হিজ্‌রঃ ৯)

৫. "মে'রাজ" একটি স্বপ্নের ঘটনা কিংবা হিজরতের কাহিনী এবং "মসজিদে আকসা" দ্বারা উদ্দেশ্য মসজিদে নববী।

খণ্ডনঃ

মে'রাজ সম্পর্কে জমহুরের আকীদা হল মে'রাজ স্বশরীরে হয়েছে। মসজিদে হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত গমন কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। এর অস্বীকারকারী কাফের। আর পৃথিবী থেকে সপ্তম আসমানের উপর পর্যন্ত গমন মাশহুর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। এটা অস্বীকার কারী হাফেজ ইব্‌নে কাছীরের নিম্নোক্ত বর্ণনা মতে মুলহিদ ও যিন্দীক। তিনি বলেন ঃ

والمعراج لرسول الله ﷺ فى اليقظة بشخصه الى السماء ثم الى ما شاء الله من العلى - (شرح عقائد)

অর্থাৎ, রাসূল (সাঃ)-এর মে'রাজ জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে আকাশের দিকে তারপর উর্দ্ধজগতে যতদূর আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয়েছে।

৬. ঈমান সম্পর্কিত বিষয়ের মধ্যে "তাকদীর"-এর আকীদা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে পারস্যবাসী অগ্নিপূজারীদের অনুসরণে।

খণ্ডনঃ

তাকদীরের আকীদা আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের একটি বুনিয়াদী আকীদা। এর অস্বীকার কারী গোমরাহ ও বিভ্রান্ত। অগ্নিপূজারীদের থেকে এ আকীদা গ্রহণের কিচ্ছা ডাহা অবাস্তব। তারাতো তাক্‌দীরকেই অবিশ্বাস করে। যেমন নিম্নোক্ত হাদীছ থেকে বোঝা যায় ঃ

القدرية مجوس هذه الامة - (احمد وابو داود عن ابن عمر)

অর্থাৎ, কাদরিয়াগণ এই উম্মতের মাজূসী বা অগ্নিপূজারী।

৭. আদম (আঃ)-এর কোন ব্যক্তি অস্তিত্ব ছিল না। কুরআনে কারীমে যে আদমের উল্লেখ এসেছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য মানব জাতি (نوع انسانى)।

খণ্ডনঃ

হযরত আদম (আঃ) সম্পর্কে এরূপ আকীদা রাখা কুফ্‌রী। শরহে আকাইদ গ্রন্থে আছে ঃ

اول الانبياء ادم واخرهم محمد عليه السلام ، اما نبوة ادم عليه السلام فبالكتاب الدال على انه قد امر و نهى ..... وكذا السنة والاجماع فانكار نبوته على ما نقل عن البعض يكون كفرا -

অর্থাৎ, সর্বপ্রথম নবী আদম আর সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)। আদম (আঃ)-এর নবুওয়াত কুরআন দ্বারা প্রমাণিত যে, তিনি আদেশ নিষেধ করতেন। এমনিভাবে হাদীছ এবং ইজ্‌মা দ্বারাও প্রমাণিত। তাঁর নবুওয়াতকে অস্বীকার করা কতিপয় মনীষীর মতে কুফ্‌রী।

৮. আদম ও হাওয়া থেকে মানব বংশের বিস্তার ঘটেনি; বরং ডারউইনের "বিবর্তন বাদ" মতবাদ অনুসারে মানব বংশের বিস্তার ঘটেছে।

খণ্ডনঃ

নিঃসন্দেহে এটা কুফ্‌রী আকীদা। কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, আদম ও হাওয়া থেকে মানব বংশের বিস্তৃতি ঘটেছে। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء .

অর্থাৎ, হে মানুষ তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি এক ব্যক্তি হতেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তার থেকে তার সংগিনী সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। (সূরাঃ ৪-নিসাঃ ১) "বিবর্তনবাদ" সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৬৩৩-৬৩৭ পৃঃ।

৯. ছওয়াবের নিয়ত এবং আমল ওজন হওয়ার আকীদা রাখা হল আফিম বিশেষ। মুসলমানদেরকে সে আফিম পান করানো হয়েছে।

খণ্ডনঃ

এ দুটো আকীদা সরাসরি কুরআন বিরোধী, কুফ্‌রী। যেমন কুরআনের কয়েকটি আয়াত ঃ

(১) الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بايتنا يظلمون -

অর্থাৎ, সেদিনকার ওজন সত্য। সেমতে যাদের নেকীর পাল্লা ভারী হবে, তারা সফলকাম। আর যাদের নেকীর পাল্লা হালকা হবে, তারা এমন লোক যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে কারণ তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি অবিচার করত। (সূরাঃ ৭-আ'রাফ ঃ ৮)

(২) ومن يرد ثواب الاخرة نؤته منها -

অর্থাৎ, আর যে পরকালের পুরস্কার কামনা করে তাকে দিব তার কিছু পুরস্কার। (সূরা ঃ ৩-আলু ইমরান ঃ ১৪৫)

(৩) من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخرة . الاية -

অর্থাৎ, কেউ ইহকালের পুরস্কার চাইলে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ্‌র নিকট ইহকাল ও পরকালের পুরস্কার রয়েছে। (সূরাঃ ৪-নিসাঃ ১৩৪)

১০. "ঈছালে ছওয়াব" -এর আকীদা আমলের প্রতিদান পাওয়ার আকীদার পরিপন্থী।

খণ্ডন ঃ

ঈছালে ছওয়াবের আকীদা আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত আকীদা। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নিশ্চিতভাবে এ আকীদাকে প্রমাণ করে ঃ

(১) وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا -

অর্থাৎ, তুমি বল হে আমার প্রতিপালক ! তুমি তাদের (মাতা-পিতার) প্রতি রহম কর যেমন তাঁরা বাল্যকালে আমাকে লালন-পালন করেছিল। (সূরাঃ ১৭-বানী ইসরাঈলঃ ২৪)

(২) والملائكة يسبحون ربهم ويستغفرون للذين امنوا -

অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ তাদের প্রতিপালকের তাসবীহ পাঠ করে এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। (সূরাঃ ৪০-মু'মিনঃ ৭)

১১. কুরআনে কারীম ব্যতীত রাসূল (সাঃ) কে কোন মু'জিযা দেয়া হয়নি।

খণ্ডন ঃ

এটাও কুফ্‌রী আকীদা। রাসূল (সাঃ) এর দ্বারা চন্দ্র দিখণ্ডিত হওয়া, অল্প পানি অনেকের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাওয়া, পাথর নবী (সাঃ)কে সালাম করা ইত্যাদি বিষয়গুলো মুতাওয়াতির রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত ।

قال ابن ابى الشريف : فالقدر المشترک بينها هو ظهور الخارق على يديه متواتر بلا شک - (المسامرة)

কুরআন সম্পর্কে পারভেজ গোলাম আহমদ ঃ

১. মুহাম্মাদী শরী'আত ছিল রাসূল (সাঃ)-এর যুগের জন্য। সর্বকালের জন্য নয়। তার ওফাতের পর প্রত্যেক যুগে সেই আইন চলবে যা তখনকার কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ, শাসক মণ্ডলী ও মজলিসে শুরা রচনা ও বিধিবদ্ধ করে নিবেন।

২. কুরআনের মীরাছ আইন, লেনদেন, সদ্‌কা খায়রাত সম্পর্কিত বিধি-বিধান ইত্যাদি ছিল অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য।

খণ্ডন ঃ

এখানে শরী'আতকে রহিত বলা হয়েছে এবং কুরআনের শাশ্বত্ব ও খতমে নবুওয়াতকে অস্বীকার করা হয়েছে। এটা স্পষ্টতঃ কুফ্‌রী। রাসূল (সাঃ) যখন শেষ নবী, তখন তার আনীত শরীআতও কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য শরী'আত। পরবর্তী কোন নবীর আগমন ব্যতীত পূর্ববর্তী নবীর শরীআত মান্‌সূখ বা রহিত হয় না।

হাদীছ সম্পর্কে পারভেজ গোলাম আহমদ ঃ

১. যে হাদীছ মুসলমানদের মাযহাব, তা অনারবদের কারসাজী এবং মিথ্যা।

২.কোনক্রমেই রাসূলের এই অধিকার নেই যে, তিনি মানুষ থেকে নিজের আনুগত্য করাবেন। রাসূলের পজিশন হল তিনি শুধু মানুষ পর্যন্ত আইন পৌঁছে দিবেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন তার আনুগত্য করা হত তিনি "কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধিকারী" এ হিসেবে। তার ইন্তেকালের পর তার আনুগত্যের হুকুম বহাল নেই। কেননা "আনুগত্য"-এর অর্থ হল কোন জীবিত ব্যক্তিকে মান্য করা।

খণ্ডন ঃ

এখানে হাদীছ হুজ্জাত হওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে। হাদীছকে অস্বীকার করা কুফ্‌রী। হাদীছকে অস্বীকার করা রাসূল (সাঃ)-এর শাশ্বত আনুগত্যকে অস্বীকার করা।[১]

৩. পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে পারভেজ বলেন "আল্লাহ" ও "রাসূল" বলতে বোঝায় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ বা শাসক মণ্ডলী (central Authority)। আর "আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য" বলতে বোঝায় কেন্দ্রীয় শাসকমণ্ডলীর আনুগত্য করা। এর দ্বারাও পারভেজ সাহেব হাদীছ হুজ্জাত হওয়াকে অস্বীকার করেছেন।

খণ্ডন ঃ

এর খণ্ডন পুর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। (দেখুন পৃঃ ৩৪৭)

ইসলামের পঞ্চ বুনিয়াদ সম্পর্কে পারভেজ গোলাম আহমদ ঃ

১. নামায হল পূজা, রোযা হল ব্রত, হজ্ব হল যাত্রা। আল্লাহ্‌র হুকুম হেতু এসব ইবাদত পালন করা হয়। নতুবা উপকারিতার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। যুক্তির সাথেও এর কোন সম্পর্ক নেই।

খণ্ডন ঃ

এখানে নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি ইসলামের আরকান ও ইবাদত নিয়ে উপহাস করা হয়েছে। এগুলি নিয়ে উপহাস করা কুফ্‌রী। কেননা এগুলি অকাট্য দলীলাদি (قطعيات) দ্বারা প্রমাণিত, অতএব এগুলি নিয়ে উপহাস করা মূলতঃ সেসব অকাট্য দলীলাদি নিয়েই উপহাস করা। কুরআনে কারীমে এরূপ লোকদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে ঃ

اباللہ واياته ورسوله كنتم تستهزؤن -

অর্থাৎ, তবে কি তোমরা আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূলকে নিয়ে উপহাস কর ? (সূরাঃ ৯-তাওবাঃ ৬৫)

২. নামায অগ্নি পূজারীদের থেকে গৃহীত। কুরআনে কারীম নামায পড়ার নির্দেশ দেয়নি; বরং নামায কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছে। আর নামায কায়েম করার অর্থ হল সমাজকে ঐ বুনিয়াদের উপর দাঁড় করানো মানব জাতির প্রতিপালন (رب العالمين) -এর ইমারত যে ভিত্তির উপরে দাঁড় হয়।

খণ্ডন ঃ

নামাযের ব্যাখ্যা কি হবে তা স্বয়ং রাসূল (সাঃ) নিজ আমল দ্বারা করে দেখিয়ে গেছেন। এবং ইরশাদ করেছেন ঃ

صلوا كما رايتموني اصلى -

অর্থাৎ, তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখ সেভাবে নামায পড়।

অতএব এরূপ জরূরিয়াতে দ্বীনের ব্যাপারে অন্য কোন রূপ ব্যাখ্যা দেয়া এটাকে অস্বীকার করার নামান্তর। আর জরূরিয়াতে দ্বীনকে অস্বীকার করা কুফ্‌রী।

---

১. হাদীছ হুজ্জাত হওয়া সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন ৩৩৮-৩৪৬ পৃষ্ঠা। ॥

وان صفات الصلوة المذكورة المشهورة المنصوص عليها فى القرآن وهى التى فعلها النبى ﷺ وشرح بذالک وابان حدودها واوقاتها ..... ولا يرتاب بذلک بعد والمرتاب فى ذالک المعلوم من الدين بالضرورة والمنكر لذلک بعد البحث عنه و صحبة المسلمين كافر بالاتفاق - (نسيم الرياض جـ٤/)

অর্থাৎ, নামাযের উল্লেখিত অবস্থা যা প্রসিদ্ধ এবং যে ব্যাপারে কুরআনে স্পষ্ট ভাষ্য বিদ্যমান- সেটাই নবী করীম (সাঃ) করেছেন ও সে ব্যাপারে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন এবং তার সীমানা ও সময় নির্ধারিত করে দিয়ে গেছেন.... এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। এটা জরূরিয়াতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। এটা জানার পরও কেউ তা অস্বীকার করলে মুসলমানদের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের।

৩. রাসূলুল্লাহ্‌র যুগে নামাযের উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়ার জন্য দুই ওয়াক্ত (ফজর এবং ইশা) নির্ধারিত ছিল।

খণ্ডন ঃ

এটাও ডাহা মিথ্যা কথা। রাসূল (সাঃ)-এর যুগে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়ই নির্ধারিত ছিল। নামায পাঁচ ওয়াক্ত হওয়া সম্পর্কিত রেওয়ায়েত মুতাওয়াতির পর্যায়ের। আর মুতাওয়াতিরকে অস্বীকার করা কুফ্‌রী।

قال السرخسى فى اصوله بعد بيان تعريف المتواتر : نحو اعداد الركعات واعداد الصلوة ومقادير الزكاة والديات وما اشبه ذالک - (المجلد الاول)

অর্থাৎ, সারাখ্‌সী তার اصول কিতাবে মুতাওয়াতির-এর সংজ্ঞা বর্ণনা করার পর বলেন ঃ যেমন রাকআত সমূহের সংখ্যা, নামাযের সংখ্যা, যাকাত ও দিয়াতের পরিমাণ ইত্যাদি।

৪. কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ ও শাসকমণ্ডলী নিজেদের যুগের কোন চাহিদা অনুসারে নামাযের কোন অংশ বিশেষে রদবদল করতে পারেন।

খণ্ডন ঃ

এ বক্তব্যটা তার আল্লাহ ও রাসূল সম্পর্কে অপব্যাখ্যার ভিত্তিতে গঠিত। এ সম্পর্কে পূর্বে খণ্ডন পেশ করা হয়েছে। এরূপ বক্তব্য প্রদানকারী মুল্‌হিদ, যিন্দীক ও কাফের।

৫ "সদকায়ে ফিত্‌র" হল ডাক টিকিট। "রোযা" রূপ খামের উপর এই ডাক টিকিট লাগিয়ে ডাক বাক্সে ছেড়ে দেয়া হয়। যাতে রোযা প্রাপক পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

খণ্ডন ঃ

সদকায়ে ফিত্‌র ওয়াজিব। এ ব্যাপারে রাসূল (সাঃ)-এর শিক্ষা অত্যন্ত স্পষ্ট। রাসূল (সাঃ)-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সেই শিক্ষা অনুযায়ী মুসলমানগণ আমল করে আসছেন। ইসলামের এরূপ কোন বিষয় নিয়ে এভাবে উপহাস করা কুফ্‌রী।

৬. "হজ্ব" কোন ইবাদত নয়। বরং মুসলিম বিশ্বের একটা জাতীয় কনফারেন্স।

খণ্ডন ঃ

হজ্জ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং ইসলামের একটি রুকন। সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করাকে কুরআনে কারীমে কুফ্‌রী আখ্যায়িত করা হয়েছে। হজ্জ ইবাদত না হলে এরূপ করার কোন অর্থ ছিল না। ইরশাদ হয়েছে ঃ

ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العلمين -

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ সব লোকদের উপর বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করা কর্তব্য (ফরয) যারা সেখানে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। আর (কেউ হজ্জকে অস্বীকার করে) কুফ্‌রী করলে জেনে রাখুক আল্লাহ জগৎবাসীর মুখাপেক্ষী নন। (সূরাঃ ৪-নিসাঃ ৯৭)

৭. যাকাত বলতে বোঝায় ঐ ট্যাক্স, যা ইসলামী হুকুমত কর্তৃক মুসলমানদের উপর ধার্য করা হয়। এই ট্যাক্স-এর পরিমাণ নির্দিষ্ট নয়। খোলাফায়ে রাশেদার যুগে তখনকার প্রয়োজন অনুসারে শতকরা আড়াইভাগ ধার্য করা সংগত বিবেচিত হয়ে থাকলে সেটা তখনকার বিষয় ছিল। এখন ইসলামী হুকুমত যদি প্রয়োজন অনুসারে শতকরা বিশ ভাগ নির্ধারণ করতে চায় তাহলে সেটাও যাকাতের শরী'আত সম্মত পরিমাণ বলে স্বীকৃতি পাবে।

খণ্ডন ঃ

তার এ বক্তব্য নির্জলা মিথ্যা ও স্পষ্টতঃ কুফ্‌রী। যাকাত ইসলামের রুকন এবং গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কুরআনে কারীম বহু স্থানে তার নির্দেশ দিয়েছে এবং রাসূল (সাঃ) তার সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। কখন যাকাত ফরয হয়, কার উপর ফরয হয়, যাকাতের নিসাব কি সব বিস্তারিত বলে গেছেন। খোলাফায়ে রাশেদা তদনুযায়ী আমল করেছেন। মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত এরূপ একটি বিষয়কে ট্যাক্স আখ্যায়িত করা এবং তার নির্ধারিত পরিমাণকে অস্বীকার করা ইলহাদ ও যিন্দীকদের কাজ।

৮. বর্তমান যুগে যাকাতের প্রশ্নই ওঠে না। এক দিকে ট্যাক্স, অন্য দিকে যাকাত। এটা হল কায়সার আর খোদার অনৈসলামিক বিচ্ছেদ টানা। যখন কুরআনী বিধান চূড়ান্ত আকারে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন যাকাতের নির্দেশ খতম হয়ে যাবে।

খণ্ডন ঃ

এটাও ইল্‌হাদ ও কুফ্‌রী কথা। যাকাতের হুকুম কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য। এটাকে অস্বীকার করা কুরআনের শাশ্বত্বকেই অস্বীকার করা।

আরও কয়েকটি বিধান সম্পর্কে পারভেজ গোলাম আহমদ ঃ

১. হজ্বের স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও "কুরবানী"-এর নির্দেশ নেই। হজ্বের প্রাক্কালে কুরবানীর নির্দেশ দেয়া হয়েছে কনফারেন্সে আগত সদস্যদের "রেশন" প্রস্তুত করার জন্য। এতদভিন্ন কুরবানীর অন্য কোন পজিশন নেই।

খণ্ডন ঃ

কুরবানীকে কুরআন শরীফে نسكى (আমার কুরবানী) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, যা স্পষ্টতঃই পারভেজ সাহেবের বক্তব্যকে খণ্ডন করছে। রাসূল (সাঃ) হজ্জের বাইরে মদীনাতেও সর্বদা কুরবানী করেছেন এবং মুসলমানদের কুরবানী করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এটা খালেস দ্বীনী বিষয় এতে কোন মতবিরোধ নেই। কুরবানী-র মৌলিকত্বকে অস্বীকার করা কুফ্‌রী। হাফেজ ইব্‌নে হাজার ও ইব্‌নে নুজায়ম একথা ব্যক্ত করে বলেছেন ঃ

قال الحافظ فى فتح البارى : ولا خلاف فى كونها من شرائع الدين - (جـ/١٠)

وقال ابن نجيم فى بحر الرائق : ويكفر بانكار اصل الوتر والاضحية - (جـ/٥)

২. মাত্র চারটা জিনিস হারাম। ১. মৃত জানোয়ার, ২. প্রবাহিত রক্ত, ৩. শূকরের মাংস এবং ৪. গায়রুল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত বস্তু। এতদভিন্ন হালাল-হারামের যে দীর্ঘ তালিকা রয়েছে তা মানুষের মনগড়া বিবরণ।

খণ্ডন ঃ

এটা স্পষ্টতঃ কুফ্‌রী দাবী। এর দ্বারা অন্যান্য সমস্ত হারামকে হালাল আখ্যায়িত করা হয়ে যায়।

দ্বীন-ইসলামের শাশ্বত্ব ও সর্বদা হকপন্থী লোকের অস্তিত্ব থাকা প্রসঙ্গে পারভেজ সাহেবের আকীদা ঃ

১. "দ্বীন"-এর সবকিছুতে বিকৃতি সাধিত হয়েছে।

খণ্ডন ঃ

এটা স্পষ্টতঃ কুফ্‌রী কথা। দ্বীন সর্বদা সংরক্ষিত থাকবে-এ ব্যাপারে কুরআনের স্পষ্ট ভাষ্য রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون -

অর্থাৎ, আমি এই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্যই আমি তার সংরক্ষণকারী। (সূরাঃ ১৫-হিজ্‌রঃ ৯)

২. কুরআনের আলোকে সমস্ত মুসলমান কাফের হয়ে গিয়েছে। সাম্প্রতিক কালের ব্রহ্ম সমাজ-ই একমাত্র খাঁটি মুসলমান।

খণ্ডন ঃ

কোন মুসলমানকে কাফের বলা কুফ্‌রী। তদ্রূপ ব্রহ্ম সমাজীকে খাঁটি মুসলমান আখ্যায়িত করা তথা অমুসলিমকে মুসলিম আখ্যায়িত করাও কুফ্‌রী। এর দ্বারা ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মকে সঠিক বলে আখ্যায়িত করা হয়। অথচ কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من الخسرين -

অর্থাৎ, কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম তালাশ করলে আদৌ তার থেকে তা কবূল করা হবে না এবং পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত। (সূরাঃ ৩-আলু ইমরানঃ ৮৫)

চকড়ালবী ফিরকা

(فرقۂ چکڑالوی)

পাঞ্জাবে চকড়ালবী ফিরকার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ (০০০-১৩৩৭ হিঃ) চকড়ালবী। সে লাহোরের বাসিন্দা ছিল। আব্দুল্লাহ চকড়ালবী-এর দিকে সম্পৃক্ত হয়েই "চকড়ালবী" নামে এই দলের পরিচিতি গড়ে উঠেছে। তারা নিজেদেরকে "আহ্‌লুয যিক্‌র" নামে আবার "আহ্‌লে কুরআন" নামেও পরিচয় দিয়ে থাকে। "আহ্‌লে কুরআন" (কুরআন অনুসারী) বলে নিজেদেরকে পরিচয় দেয়ার মাধ্যমেই তারা ব্যক্ত করেছে যে, তারা হাদীছ অস্বীকারকারী (মুনকিরীনে হাদীছ)দের অন্তর্ভুক্ত। স্বয়ং এই দলের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল্লাহ চকড়ালবী লিখিত برهان الفرقان على صلوة القران - গ্রন্থে বর্ণিত এই দলের আকীদাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. কুরআন কর্তৃক শিখানো নামায পড়াই ফরয। এছাড়া অন্য কোন রকমের নামায পড়া কুফ্‌র ও শির্‌ক। (পৃঃ ৫)

২. আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রাসূলের নিকট ওহী যোগে একমাত্র কুরআনই অবতীর্ণ হয়েছে। এতদ্ব্যতীত শেষ নবী-এর উপর আর কোন কিছু ওহী যোগে আদৌ অবতীর্ণ হয়নি। (পৃঃ ৯)

৩. আসমানী কিতাব ব্যতীত অন্য কোন কিছুর ভিত্তিতে কোন ধর্মীয় কাজ করা শির্‌ক ও কুফ্‌র। এরূপ কেউ করলে সে মুশরিক হয়ে যায়। (পৃঃ ১২)

৪. যারা বলে মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সালামুন আলাইহি) আল্লাহ্‌র কিতাবের বাইরেও বিধি-বিধান বলেছেন, তারা প্রকৃতপক্ষে খাতামুন্নাবী (সালামুন আলাইহি)কে গালি দেয়। (পৃঃ ১৫)

৫. আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারও হুকুম মান্য করাও আমলকে নষ্ট করে দেয়া। এটা অনন্তকাল জাহান্নামের শাস্তি পাওয়ার কারণ। আফসূস সম্প্রতি অধিকাংশ লোকই এরূপ আমলগত শির্‌ক (شرك فى العمل) এ লিপ্ত। (পৃঃ ১৬)

৬. কিন্তু এই আমলগত শির্‌ক এমনভাবে মানুষের স্বভাব মজ্জায় মিশ্রিত হয়ে পড়েছে যে, এখন এটাকে তারা দ্বীনী বিষয় মনে করছে এবং এটা যে একটা গর্হিত কর্ম সেই বোধটুকুও জাগ্রত হচ্ছে না; বরং এটাকে যারা গর্হিত মনে করে তাদেরকে খারাপ বলে ভাবছে। তারা প্রকাশ্যে জোর গলায় বলছে এবং নিজেদের বক্তব্যের স্বপক্ষে কুরআন থেকে দলীলও পেশ করছে যে, আল্লাহর হুকুমের ন্যায় রাসূলুল্লাহ (সালামুন আলাইহি) -এর হুকুম মান্য করাও ফরয। অনন্তর বিস্ময়ের পর বিস্ময় হল এমন মুশরিক সুলভ ধ্যান-ধারণাকে তারা পরম মূলনীতি বানিয়ে বসেছে। (পৃঃ ১৭)

৭. প্রকাশ থাকে যে, কুরআনের আয়াত ঃ الرحمن علم القران -- এর বক্তব্য অনুযায়ী যা শিক্ষা দেয়ার আল্লাহ্‌ই কুরআনে কারীমেই শিক্ষা দিয়েছেন, অন্য কোন পদ্ধতিতে তিনি শিক্ষা দেননি। (পৃঃ ১৯)

৮. যে রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা কুরআন মাজীদেই আছে। واجب الاتباع অর্থাৎ, যার অনুসরণ ওয়াজিব, তা দুই জিনিস নয় বরং একই জিনিস।

কুরআনে মাজীদ এবং মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সালামুন আলাইহি) নিঃসন্দেহে দুটো আলাদা আলাদা জিনিস, তবে রাসূল (সাঃ)-এর আনুগত্যের হুকুম কুরআনে কোথাও দেয়া হয়নি। (পৃঃ ২১)

৯. আমি অন্তর থেকে মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্‌কে রাসূল বলে জানি, তবে যেসব আয়াতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ-এর আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেখানে "রাসূলুল্লাহ" বলে শুধু কুরআনে মাজীদকেই বোঝানো হয়েছে। (পৃঃ ২১)

১০.কিন্তু মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ শুধু তাঁর যুগের লোকদের কাছেই আবির্ভূত হয়েছিলেন, আজকালকার কোন লোকের কাছে তিনি আগমন করেননি। যদি কোন ব্যক্তির কাছে তাঁর আগমন ঘটে থাকে তিনি বলতে পারেন। কুরআনের আয়াত ঃ

يايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول -

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ দ্বারা মুহাম্মাদ ও তাঁর সত্তাকে বোঝানো হয়নি অন্যথায় অর্থ বিকৃত হয়ে যায়। তাই রাসূলুল্লাহ দ্বারা কুরআনই উদ্দেশ্য। (পৃঃ ৩০)

১১. প্রকাশ থাকে যে, কুরআনের আয়াত ঃ

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى -

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। (সূরাঃ ৩-আলুইমরানঃ ৩১)

এখানে যে আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা উদ্দেশ্য হল যেভাবে আমি কুরআনের উপর আমল করি তোমরাও সেভাবে আমল কর। কোন মু'মিন বা রাসূলের সব কাজ আনুগত্য করা ওয়াজিব - এমন অর্থ নয়। (পৃঃ ৪২)

১২. প্রকাশ থাকে যে, কুরআনের মধ্যে জুনূবী (جنبى) অর্থাৎ, যে ব্যক্তির উপর গোসল ওয়াজিব-এমন ব্যক্তিকে নামায পড়তেই নিষেধ করা হয়েছে - ولا تقربوا الصلوة (অর্থাৎ, তোমরা নামাযের কাছেও যেও না) আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু কুরআনে মাজীদের কোথাও জুনুবি ব্যক্তি কুরআন মাজীদ স্পর্শ করতে পারবে না -এমন কথা বলা হয়নি। (পৃঃ ৫৮)

১৩. মেসওয়াকের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন ঃ যদি মেনে নেয়া হয় যে, রাসূল (সাঃ) এ প্রসঙ্গে বলেছেনও কিন্তু সেটা ওহীয়ে খফী (وحى خفى) যোগে নয় বরং তিনি মানবীয় যুক্তি থেকে বলেছেন। (পৃঃ ৬০)

১৪. يايها الذين امنوا اذا قمتم الاية - (সূরাঃ ৫-মায়িদাঃ ৬)

উপরোক্ত আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী নিঃসন্দেহে পা ধোয়া ফরয।[১] পায়ে মাসেহ করা জায়েয নয়, চাই পা খোলা থাকুক বা পায়ের উপর কোন পট্টি বা মোজা থাকুক। যে সমস্ত হাদীছে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সালামুন আলাইহি) মোজা বা পট্টির উপর

১.আয়াতের এক কেরাআত অনুসারে আয়াতের দ্বারাই মোজা পরিহিত অবস্থায় মাসেহ করা প্রমাণিত। তদুপরি মুতাওয়াতির হাদীছ দ্বারা মাসেহের বিষয়টি প্রমাণিত। ॥

মাসেহ করেছেন এবং অন্যদেরকে এরূপ করার অনুমতি দিয়েছেন সেসব হাদীছ বাতিল এবং রাসূলুল্লাহ-এর উপর মিথ্যা বলার শামিল। (পৃঃ ৬৪)

১৫.কুরআন দ্বারা একথা আদৌ প্রমাণিত নয় যে, যৌনাঙ্গ স্পর্শ করলে, নাক দিয়ে রক্ত ঝরলে, আগুনে পাকানো কোন বস্তু আহার করলে কিংবা উটের গোশত ভক্ষণ করলে, কিংবা বমি করলে এসব দ্বারা উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। যে সমস্ত হাদীছে এ সমস্ত জিনিস দ্বারা উযূ ভঙ্গ হয়ে যায় বলে বলা হয়েছে সেগুলো বেহুদা এবং প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (পৃঃ ৮২)

এছাড়াও চকড়ালবী ফিরকা-র আরও কিছু আকীদা দলীলসহ নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

১. আসমানী কিতাব সমূহের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, সব কিতাবই সমমর্যাদার। কারণ যে সমস্ত বীজ আদি থেকেই বপণ করা হয়েছে অনন্তকাল পর্যন্ত সেটা থাকবে তাতে কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। তদুপরি এ সমস্ত কিতাব একই আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত। কাজেই সব কিতাব সমান মর্যাদার হবে। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ - لا تبديل لخلق الله অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই।

২. নবীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সব নবী একই স্তরের এবং একই মর্যাদার। আর নবুওয়াতের ধারা কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। দলীল কুরআনের আয়াত ঃ

لانفرق بين احد من رسله -

অর্থাৎ, আমরা তাঁর (আল্লাহ্‌র) রাসূলদের মাঝে কোন পার্থক্য করি না। (সূরাঃ ২ বাকারাঃ ২৮৫)[১]

আরেক আয়াত ঃ

ولن تجد لسنة الله تبديلا-

অর্থাৎ, তুমি আদৌ আল্লাহ্‌র নীতিতে পরিবর্তন পাবে না। (সূরাঃ ৩৩-আহ্‌যাবঃ ৬২)

৩. নামাযের ওয়াক্ত মোট চারটা ঃ তাহাজ্জুদ, ফজর, মাগরিব ও যোহর। তাহাজ্জুদের ওয়াক্ত শুধু নফলের জন্য আর বাকি ওয়াক্তগুলো ফরযের জন্য। দলীল ঃ

اقم الصلوة لدلوك الشمس. الى اخر الاية -

অর্থাৎ, তুমি নামায কায়েম কর সূর্য ঢলা থেকে নিয়ে রাত্র অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত। (সূরাঃ ১৭-বানী ইসরাঈলঃ ৭৮)

৪. কিবলা দুই দিক পূর্ব এবং পশ্চিম। তাহাজ্জুদ ও ফজরের কিবলা পূর্বদিকে এবং যোহর ও মাগরিবের কিবলা পশ্চিম দিকে। দলীল কুরআনের আয়াত ঃ

رب المشرق والمغرب -

অর্থাৎ, তিনি পুর্ব ও পশ্চিম দিকের প্রতিপালক।

মোটকথা যখন সূর্য পূর্বদিকে থাকবে তখন কিবলা হবে পূর্ব দিকে যেমন তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামাযে। আর সূর্য যখন পশ্চিম দিকে থাকবে তখন কিবলা হবে পশ্চিম দিকে। যেমন যোহর ও মাগরিবের নামায।

১. এ আয়াতে উল্লেখিত পার্থক্য না করা দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে পার্থক্য না করা অর্থাৎ, সকলের প্রতি ঈমান আনা ॥

৫. নামাযের তাকবীর আল্লাহু আকবার নয়; বরং নামাযের তাকবীর হল-বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। দলীল সুলাইমান (আঃ)-এর ঘটনা যা কুরআনে বলা হয়েছে, তাতে আল্লাহু আকবার বলা হয়নি বরং বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম বলা হয়েছে। ঃ[১]

انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم - (সূরাঃ ২৭-নাম্‌লঃ ৩০)

৬. নামাযের ভেতরকার আরকান ১৪টা তবে সেটা ওগুলো নয়, সাধারণ ভাবে মানুষ যেগুলোকে মনে করে থাকে এবং বিশ্বাস করে থাকে। দলীল কুরআনের আয়াত ঃ انا اعطيناك الكوثر - এখানে كوثر দ্বারা উদ্দেশ্য سبع مثانى, আর سبع مثانى দ্বারা উদ্দেশ্য ১৪টা বিষয়। আর ১৪টা দ্বারা ১৪টা আরকানই উদ্দেশ্য।

৭. প্রচলিত এই আযান নিষিদ্ধ। তারা আযান একামতকে বিদআত বলে। তাদের বক্তব্য হল নামাযীরা আগমন করবে আসমানের নিদর্শন দেখে। দলীল হল এই আযান কুরআনে উল্লেখিত নেই ; বরং কুরআনে আছে ঃ ان انكر الاصوات لصوت الحمير -

৮. "উযূ" শব্দটা মনগড়া তৈরী করা এবং ভ্রান্ত। আসল শব্দ হল গোসল। কুরআনের আয়াতে গোসল শব্দই বলা হয়েছে যেমন ঃ

فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق - (সূরাঃ ৫-মায়িদাঃ ৬)

(উল্লেখ্য বহু হাদীছে "উযূ" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।)

৯. উযূতে শুধু হাত এবং মুখ ধৌত করতে হয় এবং পা ও মাথায় মাসেহ করতে হয়, ব্যস এতটুকুই উযূ।

১০.যখন থেকে যুগের রং পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং আমার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, তখন থেকেই নামাযের আসল রূপ বিগড়ে দিয়েছে এবং মুশরিক শুলভ দুআ তার অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে।

১১. রাকআত শব্দটা বিকৃত। প্রথম রাকআত, দ্বিতীয় রাকআত এরূপ না হয়ে বরং কসরে উলা (قصر اولى) কসরে উখরা (قصر اخرى) এভাবেই হওয়া উচিত।

১২. জানাযার নামাযে হাত বাঁধতে হবে না। দলীল কুরআনের আয়াত ঃ

واخفض جناحك للمؤمنين - (সূরাঃ ১৫-হিজ্‌রঃ ৮৮)

(অথচ এর প্রকৃত অর্থ হল - তুমি মু'মিনদের জন্য তোমার পক্ষপুট অবনমিত কর অর্থাৎ, তাদের প্রতি সদয় হও।)

১৩. রমযান শরীফের মাস ৩০ দিনেই হয়ে থাকে। দলীল ঃ

ووعدنا موسى ثلاثين ليلة -

অর্থাৎ, আমি মূসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম ত্রিশ রাত্রের। (সূরাঃ ৭-আ'রাফঃ ১৪২)

১৪. রমযান মাস এটা চন্দ্র মাস নয়; বরং সৌর মাস।

১. অথচ এটি নামাযের সময়কার প্রসঙ্গে নয় বরং সুলায়মান (আঃ) পত্রের শুরুতে তা ব্যবহার করেছিলেন, তাই কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে ॥

১৫. আহ্‌লে কুরআনদের নামাযের রূপ হল ঃ প্রথমে তাকবীর বলে বৈঠকের মত বসে যাবে। তারপর তাকবীর বলে দাঁড়াবে। অতঃপর বাম হাত ডান বগলের নিচে রাখবে, আর ডান হাত বাম কাঁধের উপর রাখবে। তারপর রুকু করবে। তারপর সাজদায় থুতনি রাখবে তারপর মাথা। অতঃপর জলসায় আসবে এবং সীনার উপর হাত রাখবে। তারপর সাজদা করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। দলীল হল এর অন্যথা হলে উপরোক্ত আয়াতের অর্থ দোরস্ত হয় না। (অথচ নামাযের বিস্তারিত রূপ হাদীছে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।)

১৬. তারা নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায়, রুকূ অবস্থায়, কওমা ও জলসায় এবং বৈঠকে ইত্যাদি সব স্থানে দু'আ কেরাত ইত্যাদি সবকিছুই ব্যতিক্রম পাঠ করে থাকে।[১]

এভাবে আব্দুল্লাহ চকড়ালবী ও তার অনুসারীগণ হাদীছ ও কুরআন অস্বীকার করে এক নতুন ধর্মের সুচনা করে। আব্দুল্লাহ চকড়ালবীর মৃত্যুর পর এই ফিতনা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পরবর্তীতে আসলাম জয়রাজপূরী এবং তারপর পারভেজ গোলাম আহ্‌মদ এই ফিতনাকে পুনঃজীবিত করার চেষ্টা করে।

হাদীছ এবং ইসলামের বহু সংখ্যক বদীহী বিষয় (بديهيات) কে অস্বীকার করার ফলে এই দলটি নিঃসন্দেহে কাফের।

(তথ্য সূত্র ঃ جواهر الفقه. مفتى محمد شفيع، بدائع الكلام. مفتى محمد يوسف التاؤلوى)

মওদূদী মতবাদ

(মওদুদী সাহেব ও তার প্রতিষ্ঠিত জামাআতে ইসলামীর চিন্তাধারা)

জামাআতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী সাহেব ১৩২১ হিজরী মোতাবেক ১৯০৩ সালে ভারতের হায়দারাবাদ প্রদেশের আওরংগবাদ জেলা শহরের আইন ব্যবসায়ী আহমদ হাসান মওদূদীর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ৯ বছর বয়স পর্যন্ত বাড়িতেই তার উর্দূ, ফার্সী আরবী ইত্যাদি প্রাথমিক বিদ্যাচর্চা সম্পন্ন হয়। তারপর আওরংগাবাদের ফাওকানিয়া মাদ্রাসায়[২] ৮ম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এখানে শেষ বর্ষে ছয়

১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন مفتى محمد يوسف التاؤلوى بدائع الكلام ॥

২.তখন হায়দারাবাদ ও আওরংগাবাদে এক ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল যাতে ইতিহাস, ভূগোল, অংক ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ, কোরআন হাদীছ, ফেকাহ মানতেক প্রভৃতি পড়ানো হত। তথ্য সূত্রঃ মাওলানা মওদূদী ঃ একটি জীবন একটি ইতিহাস, লেখক আব্বাস আলী খান, প্রকাশনা বিভাগ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, পঞ্চম সংস্করণ, জুন ২০০৩। লেখক আব্বাস আলী খান কোনরূপ সূত্রের উল্লেখ ছাড়াই আরও লিখেছেন যে, মওদূদী সাহেব ১৯২৮ সালে আশফাকুর রহমান কান্ধলভীর কাছ থেকে জামে' তিরমিযী ও মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেকের সনদ হাসেল করেন। (পৃঃ ৪৮) কিন্তু মাওলানা মানযূর নো'মানী সাহেবের বর্ণনা মতে ১৯৩৬/১৯৩৭ সাল পর্যন্ত মওদূদী সাহেব ইংরেজী স্টাইলে চুল রাখতেন এবং দাড়ি সেভ করতেন। তারপর নামকে ওয়াস্তে দাড়ি অবস্থায় ছিলেন দীর্ঘ দিন। দ্রঃ مودودى كے ساتھ ميرى رفاقت كى سرگزشت اور اب ميرا موقف صفحه ২৬-২২। অতএব এরূপ ব্যক্তিকে কোন মুত্তাকী পরহেযগার আলেম হাদীছের সনদ দিতে পারেন তা বোধগম্যতার পর্যায়ে পড়ে না ॥

মাস পড়াশোনা করার পর তার পিতা অসুস্থ্য হয়ে পড়লে তার লেখা পড়া বন্ধ হয়ে যায়। ১৭ বছর বয়সের এরকম সংকটময় মূহুর্তে তিনি জীবিকা অর্জনের জন্য লেখনী শক্তিকেই অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করে নেন। প্রথম দু'মাস তার বড় ভাই কর্তৃক বিজনৌর থেকে প্রকাশিত 'মদীনা' পত্রিকায় কাজ করেন। তারপর জবলপুর থেকে জনাব তাজুদ্দীন সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত "তাজ" পত্রিকায় সম্পদানার কাজে যোগ দেন। এ পত্রিকাটি একটি দৈনিক পত্রিকায় পরিণত হয়। এ সময় মওদূদী সাহেব রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। বিভিন্ন রাজনৈতিক জনসভায় বক্তৃতাও দিতে শুরু করেন।[১]

১৯৩২ সালে মওদূদী সাহেব দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ থেকে "তরজমানুল কুর-আন" নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করেন। প্রথম দিকে পত্রিকাটিতে আধুনিক যুগের আলোকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সৃষ্ট বিভিন্ন সংশয় নিরসনে মওদূদী সাহেবের বলিষ্ঠ লেখনী দেখে মওলানা মুহাম্মাদ মানযূর নো'মানী, মাওলানা আবুল হাছান আলী নদভীসহ বেশ কিছু সংখ্যক উলামায়ে কেরাম মওদূদী সাহেবের প্রতি মুগ্ধ হয়ে উঠেন। এই মুগ্ধতাই মওলানা মুহাম্মাদ মানযূর নো'মানী ও মাওলানা আবুল হাছান আলী নদভী সহ কিছু সংখ্যক উলামাকে মওদূদী সাহেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামাআতে ইসলামীতে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করে। মওলানা মানযূর নোমানী সাহেবের বর্ণনার[২] আলোকে পরবর্তিতে উলামায়ে কেরাম উপলব্ধি করলেন যে, মওদূদী সাহেবের মূল লক্ষ্য হল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করা। এই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করার নিমিত্তে ধর্মহীন রাজনৈতিক দলের ন্যায় যখন যে নীতি গ্রহণ করা তিনি প্রয়োজনীয় মনে করেন, তখনই সেটা গ্রহণ করেন। যদিও তা ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী মৌলনীতিমালার সাথে যতই সাংঘর্ষিক হোক না কেন, তবুও তিনি অবলিলায় তা গ্রহণ করেন এবং ইসলামের নামে গ্রহণ করেন। প্রয়োজন হলে ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামের মৌলনীতি সমূহের স্বকপোল কল্পিত ব্যাখ্যা দেন। এভাবে ধর্মকে তিনি রাজনীতি সর্বস্ব করে তোলেন। ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলোর রাজনৈতিক ব্যাখ্যা প্রদান শুরু করেন। তিনি বলেন "ইলাহ" অর্থ শাসক। "আল্লাহ" অর্থও তাই। "দ্বীন" অর্থ ধর্ম নয়। অর্থাৎ, ঈমান আমল তথা নামায রোযা, হজ্জ, যাকাত এবং ইহ্ছান তথা তাসাওউফ এগুলির নাম হল দ্বীন তথা ধর্ম নয়। বরং "দ্বীন" হল রাষ্ট্র সরকার। আর "শরী'আত" হল রাষ্ট্রের আইন-কানূন। তিনি বলেন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিধি-বিধান পালন করার নাম ইবাদত নয়। বরং"ইবাদত" হল রাষ্ট্রের আইন মান্য করা। "খুতবাত" গ্রন্থে তার এসব ব্যাখ্যা বিদ্যমান রয়েছে। পরবর্তিতে বিস্তারিত উল্লেখ করা হবে। এভাবে তিনি ইসলামের বহু সংখ্যক মৌলিক পরিভাষার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়ে ইসলামের রাজনৈতিক করণ করেন।

১. তথ্যসূত্রঃ মাওলানা মওদূদী ঃ একটি জীবন একটি ইতিহাস, লেখক আব্বাস আলী খান, প্রকাশনা বিভাগ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, পঞ্চম সংস্করণ, জুন ২০০৩ ॥

২. مولانا مودودی کے ساتھ میری رفاقت کی سرگزشت اور اب میرا موقف. صفحہ ۷۶ ॥

এসব উলামা হযরাত ইসলামের এরূপ রাজনৈতিক করণ ও ইসলামী মৌলনীতিমালার অপব্যাখ্যা দেখে জামাআতে ইসলামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং মওদূদী সাহেবের চিন্তাধারায় যে সব বিভ্রান্তি তারা উপলব্ধি করেছেন সেগুলির বিরুদ্ধে বয়ান প্রদান ও লেখনী চালাতে শুরু করেন।[১] নিম্নে মওদূদী সাহেবের চিন্তাধারার বিভ্রান্তি সম্পর্কে তারই লিখিত বই-পত্রের আলোকে কিঞ্চিত আলোচনা করা হল।

মওদূদী সাহেবের চিন্তাধারা ও অনুসৃত নীতি হকপন্থীদের চিন্তাধারা ও তাঁদের অনুসৃত নীতি থেকে সর্বতোভাবে বিচ্যুত। ঈমান-আকীদার ক্ষেত্রেও তিনি আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। আমল এবং ইবাদত বন্দেগী প্রসঙ্গেও তিনি আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। এমনকি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস কুরআন-হাদীছ এবং তাফসীর, ফেকাহ ও তাসাওউফ সম্পর্কিত ধারণা এবং কুর-আন-হাদীছ থেকে জ্ঞান আহরণের পদ্ধতির ক্ষেত্রেও তিনি আহ্লে হকের অনুসৃত নীতি থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। নিম্নে তার যৎ কিঞ্চিত বিশদ বিবরণ পেশ করা হল।

আমরা এ সম্পর্কিত আলোচনাকে তিন ভাগে ভাগ করে নিয়েছি ঃ

ক. ঈমান আকীদার ক্ষেত্রে মওদূদী সাহেবের বিচ্যুতি

খ. আমল এবং ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে মওদূদী সাহেবের বিচ্যুতি

গ. ইসলামী জ্ঞানের উৎস কুরআন, হাদীছ এবং তাফ্সীর ও ফেকাহ শাস্ত্র প্রসঙ্গে মওদূদী সাহেবের বিচ্যুতি

(ক) ঈমান আকীদার ক্ষেত্রে মওদূদী সাহেবের বিচ্যুতি

ঈমান-আকীদার পর্যায়ে মওদূদী সাহেব বহু বিষয়ে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। এ পর্যায়ে নিম্নে ৮ টি প্রসঙ্গ তুলে ধরা হল।

(১) আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ)-এর ইসমত প্রসঙ্গঃ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে আম্বিয়ায়ে কেরাম নবুওয়াতের আগে ও পরে সগীরা ও কবীরা সব ধরনের গোনাহ থেকে পবিত্র। অর্থাৎ, তাঁরা গোনাহ থেকে মা'সূম বা নিষ্পাপ। شرح الفقه الاكبر গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

والانبياء عليهم الصلوة والسلام كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح يعنى قبل النبوة و بعدها ـ (شرح الفقه الاكبر لابى المنتهى صفحه/١٦)

১. মাওলানা মানযূর নো'মানী সাহেব জামা'আত ত্যাগপূর্বক লেখেন مولانا مودودی کے ساتھ میری رفاقت کی سرگزشت اور اب میرا موقف নামক গ্রন্থ এবং মাওলানা আবুল হাছান আলী নদভী সাহেব জামা'আত ত্যাগপূর্বক লেখেন عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح নামক গ্রন্থ। উল্লেখ্য জামা'আতে ইসলামীর লোকজন মওদূদী সাহেবের পক্ষে প্রদত্ত উপরোক্ত আলেমদ্বয়ের এবং আরও অনেকের বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরে থাকেন। এসব বক্তব্য জামা'আতে ইসলামী ও মওদূদী সাহেবের বিভ্রান্তি প্রকাশিত হওয়ার আগে তাদের প্রদত্ত বক্তব্য। কিন্তু তারা জামাআতে ইসলামী বর্জন করার পর যে সব বক্তব্য প্রদান করেছেন সেগুলির উল্লেখ তারা করেন না। এটা সত্য নিষ্ঠার পরিচয় নয় ॥

অর্থাৎ, আম্বিয়ায়ে কেরাম নবুওয়াতের আগে ও পরে সগীরা ও কবীরা সব ধরনের গোনাহ থেকে পবিত্র। উক্ত গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে ঃ

ولم يرتكب (النبى ﷺ) صغيرة ولا كبيرة قط يعنى قبل النبوة وبعدها -

অর্থাৎ, নবী (সাঃ) কখনও নবুওয়াতের আগে ও পরে সগীরা ও কবীরা কোন ধরনের গোনাহ করেননি। মোল্লা আলী কারী লিখেছেন ঃ

عصمة الانبياء من الكبائر والصغائر قبل النبوة وبعدها - (المرقاة جـ/١ تحت حديث رقم ٨١ فى باب الايمان بالقدر)

অর্থাৎ, আম্বিয়ায়ে কেরাম নবুওয়াতের আগে এবং পরে সগীরা ও কবীরা সব ধরনের গোনাহ থেকে মা'সূম। ইব্‌নে হাজার আসকালানী বলেন ঃ

فلم يمكن صدوره (صدور الذنب) منه ولو صغيرة قبل النبوة على الصواب - (نقله القارى فى المرقاة جـ/١ تحت حديث رقم ٤١٥ فى باب الاعتصام بالكتاب والسنة)

অর্থাৎ, বিশুদ্ধ মতানুসারে নবী কারীম (সাঃ) থেকে গোনাহ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়, যদিও নবুওয়াতের পূর্বে এবং সগীরা গোনাহও হয়।

কিন্তু মওদূদী সাহেবের মতে নবুওয়াত লাভের পূর্বেরতো কথাই নেই, নবুওয়াত লাভের পরও নবীদের দ্বারা পাপ সংঘটিত হতে পারে এবং হয়েছেও। তিনি বলেনঃ

"এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে কেউ কেউ দ্বিধাবোধ করে থাকেন, তার একমাত্র কারণ এই যে, নবীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের ভুল-ভ্রান্তির অভিযোগ তোলা নবীদের নিষ্পাপ হওয়া সংক্রান্ত আকীদার পরিপন্থী বলে মনে হয়। কিন্তু যারা এরূপ মতামত পোষণ করেন তারা সম্ভবতঃ এ ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেননি যে, নিষ্পাপ হওয়াটা আসলে নবীদের সত্ত্বাগত অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য (لوازم ذات) নয়, বরং আল্লাহ তাদেরকে নবুওয়াত নামক সুমহান পদটির দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করার সুযোগ দানের জন্য একটা হিতকর ব্যবস্থা হিসেবে গুনাহ্ থেকে রক্ষা করেছেন। নচেৎ আল্লাহ্‌র এই সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাটা যদি ক্ষণিকের জন্যও তাদের ব্যক্তিসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে সাধারণ মানুষের যেমন গুনাহ্ হয়ে থাকে, তেমনি নবীদেরও হতে পারে। এটা একটা বড়ই মজার কথা যে, আল্লাহ ইচ্ছাকৃত প্রত্যেক নবী থেকেই কোন না কোন সময় নিজের সংরক্ষণ ব্যবস্থা তুলে নিয়ে দু'একটা গুনাহ্ ঘটে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন, যাতে মানুষ নবীদেরকে খোদা মনে করে না বসে এবং তারা যে মানুষ, খোদা নন, সেটা বুঝতে পারে।[১]

১. تفهيمات ، حصه دوم ، صفحه/٥٦ ، اسلامک پبلیکشنز لمیٹڈ ، لاهور (پاکستان) ١٩٨٧ء অনুবাদ গ্রন্থঃ "নির্বাচিত রচনাবলী থেকে অনুবাদ গ্রহণ করা হয়েছে। ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৪, আধুনিক প্রকাশনীঃ ১ম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৯১ ॥

কি আশ্চর্য দর্শন নবীগণ মানুষের ন্যায় পানাহার করতেন এটা তাদের মানুষ প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট হল না অধিকন্তু তাঁরা মানুষ - সেটা প্রমাণ করার জন্য তাঁদের দ্বারা পাপ সংঘটিত করাতে হল!

তিনি অন্যত্র সূরা হুদের ৪৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সব নবী রাসূল সম্পর্কে বলেছেন ঃ "বস্তুতঃ নবীগণ মানুষ হয়ে থাকেন এবং কোন মানুষই মু'মিনের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ মাপকাঠিতে সর্বদা অটল থাকতে সক্ষম হতে পারে না। প্রায়শঃই মানবীয় নাজুক মুহূর্তে নবীর ন্যায় শ্রেষ্ঠ মানুষও কিছুক্ষণের জন্য মানবিক দুর্বলতার সামনে পরাভূত হয়ে যান।[১]

নবীদের দ্বারা পাপ সংঘটিত হয়েছে এ মর্মে মওদূদী সাহেব অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "এখানে আদম (আঃ) থেকে প্রকাশিত ঐ মানবিক দুর্বলতার হাকীকত বুঝে নিতে হবে- যা আদম (আঃ)-এর মধ্যে এক আত্মবিস্মৃতির জন্ম দিয়েছিল এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের বাঁধন ঢিলা হওয়া মাত্রই তিনি আনুগত্যের সু-উচ্চ মর্যাদা থেকে পাপের অতল গহ্বরে তলিয়ে গিয়েছিলেন"।[২]

বি ঃ দ্র ঃ ইসমত সম্পর্কে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বক্তব্য ও দলীল প্রমাণসহ একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ (শিরোনাম "ইস্‌মতে আম্বিয়া প্রসঙ্গ") সামনে পেশ করা হয়েছে। দেখুন পৃঃ ৪০৪।

(২) নবীগণ কর্তৃক নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন প্রসঙ্গঃ

কুরআন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী-রাসূলগণ তাঁদের নবুওয়াতের দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁদের দ্বারা বিন্দুমাত্র কোন ত্রুটি সংঘটিত হয়নি। কুরআনে কারীমে রাসূল (সাঃ) প্রসঙ্গে এসেছেঃ

يايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته - الاية-

অর্থাৎ, হে রাসূল ! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তুমি তা পৌঁছে দাও, অন্যথায় তুমি তাঁর রেসালাত পৌঁছে দিলে না। (সূরা মায়েদাঃ ৬৭)

বিদায় হজ্জের ভাষণে লক্ষাধিক সাহাবীর সামনে রাসূল (সাঃ) সকলকে সম্বোধন করে তিন বার প্রশ্ন করেছিলেনঃ

الا هل بلغت ؟

অর্থাৎ, আমি কি তোমাদের কাছে (দ্বীন) পৌঁছে দিয়েছি? সমবেত সাহাবাগণ উত্তরে বলেছিলেনঃ জি হ্যাঁ, অবশ্যই পৌঁছে দিয়েছেন। অতঃপর রাসূল (সাঃ) এ কথার উপর আল্লাহ্‌কে সাক্ষ্য রেখেছিলেন এই বলে যে,

১. تفهيم القرآن ، جـ/٢، مكتبة تعمير انسانيت ، لاهور، ايڈيشن ٢٤، جنورى ١٩٩٠ء صفحه/٣٤٣-٣٤٤ -॥

২. تفهيم القرآن ، جـ/٣، صفحه/١٢٣ - ॥

اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد - (بخاری)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ ! তুমি সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ ! তুমি সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ ! তুমি সাক্ষী থাক।

এর দ্বারা প্রমাণিত হল রাসূল (সাঃ) তাঁর নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনে কোনই ত্রুটি করেননি। ফখরুদ্দীন রাযী عصمة الانبياء গ্রন্থে লিখেছেনঃ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিধি-বিধান পৌঁছে দেয়া তথা নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন-এর ক্ষেত্রে নবীদের থেকে কোন ত্রুটি না হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা' রয়েছে। অথচ মওদূদী সাহেবের ধারণায় নবী রাসূলগণ থেকে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি-বিচ্যুতিও হয়েছে। এমনকি মওদূদী সাহেবের লেখনী থেকে বোঝা যায় সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল নবী মুহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) থেকেও নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে। (নাউযু বিল্লাহ!) তিনি লিখেছেনঃ

"সে পবিত্র সত্তার নিকট কাতর কণ্ঠে আবেদন করুন, হে মালিক, এ তেইশ বছরের নববী জীবনে দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দানকালে স্বীয় দায়িত্ব সমূহ আদায়ের বেলায় যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি আমার থেকে সংঘটিত হয়েছে তা ক্ষমা করে দাও।[১]

পর্যলোচনা ও খণ্ডন ঃ

এখানে স্পষ্টতঃই নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হয়েছে বলে বোঝানো হয়েছে। স্বয়ং খাতামুন্নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে মওদূদী সাহেব যখন এমন মারাত্মক আকীদা পোষণ করে থাকেন তখন অন্যান্য আম্বিয়া (আঃ) সম্পর্কে তার আকীদা কি হবে তা সহজেই অনুমেয়। নবী যদি নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনে কোতাহী করেন তবে তো তাঁর নবুওয়াতই বৃথা প্রমাণিত হয়ে যায়। সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলার মনোনয়নই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

তিনি অন্যান্য নবীদের দ্বারাও নবুওয়াত রেসালাতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হয়েছে বলে বিশ্বাস রাখেন। যেমন হযরত ইউনুস (আঃ) সম্পর্কে তিনি লিখেছেন ঃ "কুরআনে কারীমের ইংগিত সমূহ এবং সহীফায়ে ইউনুসের উল্লেখিত বিস্তারিত বিবরণের উপর চিন্তা করলে একথা পরিস্কার ভাবে বুঝা যায় যে, হযরত ইউনুস (আঃ) থেকে রিসালতের দায়িত্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কিছু কোতাহী বা ত্রুটি হয়ে গিয়েছিল এবং সম্ভবতঃ তিনি অধৈর্য্য হয়ে সময় হওয়ার আগেই নিজ আবাসস্থল ত্যাগ করেছিলেন"।[২]

---

১. قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں. ص/۱۱۱، مرکزی مکتبۂ اسلامی، دہلی، ایڈیشن پنجم، ۱۹۹۳م। অনুবাদ গ্রন্থঃ কোর-আনের চারটি মৌলিক পরিভাষা, ১১২ পৃঃ, ৮ম প্রকাশ, আধুনিক প্রকাশনী, জুনঃ ২০০২। এখানে অনুবাদ এভাবে করা হয়েছেঃ তাঁর দরবারে আবেদন কর! প্রভু পরওয়ার দেগার! দীর্ঘ তেইশ বছরের এ খেদমত কালে আমার দ্বারা যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে, তা ক্ষমা করে দাও। ॥

২. تفہیم القرآن، ج/۲، سورۂ یونس، مکتبۂ تعمیر انسانیت، لاہور، ایڈیشن ۲، جنوری ۱۹۵۸ء। صفحہ/۳۳۲ - ॥

(৩) আম্বিয়ায়ে কেরামের সমালোচনা প্রসঙ্গঃ

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত নবী রাসূলের সমালোচনা এমনকি সাহাবীদের সমালোচনা থেকেও বিরত থাকেন। তাদের আকীদা হল নবীগণ নিষ্পাপ, অতএব তাঁরা সমালোচনার উর্ধ্বে।

কিন্তু মওদূদী সাহেব শুধু সাহাবী নয় নবীদেরও সমালোচনা করেছেন। এটা এক দিকে মওদূদী সাহেবের নবী রাসূলগণকে নিষ্পাপ ও সমালোচনার উর্ধ্বে মনে না করার প্রমাণ। সাথে সাথে নবী রাসূলগণের ব্যাপারে তার মনে অভক্তি বিরাজমান থাকার পরিচায়ক। তিনি বিভিন্ন নবীর সমালোচনা করে বলেছেনঃ

❑ হযরত দাউদ (আঃ) সম্পর্কেঃ

"হযরত দাঊদ (আঃ) তার যুগের ইসরাঈলী সমাজের সাধারণ-প্রথায় প্রভাবান্বিত হয়ে উরিয়ার কাছে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার আবেদন করেছিলেন"।[১]

অন্যত্র বলেছেন, "হযরত দাঊদ (আঃ)-এর এ কাজে কু-প্রবৃত্তির কিছুটা দখল ছিল। তাঁর শাসন ক্ষমতার সাথে অসংগত-অশোভনীয় ব্যবহারের সম্পর্ক ছিল। আর তা ছিল এমন ধরনের কাজ যা হক পন্থায় রাজ্য শাসনকারী কোন শাসকের পক্ষেই শোভনীয় নয়"।[২]

❑ হযরত ইউসূফ (আঃ) সম্পর্কেঃ

"এটা কেবল অর্থ মন্ত্রীর গদী লাভের দাবী ছিল না, যেমন কোন কোন লোক মনে করে থাকেন। বরং তা ছিল 'ডিক্টেটরশীপ' লাভের দাবী। এর ফলে ইউসুফ (আঃ) যে পজিশন লাভ করেছিলেন তা প্রায় এ ধরনের ছিল যা ইটালীর মুসোলিনীর রয়েছে"।[৩]

❑ আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) সম্পর্কেঃ

"এখানে আদম (আঃ) থেকে প্রকাশিত ঐ মানবিক দুর্বলতার হাকীকত বুঝে নিতে হবে- যা আদম (আঃ)-এর মধ্যে এক আত্মবিস্মৃতির জন্ম দিয়েছিল এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের বাঁধন ঢিলা হওয়া মাত্রই তিনি আনুগত্যের সু-উচ্চ মর্যাদা থেকে পাপের অতল গহ্‌বরে তলিয়ে গিয়েছিলেন"।[৪]

---

১. تفہیمات، حصہ دوم، صفحہ/۵۶، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور (پاکستان) ۱۹۸۷ء অনুবাদ গ্রন্থঃ নির্বাচিত রচনাবলী ২য় খণ্ড, ৭৩ পৃঃ আধুনিক প্রকাশনী ১ম প্রকাশ, ১৯৯১ ॥

২. تفہیم القرآن، ج/۴، سورہ ص، مکتبۂ تعمیر انسانیت، لاہور، ایڈیشن ۱، صفحہ/۳۲۷ - ॥

৩. تفہیمات، حصہ دوم، صفحہ/۱۲۲، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور (پاکستان) ۱۹۸۷ء অনুবাদ গ্রন্থঃ নির্বাচিত রচনাবলী ২য় খণ্ড, ১৫১ পৃঃ আধুনিক প্রকাশনী ১ম প্রকাশ, ১৯৯১ ॥

৪. تفہیم القرآن، ج/۳، صفحہ/۱۲۳ - ॥

❑ সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম সম্পর্কেঃ

সমস্ত পয়গম্বরদের সম্পর্কে কটুক্তি করে মওদূদী সাহেব বলেছেনঃ "অন্যদের কথা তো স্বতন্ত্র, প্রায়শঃই পয়গম্বরগণও তাঁদের কু-প্রবৃত্তির মারাত্মক আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছেন।"[১]

❑ রাসূলে আকরাম (সাঃ) সম্পর্কেঃ

হুজুরে আকরাম (সাঃ) সম্পর্কে জনাব মওদূদী সাহেব বলেছেন- "আল্লাহর নিকট কাতর কণ্ঠে এই আবেদন করুন, যে কাজের দায়িত্ব আপনাকে দেয়া হয়েছিল তা সম্পন্ন করার ব্যাপারে আপনার দ্বারা যে ভুল-ত্রুটি হয়েছে কিংবা তাতে যে অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে তা যেন তিনি ক্ষমা করে দেন"[২]

(৪) সাহাবায়ে কেরামের আদালত ও সমালোচনা প্রসঙ্গঃ

আদালত বলা হয় ঃ

العدالة فى اللغة الاستقامة ، وعند اهل الشرع هى الانزجار عن محظورات دينية -

(كشاف اصطلاحات الفنون جـ/٣)

অর্থাৎ, "আদালত" (العدالة)-এর আভিধানিক অর্থ হল অটল থাকা। আর শরীআতের পরিভাষায় আদালত বলা হয় ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা তথা পাপ থেকে বিরত থাকা।

আবূ বকর ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেছেনঃ আদালতে সাহাবার বিষয়টি একটি প্রতিষ্ঠিত অবিসংবাদিত বিষয়। তাদের ন্যায়নিষ্ঠতা, আত্মিক-আধ্যাত্মিক পবিত্রতা ও আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁদের নির্বাচিত-চয়িত হওয়ার কথা পবিত্র কুরআনে আলোচিত হয়েছে।

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদায় সকল সাহাবী আদিল বা নির্ভরযোগ্য ও ন্যায়নিষ্ঠ। অতএব তাঁরা সমালোচনার উর্ধ্বে। সাহাবীদের সমালোচনা না করা এবং তাঁদের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা রাখা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নীতি। সাহাবীদের প্রতি মহব্বত ও ভক্তি শ্রদ্ধা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম শি'আর বা প্রতীক। সাহাবায়ে কেরামকে ভালবাসা নবী (সাঃ)কেই ভালবাসা। আকীদার প্রসিদ্ধ কিতাব "মুসামারা"তে বলা হয়েছে ঃ

اعتقاد اهل السنة والجماعة تزكية جميع الصحابة وجوبا باثبات العدالة لكل منهم والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم - (المسامرة)

১. ۱۹۸۷ (پاکستان) ، لاہور ، اسلامک پبلیکشنز لمیٹڈ ، صفحہ / ۱۹۵ ، حصہ دوم ، تفہیمات অনুবাদ গ্রন্থ নির্বাচিত রচনাবলী ১. (দ্বিতীয় ভাগ) ২৮ পৃঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৯২। এখানে অনুবাদ করা হয়েছে এরূপঃ আর সাধারণ লোক কোন্ ছার, কখনো কখনো পয়গম্বররা পর্যন্ত এই মহা শত্রুর আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছেন। এ অনুবাদে মুল কিতাবের শব্দ بسا اوقات -এর অনুবাদে "কখনো কখনো" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে বিকৃতি ঘটানো হয়েছে ॥

২. تفہیم القرآن ، عم پارہ ، طباعت مارچ ۱۹۷۳ ، صفحہ/ ۳٦٥ - ॥

অর্থাৎ, আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল - আবশ্যিকভাবে সমস্ত সাহাবীর জন্য "আদালত" গুণ মেনে নিয়ে তাঁদেরকে পবিত্র সাব্যস্ত করা, তাঁদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা থেকে বিরত থাকা এবং তাঁদের প্রশংসা করা।

আকীদাতুত্তাহাবীর শরাতে বলা হয়েছে ঃ

ولا نذكرهم الا بخير وحبهم دين وايمان واحسان -

অর্থাৎ, আমরা তাঁদের ভাল বৈ মন্দের উল্লেখ করি না। তাঁদের প্রতি ভালবাসা দ্বীন, ঈমান এবং ইহ্‌ছান।

সাহাবীদের সমালোচনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

الله الله فى اصحابى لا تتخذوهم غرضا من بعدى فمن احبهم فبحبى احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم الحديث -(ترمذى)

অর্থাৎ, তোমরা আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তোমরা আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আমার পর তোমরা তাঁদেরকে সমালোচনার পাত্র বানাবে না। যে তাঁদেরকে ভালবাসল, সে আমার প্রতি ভালবাসার কারণেই তাঁদেরকে ভালবাসল। আর যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল, সে আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণেই তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখল।

কিন্তু হাদীছে সাহাবীদের সমালোচনা নিষিদ্ধ হওয়ার এত সব স্পষ্ট দলীল থাকা সত্ত্বেও মওদূদী সাহেব সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা শুধু জায়েযই মনে করেন না বরং জরূরী মনে করেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের কঠোর নিন্দাবাদ করেছেন। তাঁদের প্রতি জঘন্য মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছেন এবং তাঁদেরকে অনির্ভরযোগ্য প্রমাণ করার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের সময়কার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে লিখেছেনঃ "অনেক সময় মানবিক দুর্বলতা সাহাবীদেরকেও আচ্ছন্ন করে ফেলত এবং তারা পরস্পরের উপর আঘাত করে কথা বলতেন।"[১] তিনি খেলাফত ও মুলূকিয়াত গ্রন্থে হযরত মুগীরা ইব্‌নে শু'বা ও হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর অভিযোগ উত্থাপণ করেছেন। তিনি হযরত উছমান (রাঃ)-এর পর্যন্ত সমালোচনা করেছেন। তিনি হযরত মু'আ-বিয়া (রাঃ) সম্পর্কে সাহাবা বিদ্বেষী শী'আ ঐতিহাসিকদের মত খুঁজে খুঁজে বের করে কিংবা ঐতিহাসিকদের ইবারত কাঁট ছাঁট করে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ হিসেবে তুলে ধরেছেন। হযরত শামসুল হক ফরিদপূরী (রহঃ) তার লিখিত "ভুল সংশোধন" গ্রন্থে এ সম্পর্কে তথ্যবহুল প্রমাণ পেশ করেছেন যে, তিনি কিভাবে ঐতিহাসিকদের ইবারত কাঁট ছাঁট করেছেন এবং কোন কোন সাহাবা বিদ্বেষী শী'আ ঐতিহাসিকদের মত তিনি উদ্ধৃত করেছেন। হযরত শামসুল হক ফরিদপূরী (রহঃ) চ্যালেঞ্জ

১. ۱۹۸۸ (پاکستان) ، لاہور ، اسلامک پبلیکشنز لمیٹڈ ، صفحہ / ٥٦ ، حصہ اول ، تفہیمات অনুবাদ গ্রন্থঃ নির্বাচিত রচনাবলী ১ (দ্বিতীয় ভাগ) ১৯০ পৃঃ, আধুনিক প্রকাশনী, ১ম সংস্করণঃ ১৯৯২ ॥

পেশ করেছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত জামা'আতে ইসলামীর লোকজন তার লেখা খণ্ডন করতে পারবে না।[১]

উল্লেখ্য ঃ সাহাবীদের সমালোচনাকারীগণ অভিশপ্ত। যারা সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা ও দোষ-চর্চা করবে তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ, ফেরেশতাদের এবং সকল মানুষেরও অভিশাপ। তাদের ফরয নফল কোন প্রকার ইবাদতই আল্লাহ্ পাক গ্রহণ করবেন না। হযরত ইব্‌নে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীছে রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

اذا رايتم الذين يسبون اصحابى فقولوا لعنة الله على شركم - (ترمذى)

অর্থাৎ, তোমরা যখন এমন লোকদের দেখ যারা আমার সাহাবীদের সমালোচনা করে তখন বল, তোমাদের মাঝে যে নিকৃষ্ট তার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত বা অভিশাপ।

আর এটা সুস্পষ্ট যে, সাহাবী ও সমালোচনাকারীর মাঝে সমালোচনাকারীই নিকৃষ্ট। অতএব সেই সমালোচনা কারীর প্রতিই লা'নত।

হুজুর (সাঃ) আরও বলেছেনঃ

ان الله اختارنى واختار اصحابى فجعلهم اصحابى واصهارى وجعلهم انصارى وانه يجئ فى اخر الزمان قوم ينتقصونهم ويسبونهم الا فلا تناكحوهم الا فلا تنكحو اليهم الا فلا تصلوا معهم فان ادركتموهم فلا تدعوا لهم فان عليهم لعنة الله - (كنز العمال و دارقطنى)

অর্থাৎ, আল্লাহ আমাকে নবী মনোনীত করেছেন। আমার সহায়ক এবং আত্মীয় হিসেবে সাহাবাদেরও আল্লাহ্‌পাক মনোনীত করেছেন। আমার পর একটি ফিরকা আবির্ভূত হবে যারা আমার সাহাবীদের মন্দ বলবে, দোষ চর্চা করবে, সমালোচনা করবে। এদের সাথে তোমরা উঠা-বসা করবে না, পানাহার করবে না এবং বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করবে না।

বিঃ দ্রঃ

সাহাবায়ে কেরামের আদালত প্রসঙ্গে পরবর্তী একটি প্রবন্ধে (শিরোনাম "সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা, তাঁদের আদালত ও সত্যের মাপকাঠি হওয়া প্রসঙ্গ") বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ৩৯৪।

(৫) সাহাবায়ে কেরামের সত্যের মাপকাঠি হওয়া প্রসঙ্গঃ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল সাহাবায়ে কেরাম হক ও সত্যের মাপকাঠি। কুরআন হাদীছে সাহাবায়ে কেরামের ঈমানকে ঈমানের মাপকাঠি বলা হয়েছে,

১. জামা'আতে ইসলামীর লোকজন "ভুল সংশোধন"-এর বক্তব্য ও এই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে না পেরে অবশেষে এই বলা শুরু করেছে যে, "ভুল সংশোধন"হযরত শামসুল হক ফরিদপূরী (রহঃ)-এর লেখা নয়। কিন্তু যারা হযরত শামসুল হক ফরিদপূরী (রহঃ) কে "ভুল সংশোধন" লিখতে দেখেছেন বা তার পাণ্ডুলিপি দেখেছেন এরকম বহু লোক এখনও জীবিত আছেন। অতএব এরূপ ছেলেমিপনা করে "ভুল সংশোধন"-এর মোকাবিলা হবে না ॥

তাঁদের আমল ও মাসলাককে আমল ও মাসলাকের মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

امنوا كما امن الناس -

অর্থাৎ, এই লোকেরা (সাহাবীরা) যেমন ঈমান এনেছে, তোমরাও তদ্রূপ ঈমান আন। (সূরাঃ ২-বাকারা ঃ ১৩) আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

فان امنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم فى شقاق -

অর্থাৎ, তোমরা যেমন ঈমান এনেছ, তারা যদি অনুরূপ ঈমান আনয়ন করে, তাহলে তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হল। আর যদি তারা বিমুখ হয়ে যায়, তবেতো তারা সুদূর বিরোধে রয়েছে। (সূরাঃ ২-বাকারা ঃ ১৩৭)

এ দুই আয়াতে ঈমানের ক্ষেত্রে সাহাবীদের মাপকাঠি হওয়ার কথা বিধৃত হয়েছে।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم -

অর্থাৎ, যে তার নিকট হেদায়েত স্পষ্ট হওয়ার পর রাসূলের বিরোধিতা করবে এবং এই মু'মিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করবে, তাকে আমি ফিরিয়ে দিব যেদিকে সে ফিরে যায়। অনন্তর তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করব। (সূরাঃ ৪-নিসাঃ ১১৫)

এ আয়াতে আমল ও মাসলাকের ক্ষেত্রে সাহাবীদের মাপকাঠি হওয়ার কথা বিধৃত হয়েছে।

কিন্তু মওদূদী সাহেবের মতে সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি নন। মওদূদী সাহেব জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র-এর মৌলিক আক্বীদার দ্বিতীয়াংশ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র ব্যাখ্যায় ৬নং পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ

'রাসূলে খোদা (অর্থাৎ, হযরত মুহাম্মাদ [সাঃ])কে ছাড়া কাউকে হকের মাপকাঠি বানাবে না, কাউকে সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করবে না।' কারও যিহ্‌নী গোলামীতে লিপ্ত হবে না'।[১]

বিঃ দ্রঃ

সাহাবায়ে কেরামের সত্যের মাপকাঠি হওয়া প্রসঙ্গে পরবর্তী একটি প্রবন্ধে (শিরোনাম "সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা, তাঁদের আদালত ও সত্যের মাপকাঠি হওয়া প্রসঙ্গ") দলীল প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১. دستور جماعتى اسلامى ، مركزى جماعت اسلامى ہند ، (۱۹۹۱)। পূর্বে "জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র" নামে প্রকাশিত বইতেও ছিলঃ "রাসূলে খোদা ব্যতীত আর কাউকে সত্যের মাপকাঠি বানাবে না, কাউকে সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করবে না, কারো যিহ্‌নী গোলামীতে (মানসিক দাসত্বে) লিপ্ত হবে না।" কিন্তু এসব কথার উপর সমালোচনার মাত্রা হ্রাস করার লক্ষ্যে ভুল স্বীকার না করে তারা এসব ভাষায় পরিবর্তন এনেছেন। যেমনঃ বর্তমান "গঠনতন্ত্র জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ" (১৪শ সংস্করণ, মার্চ-২০০২, প্রকাশনা বিভাগ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ)-এর ১১ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছেঃ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবন চরিতকে কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্যা এবং উহাকে সকল ব্যাপারে সত্যের একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে মানিয়া লওয়া। আল্লাহর রাসূল ব্যতীত আর কাহাকেও ভুলের উর্ধ্বে মনে না করা। কাহারও অন্ধ গোলামীতে নিমজ্জিত না হওয়া ॥

(৬) হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কিত কয়েকটি আকীদা প্রসঙ্গ ঃ

মওদূদী সাহেবের আকীদাগত বিচ্যুতির ক্ষেত্রে আরও একটি উল্লেখ্যযোগ্য বিষয় হল - তিনি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হযরত ঈসা (আঃ)কে স্বশরীরে আকাশে তুলে নেয়া, তাঁর মৃত্যুবরণ না করা এবং শেষ যুগে তাঁর পুনরায় দুনিয়াতে অবতরণের আকীদায় আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি সূরা নেসার ১৫৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন,

"এখানে কুরআনে কারীমের মূল ভাবধারা অনুযায়ী যে কথাটি সামঞ্জস্যপূর্ণ তা একমাত্র এটাই যে, হযরত ঈসা (আঃ)কে স্বশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এ কথা বলা থেকে বিরত থাকা এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন একথা বলা থেকেও বিরত থাকা।"[১]

মওদূদী সাহেব উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)কে স্বশরীরে আকাশে তুলে নেয়ার এবং তাঁর মৃত্যুবরণ না করা ও শেষ যুগে তাঁর অবতরণ সম্পর্কিত আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত আকীদাকে দ্বিধাগ্রস্থ করে তুলেছেন। অথচ এ বিষয়টি কুর-আন ও সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্‌মীরী (রহঃ) লিখেছেনঃ এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা সংঘটিত হয়েছে।[২] তিনি উপরোক্ত আয়াতের যে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন, সেটা তার মনগড়া ব্যাখ্যা যা জমহুরে উম্মতের ব্যাখ্যার পরিপন্থী। তাফসীরের ক্ষেত্রে তার মনগড়া ব্যাখ্যার এটা একটা স্পষ্ট প্রমাণ।

(৭) ইমাম মাহ্‌দী সম্পর্কে মওদূদী সাহেবের অভিমত ঃ

মওদূদী সাহেব ইমাম মাহ্‌দী সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করতে যেয়ে এক জায়গায় বলেছেন, "মুসলমানদের মধ্যে যারা ইমাম মেহেদীর আগমনের ওপর বিশ্বাস রাখেন তারা যথেষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে অবস্থান করছেন এবং তাদের বিভ্রান্তি এর প্রতি অবিশ্বাসী নতুন প্রথা প্রবর্তনকারী মুজাদ্দিদের থেকে কোন অংশে কম নয়। তারা মনে করেন, ইমাম মেহেদী পুরাতন যুগের কোনো সুফী ধরনের লোক হবেন। তস্‌বীহ হাতে নিয়ে অকস্মাৎ কোনো মাদ্রাসা বা খানকাহ থেকে বের হবেন। বাইরে এসেই 'আনাল মেহেদী'-আমিই মেহেদী বলে চতুর্দিকে ঘোষণা করে দেবেন। উলামা ও শায়খগণ কিতাব-পত্র বগলে দাবিয়ে তাঁর নিকট পৌঁছে যাবেন এবং লিখিত চিহ্নসমূহের সঙ্গে তাঁর দেহের গঠন প্রকৃতি মিলিয়ে দেখে তাকে চিনে ফেলবেন। অতপর 'বাইআত' শুরু হবে এবং জিহাদের এলান করা হবে। সাধনাসিদ্ধ দরবেশ এবং পুরাতন ধরনের গোঁড়া ধর্ম বিশ্বাসীরা তাঁর পতাকাতলে সমবেত হবেন। নেহায়েত শর্ত পূরণ করার জন্যে নামমাত্র তলোয়ার ব্যবহার করা প্রয়োজন হবে, নয়তো আসলে বরকত ও আধ্যাত্মিক শক্তিবলেই সব কাজ সমাধা হয়ে যাবে। দোয়া দুরূদ যিকির তসবিহ্‌র জোরে যুদ্ধ জয় হবে। যে কাফেরের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হবে সে-ই

১. تفهيم القرآن ، جـ١، سوره نساء ، مكتبة تعمير انسانيت ، لاهور، ايڈيشن ١٩٥٧، صفحه/٤٢١ -

২. اكفار الملحدين

তড়পাতে তড়পাতে বেহুশ হয়ে যাবে এবং নিছক বদদোয়ার প্রভাবে ট্যাংক ও জংগী বিমানসমূহ ধ্বংস হয়ে যাবে।" তিনি আরও বলেছেন "আমার মতে আগমনকারী ব্যক্তি তার নিজের যুগের একজন আধুনিক ধরনের নেতা হবেন।"[১]

মওদূদী সাহেব এখানে পীর আউলিয়া বা ফকীর দরবেশদের ভাবমূর্তি এবং ইসলামী লেবাস-পোষাক, বুযুর্গদের কারামত, বরকত ও আধ্যাত্মিক শক্তির ধারণাকে অত্যন্ত তাচ্ছিল্য ও বিদ্রূপের ভাষায় এবং হাস্যকর ভংগিতে বিবরণ দিয়েছেন; এবং যা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন তা হাদীছের ভাষ্য সমূহের পরিপন্থী। যেমন তিনি তার উপরোক্ত বর্ণনায় বুঝাতে চেয়েছেন যে,

১. ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর বেশভূষা সূফী ও মৌলভীদের আকৃতির মত হবে না। অথচ দারিমীর রেওয়ায়েতে এসেছে ঃ

عن حذيفة قال حذيفة فقام عمران بن حصين فقال يارسول الله كيف بنا حتى نعرفه قال هو رجل من ولدى كانه من رجال بنى اسرائيل عليه عبائتان قطوانيتان وفى رواية خاشع له خشوع النسر بجناحيه عليه عبائتان قطوانيتان -

অর্থাৎ, হযরত হোযায়ফা (রাঃ)বর্ণনা করেন ঃ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট আরজ করলেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমরা কোন্ আলামতের ভিত্তিতে ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)কে চিনতে পারবো ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ

"সে হবে আমার সন্তানদের থেকে একজন। তার গায়ে দু'টি কোতওয়ানী আবা থাকবে। কেমন যেন সে বনী ইসরাঈলের একজন মানুষ।" অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে-সে হবে আল্লাহ ভীরু ও তাকওয়া সম্পন্ন ব্যক্তি। আবূ নুআইমের মারফূ' রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عن ابى امامة مرفوعا المهدى من ولدى ابن اربعين سنة كان وجهه كوكب درى فى خده الايمن قال اسود عليه عبائتان قطوانيتان (فتنه مودوديت للشيخ زكريا -الا شاعة وفتاوى حديثيه)

অর্থাৎ, আবূ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ "মাহ্‌দী আমার সন্তানদের থেকে হবে। তাঁর আত্মপ্রকাশ হবে ৪০ (চল্লিশ) বছর বয়সে। তাঁর মুখাবয়ব তারকাসাদৃশ্য উজ্জল, যার ডান গালে থাকবে কালো দাগ, গায়ে থাকবে দু'টো কুত্‌ওয়ানী আবা।"

হযরত আবূ নুআইম থেকে আরো একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ

يخرج المهدى وعلى راسه عمامة -

অর্থাৎ,"ইমাম মাহ্‌দী মাথায় পাগড়ী পেঁচানো অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করবেন।"

১. تجديد واحياء دين ص/٣٢ । অনুবাদ গ্রন্থ "ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন" (পৃ ৩০-৩১, ৭ম প্রকাশ, জুন-২০০২, প্রকাশনায় আধুনিক প্রকাশনী।) থেকে অনুবাদ টুকু গৃহীত হয়েছে ॥

২. মওদূদী সাহেব স্পষ্টতঃই বলেছেন "তাঁর কাজের কোনো অংশে কেরামতি, অস্বাভাবিকতা, কাশ্‌ফ, ইলহাম, চিল্লা, ও মুজাহাদা-মুরাকাবার কোনো স্থানই আমি দেখি না।[১] এভাবে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নির্ধারিত কোন চিহ্ন থাকবে না যে, তার ভিত্তিতে তাঁকে খুঁজে বের করা হবে। অথচ বহু সংখ্যক রেওয়ায়েতে তাঁর শারীরিক আকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। এসব বর্ণনায় তাঁর আকৃতি, অবয়ব ও চর্ম, ললাট ও নাসিকা প্রভৃতির উল্লেখ কি নিরর্থকই (?)

৩. মওদূদী সাহেব আরও বুঝাতে চেয়েছেন যে, ইমাম মাহ্‌দীর হাতে বাইআত গ্রহণ ধরনের কিছু হবে না। অথচ আবূ দাঊদ শরীফের হাদীছে এসেছে ঃ

فيبا يعونه بين الركن والمقام -

অর্থাৎ, "তারা (উলামা সম্প্রদায় তাঁর চিহ্নসমূহের মাধ্যমে তাঁকে চিনতে পেরে) তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করবেন হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইব্রাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে।

তাহলে কেন মওদূদী সাহেব বাই'আত নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করলেন ?

৪. মওদূদী সাহেব বিভিন্ন দিক থেকে অলী-আউলিয়াদের ইমাম মাহ্‌দীর নিকট আগমনকে অস্বীকার করেছেন। অথচ উপরোক্ত হাদীছেই বলা হয়েছে ঃ

اتاه ابدال الشام وعصائب اهل العراق -

অর্থাৎ, শামের আব্দাল ও ইরাকের আসায়েব এসে তাঁর নিকট হাজির হবেন।

এই "আব্দাল ও আসায়েবের" ব্যাখ্যায় "আন-নিহায়া" গ্রন্থে বলা হয়েছে তারা হবেন দরবেশ তথা পূর্বসূরীদের অনুসৃত আদর্শের অধিকারী শ্রেণী।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছেঃ

يتخرج الابدال من الشام واشباههم ويخرج اليه النجباء من مصر وعصائب اهل المشرق واشباههم حتى ياتوا مكة فيبا يع له بين الركن والمقام -

অর্থাৎ, শামের আব্দাল প্রমুখ এবং মিসর থেকে নুজাবা ও প্রাচ্যের আসায়েব প্রমুখ তার সন্ধানে বের হয়ে মক্কা পৌঁছবেন। অতঃপর রুক্‌ন ও মাকামে ইব্রাহীমের মধ্যে তাঁর হাতে বাই'আত হবেন।

৫. মওদূদী সাহেব আরও বুঝাতে চেয়েছেন যে, যুদ্ধ ছাড়া ইমাম মাহ্‌দীর কারামত, দুআ, কোন তাস্‌বীহ ইত্যাদি ধরনের অন্য কিছুর মাধ্যমে কিছু ঘটার ধারণা ভুল। অথচ মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতে শুধুমাত্র নারায়ে তাকরীরের ধ্বনীর দ্বারাই শহর জয় হয়ে যাওয়ার কথা বর্ণিত আছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

১. অনুবাদ গ্রন্থ "ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন" পৃ ৩১, ৭ম প্রকাশ, জুন-২০০২, প্রকাশনায় আধুনিক প্রকাশনী ॥

فاذاجاء وها وما نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا اله الا الله والله اكبر فيسقط احدجانبها ثم يقولون الثانية لا اله الا الله والله اكبر فيسقط جانبها الاخر ثم يقولون الثلثة لا اله الا الله والله اكبر فيفرج بهم فيدخلونها -

অর্থাৎ, যখন তারা (কনস্ট্যান্টিনোপল) শহরে গমন করবে তখন তাদের বধ করতে না প্রয়োজন হবে হাতিয়ার বা অস্ত্রের, না প্রয়োজন হবে তীর নিক্ষেপের; বরং তারা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতেই শহরের এক প্রান্তের পতন হবে। আবার যখন দ্বিতীয়বার 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, তখন দ্বিতীয় প্রান্তেরও পতন ঘটবে। যখন তৃতীয়বার বলবে, তখন তাদের জন্য রাস্তা খুলে যাবে এবং তারা ভিতরে প্রবেশ করবে।

ইমাম মাহ্‌দী সম্পর্কে হাদীছের এসব স্পষ্ট বিবরণ থাকা সত্ত্বেও মওদূদী সাহেব এসব বিষয়কে বিদ্রূপাত্মক ও ব্যাঙ্গাত্মক ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এটা দ্বীনের ব্যাপারে এবং হাদীছ সম্পর্কে মওদূদী সাহেবের বে-খবর ও বে-পরোয়া থাকার প্রমাণ বহন করে। অথচ এটাকেই নাম দেয়া হয়েছে পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারা ও স্পষ্টবাদিতা বলে।

(৮) কুরআন ও ইসলাম সর্বযুগে সংরক্ষিত কি না - এ প্রসঙ্গ ঃ

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে ইসলাম সর্ব যুগের সকল মানুষের জন্য ধর্ম এবং ইসলামের কিতাব কুরআন সর্ব যুগের জন্য ধর্মীয় কিতাব। সে মতে কিয়ামত পর্যন্ত এই ধর্ম এবং এই কিতাব হেফাযত ও সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ্ পাক নিজেই নিয়ে নিয়েছেন এবং সর্বযুগে ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝার ও পেশ করার মত যোগ্য ব্যক্তিত্ব তৈরি করার ধারা তিনি অব্যাহত রেখেছেন। ইসলামের ইতিহাসে এমন কোন মুহূর্ত আসেনি যখন ইসলাম তথা কুরআন-হাদীছ সঠিকভাবে বুঝা ও পেশ করার মত ব্যক্তিত্ব ছিল না। বরং কুরআন-হাদীছের সঠিক জ্ঞান সমৃদ্ধ একটি জামা'আত এবং হকপন্থী একটি দল সর্বদাই বিদ্যমান ছিল এবং থাকবে।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون -

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমিই এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক। (সূরাঃ ১৫-হিজ্‌রঃ ৯)

এটা সুস্পষ্ট যে, পবিত্র কুরআন শব্দ ও অর্থ সমন্বিত একটি ঐশ্বী কিতাব. শুধু শব্দের নাম কুরআন নয়। সুতরাং সর্বযুগে কুরআনে কারীমের সংরক্ষিত থাকার অর্থ হল তার শব্দ ও অর্থ উভয়ই সংরক্ষিত থাকা। আর এটা উপরোক্ত আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত।

হাদীছে রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين - (مشكوة عن البيهقى)

অর্থাৎ, পূর্বুরীদের কাছ থেকে প্রত্যেক পরবর্তী একটি নির্ভরযোগ্য জামা'আত এ ইল্ম ধারণ করতে থাকবে। তারা চরমপন্থীদের বিকৃতি, বাতিলের অপমিশ্রণ ও মূর্খদের অপব্যাখ্যা খণ্ডন করে দ্বীনকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখবে। অন্য হাদীছে হুযুর (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

لايزال من امتى امة قائمة بامر الله. الحديث (البخارى)

অর্থাৎ, আমার উম্মতের এক জামা'আত কিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা হকের উপর অটল থাকবে। (বোখারী শরীফ)

❑ মওদূদী সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গীঃ

মওদূদী সাহেব "কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইসতেলাহেঁ" গ্রন্থে বলেছেন, "কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় এ শব্দগুলোর (ইলাহ, রব, দ্বীন ও ইবাদত) যে মৌল অর্থ প্রচলিত ছিল, পরবর্তী শতকে ধীরে ধীরে তা পরিবর্তিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এক একটি শব্দ তার সম্পূর্ণ ব্যাপকতা হারিয়ে একান্ত সীমিত বরং অস্পষ্ট অর্থের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে।" এর এক পৃষ্ঠা পর তিনি লিখেছেনঃ "এটা সত্য যে, কেবল এ চারটি মৌলিক পরিভাষার তাৎপর্যে আবরণ পড়ে যাওয়ার কারণেই কুরআনের তিন-চতুর্থাংশের চেয়েও বেশী শিক্ষা এবং তার সত্যিকার স্পিরিটই দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়।"[১]

❑ পর্যালোচনাঃ

কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষার অর্থ যদি বিকৃত হয়ে যেয়ে থাকবে এবং তার কারণে কুরআনের তিন চতুর্থাংশেরও বেশী বরং মূল স্পিরিটই উধাও হয়ে গিয়ে থাকবে এবং মওদূদী সাহেব তা উদ্ধার করে থাকবেন, তাহলে বলতে হবে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রথম শতাব্দীর পর থেকে মওদূদী সাহেবের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ তের'শ বৎসর কাল যাবত কুর-আন তার অর্থসহ সংরক্ষিত ছিল না। কুরআনের শাশ্বতের বিরুদ্ধে এর চেয়ে বড় আঘাত আর কি হতে পারে ? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون -

অর্থাৎ, আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমি তার (শব্দ ও অর্থ উভয়টার) সংরক্ষক। (সূরা ঃ ১৪-ইব্রাহীম ঃ ৯)

মওদূদী সাহেবের পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ তেরশ' বৎসর কাল যাবত কুরআনের তিন চতুর্থাংশের বেশী যদি কেউ বুঝে না থাকবেন অথচ আক্বাইদ, ফেকাহ ও হাদীছের কিতাবাদী সংকলনসহ ইসলামী দুনিয়ার যাবতীয় মৌলিক ও আনুষঙ্গিক কিতাবাদী প্রায় সবই এ যুগেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাহলে এসব কিতাবাদী ও তার লেখকগণ কুরআন তথা ইসলাম না বোঝার কারণে নির্ভরযোগ্যতা হারাবেন। এমতাবস্থায় দুনিয়াবাসী

১. কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইসতেলাহেঁ, ৮-১০ পৃঃ মারকাযী মাকতাবায়ে ইসলামী, দিল্লী, ১৯৮৮ ইং ৮ম সংস্করণ। অনুবাদ গ্রন্থঃ কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষাঃ ১২-১৩ পৃঃ আধুনিক প্রকাশনী, ৮ম প্রকাশ, জুন-২০০২ ॥

ইসলাম পাবে কোথায় ? তার এ বক্তব্য এক্ই সাথে কুরআন ও ইসলাম সংরক্ষিত না থাকাকে বোঝায়।[১]

এতক্ষণ ঈমান আকীদার ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে মওদূদী সাহেবের বিচ্যুত হওয়ার বিবরণ পেশ করা হল। মওদূদী সাহেব আমল এবং ইবাদত বন্দেগী প্রসঙ্গেও আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। নিম্নে তার বিবরণ পেশ করা হল।

(খ) আমল এবং ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে মওদূদী সাহেবের বিচ্যুতি

আমল এবং ইবাদত বন্দেগী প্রসঙ্গে মওদূদী সাহেবের আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে বিচ্যুত হওয়ার পর্যায়ে নিম্নে ৪টি বিষয় উল্লেখ করা হল।

(১) নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি মূল ইবাদত কি-না-এ প্রসঙ্গঃ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট নামায রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি হল মৌলিক ইবাদত এবং এগুলো ইসলামের মৌলিক ও বুনিয়াদী বিষয়। ঈমানের পর এগুলি ইসলামের মুখ্য উদ্দেশ্য। হাদীছে ইরশাদ হয়েছেঃ

بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلوة وايتاء الزكوة وحج البيت وصوم رمضان - (مسلم)

অর্থাৎ, পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে। তাহল - একথার স্বাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, আর নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া, বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করা এবং রমযানের রোযা রাখা।

এ হাদীছে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত-কে ইসলামের বুনিয়াদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কিন্তু মওদূদী সাহেবের মতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত- এগুলো মূল ইবাদত নয়, বরং এগুলি হল ট্রেনিং কোর্স। তার মতে এ ইবাদতগুলি ইসলামের মূল উদ্দেশ্য নয় বরং মূল উদ্দেশ্য হল ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা। তিনি "ইবাদত একটি টেনিং কোর্স" এই শিরোনামে বলেনঃ

বস্তুতঃ ইসলামের নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদত সমূহ এই উদ্দেশ্যে (জিহাদ ও ইসলামী হুকুমত কায়েম) প্রস্তুতির জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। দুনিয়ার সমস্ত রাষ্ট্র শক্তি নিজ নিজ সৈন্য বাহিনী, পুলিশ ও সিভিল সার্ভিসের কর্মচারীদেরকে সর্ব প্রথম এক বিশেষ ধরনের ট্রেনিং দিয়ে থাকে। সেই ট্রেনিংয়ে উপযুক্ত প্রমাণিত হলে পরে তাকে নির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত করা হয়। ইসলামও তার কর্মচারীদেরকে সর্ব প্রথম এক বিশেষ

১. কোন কোন সমালোচকের ভাষায় সর্ব যুগের সমস্ত উলামায়ে কেরামের বিপরীতে ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা দেয়ার পথ খোলাসা করার জন্যেই কি মওদূদী সাহেব সকলকে কুরআন তথা ইসলাম না বুঝার দলে ফেলতে এই অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিলেন ? ॥

পদ্ধতির ট্রেনিং দিতে চায়। তারপরই তাদেরকে জিহাদ ও ইসলামী হুকুমত কায়েম করার দায়িত্ব দেয়া হয়।[১]

তিনি অন্যত্র বলেনঃ মূলত মানুষের রোযা, নামায, হজ্জ, যাকাত, যিকির, তাসবীহ্‌কে ঐ বড় ইবাদতের জন্য প্রস্তুত করার ট্রেনিং কোর্স (Training Courses)।[২]

❑ **খণ্ডন ঃ**

মওদূদী সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি মূল ইবাদত নয় এবং এগুলো ইসলামের মূল উদ্দেশ্য নয় বরং এগুলো হলো জিহাদ ও ইসলামী হুকুমতের জন্য ট্রেনিং কোর্স মাত্র। মূল উদ্দেশ্য হল হুকুমত। অথচ কুরআনে কারীমের বর্ণনা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে হুকুমত বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই হলো নামায, যাকাত আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার প্রভৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করা। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور -

অর্থাৎ, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার করবে। (সূরাঃ ২২- হজ্জঃ ৪১)

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে নামায, যাকাত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। অতএব মূল উদ্দেশ্য হল নামায, যাকাত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করা এবং রাষ্ট্র তার জন্য সহায়ক। অথচ মওদূদী সাহেব কুরআনের বক্তব্যের সম্পূর্ণ উল্টো বলেছেন যে, নামায, রোযা, প্রভৃতি হবে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, মূল উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এটাকে ইসলামের এই মহান ইবাদতগুলির প্রতি গুরুত্বকে হ্রাস করার অপচেষ্টা এবং এই মহান ইবাদতগুলির প্রতি অবমাননা হিসেবে বিবেচনা করা হলে তা অতিরঞ্জিত হবে না। এটা ইসলামের মূল স্পিরিটকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা। এটা অবশ্যই ইসলামের মৌলিকতার বিকৃতি সাধন।

(২) নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদতকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখা প্রসঙ্গ ঃ

মওদূদী সাহেবের মতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত যেহেতু মূল ইবাদত এবং মূল উদ্দেশ্য নয়, বরং মূল উদ্দেশ্য হল জিহাদ ও ইসলামী হুকুমত কায়েম করা, তাই আল্লাহর আইন তথা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যতিরেকে নামায রোযা, হজ্জ, যাকাত তেলাওয়াত

---

১. خطبات: صفحہ / ۳۱۵، مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی ۱۹۸۰। অনুবাদ গ্রন্থ, ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষাঃ ২৭৩ পৃঃ, আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ১৯৮৪ ইং ৪র্থ সংস্করণ, উল্লেখ্যঃ এই অনুবাদ গ্রন্থে عبادات-ایک تربیتی کورس ہیں (ইবাদত একটি ট্রেনিং/ প্রশিক্ষণ কোর্স) মূল কিতাবে উল্লেখিত এই শিরোনামটি ফেলে দেয়া হয়েছে ॥

২. تفہیمات، حصہ اول، صفحہ / ۶۹، ۱۹۶۸، اسلامک پبلیکشنز لمیٹڈ، لاہور (پاکستان) ॥

ইত্যাদি নিরর্থক এবং ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করে এরূপ ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গতার দৃষ্টিতে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র। অথচ আল্লাহ তা'আলার কাছে ইবাদতকারী অত্যন্ত ভালবাসার পাত্র। ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা একটা দায়িত্ব, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এগুলিও সব সতন্ত্র দায়িত্ব। একটা দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করলে অন্যান্য সব দায়িত্ব পালন নিরর্থক হতে পারে না। তারা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের পাত্র হতে পারে না। ইবাদত ও ইবাদত কারীকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে পরিণত করা কুফ্‌রীর নামান্তর। অথচ মওদূদী সাহেব এরূপই করেছেন। তিনি বলেনঃ

যারা রাত্র দিন আল্লাহ্‌র আইন ভঙ্গ করে, কাফের মুশরিকদের আদেশ অনুযায়ী কাজ করে এবং নিজেদের বাস্তব কর্ম জীবনে আল্লাহর বিধানের কোনও পরওয়া করে না, তাদের নামায, রোযা, তাসবীহ পাঠ, কুরআন তেলাওয়াত, হজ্জ, যাকাত, ইত্যাদিকে আপনি ইবাদত বলিয়া মনে করেন। এ ভুল ধারণারও মূল কারণ "ইবাদত" শব্দের প্রকৃত অর্থ না জানা। তিনি বলেনঃ "আর একজন চাকরের কথা ধরুন। সে রাত্র-দিন কেবল পরের কাজ করে, অন্যের আদেশ শুনে এবং পালন করে, অন্যের আইন মানিয়া চলে এবং তাহার প্রকৃত মনিবের যত আদেশ ও ফরমানই হউক না কেন, তাহার বিরোধিতা করে। কিন্তু 'সালাম' দেওয়ার সময় সে তাহার প্রকৃত মনিবের সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং মুখে কেবল তাহার নাম জপিতে থাকে। আপনাদের কাহারো কোন চাকর এইরূপ করিলে আপনারা কি করিবেন? তাহার 'সালাম' কি তাহার মুখের উপর নিক্ষেপ করিবেন না? মুখে মুখে সে যখন আপনাকে মনিব আর মালিক বলিয়া ডাকিবে তখন আপনি কি তাহাকে এই কথা বলিবেন না যে, তুই ডাহা মিথ্যাবাদী ও বেঈমান; তুই আমার বেতন খাইয়া অন্যের তাবেদারী করিস, মুখে আমাকে মনিব বলিয়া ডাকিস, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেবল অন্যেরই কাজ করিয়া বেড়াস ? ইহা নিতান্ত সাধারণ বুদ্ধির কথা, ইহা কাহারো বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু কি আশ্চর্যের কথা! যাহারা রাত্র-দিন আল্লাহ্‌র আইন ভঙ্গ করে, কাফের ও মুশরিকদের আদেশ অনুযায়ী কাজ করে এবং নিজেদের বাস্তব কর্মজীবনে আল্লাহ্‌র বিধানের কোন পরওয়া করে না; তাহাদের নামায, রোযা, তাসবীহ পাঠ, কোরআন তেলাওয়াত, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদিকে আপনি ইবাদত বলিয়া মনে করেন। এই ভুল ধারণারও মূল কারণ ইবাদত শব্দের প্রকৃত অর্থ না জানা।

আর একটি চাকরের উদাহরণ নিন। মনিব তাহার চাকরদের জন্য যে ধরনের পোষাক নির্দিষ্ট করিয়াছেন, মাপ জোখ ঠিক রাখিয়া সে ঠিক সেই ধরনের পোষাক পরিধান করে, বড় আদব ও যত্ন সহকারে সে মনিবের সম্মুখে হাযির হয়, প্রত্যেকটি হুকুম শুনা মাত্রই মাথা নত করিয়া শিরোধার্য করিয়া লয় যেন তাহার তুলনায় বেশী অনুগত চাকর আর কেহই নাই। সালাম দেওয়ার সময় সে একেবারে সকলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় এবং মনিবের নাম জপিবার ব্যাপারে সমস্ত চাকরের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিষ্ঠা প্রমাণ করে' কিন্তু অন্যদিকে এই ব্যক্তি মনিবের দুশমন এবং বিদ্রোহীদের খেদমত করে, মনিবের বিরুদ্ধে তাহাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্রে সে অংশ গ্রহণ করে এবং মনিবের নাম পর্যন্ত দুনিয়া হইতে নিশ্চিহ্ন করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা যে চেষ্টাই করে, এই হতভাগা তাহার সহযোগিতা